বিবেচনা

পুনর্বিবেচনা

আবদুল মান্নান সৈয়দ

পুনর্বিবেচনা

আবদুল মান্নান সৈয়দ

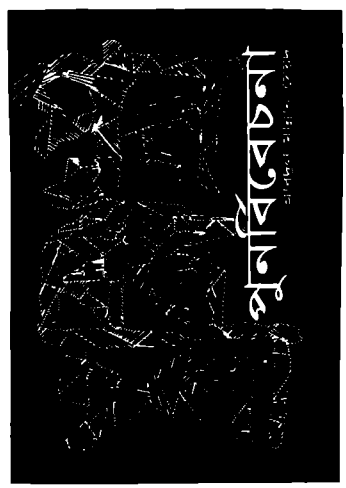

সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড

www.pathagar.com

সপ২৮পস৩

PUNORBIBECHANA
Essays by Abdul Mannan Syed
First Edition : February, 1990

মূল্য ঃ পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র

পুনর্বিবেচনা ঃ আবদুল মান্নান সৈয়দ ।। প্রকাশক ঃ সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড, করিম চেম্বার (৫ম তলা), ৯৯/মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ ।। প্রকাশকাল ঃ ফাল্‌গুন, ১৩৯৬ ।। স্বত্ব ঃ সায়রা সৈয়দ ।। মুদ্রণ ঃ পেপার কনভার্টিং এণ্ড প্যাকেজিং লিমিটেড, করিম চেম্বার (নিচ তলা), ৯৯, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ ।।
প্রচ্ছদ ঃ মোমিন উদ্দীন খালেদ ।

www.pathagar.com

কলাম লেখা আমার ধাতে সয় না, তবু দু-একবার অনুরুদ্ধ ঢেঁকি গিলতে হয়েছে । এ রকম একবার, বছর কয়েক আগে (১৯৮৬-৮৭), দৈনিক সংগ্রাম-এর সাহিত্যপৃষ্ঠায় দীর্ঘ বিরতি দিয়ে-দিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলাম । ঐ পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক স্নেহভাজন সাজজাদ হোসাইন খান-এর নির্বন্ধে । একেবারেই নির্বন্ধাতিশয্যে নয় সেবার, নিজেরও একটুখানি তাগিদ ছিলো ; দেখছিলাম ঃ নানারকম ব্যস্ততায় ও আলস্যে অনেক জরুরি কথা, যা আমি জানাতে চাই আমার পাঠকদের, কিছুতেই হয়ে উঠছে না । তখনই এই তাৎক্ষণিক লেখাগুলি তৈরি হয়—এই বইয়ের প্রথম দশটি নিবন্ধ ।

এর মধ্যে 'সেই সনাতন সমস্যা' নিবন্ধটি নিয়ে কিছু আলোচনা-সমালোচনা হয় ঐ পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই । সেগুলিও এখানে সমাহৃত হ'লো । স্বয়ং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত "পূর্ব পশ্চিম" উপন্যাসের শেষ কিস্তির শেষে একটি উত্তরভাষণে তাঁর জবাবদিহি পেশ করেন আমার ঐ লেখাটিরই ইঙ্গিত দিয়ে । তাঁর বক্তব্য ঃ তিনি এখানকার প্রকাশিত গ্রন্থের ভিত্তিতেই ঐ উপন্যাস লিখেছেন ।

কিন্তু তাহ'লেও কি কথা থাকে না ?—এভাবে কি উপন্যাস লেখা সম্ভব ? একটি দেশের জনগণ ও তার সামগ্রিকতাকে প্রত্যক্ষভাবে, সমূহভাবে না জেনে—শুধুমাত্র বই পড়ে কি উপন্যাস লেখা সম্ভব ? আমরা তো জানিই, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও জানেন, অনেক বই লেখা হয় মিথ্যা কিংবা বিভ্রম থেকে, কিংবা না-বুঝে বা আধো-বুঝে, নানারকম উদ্দেশ্যও কাজ করে অনেক সময় । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা মনে করা যেতে পারে । তিনি তাঁর গ্রামজীবনের টুকরো অভিজ্ঞতাকে রূপ দিলেন গল্পগুচ্ছে, কিন্তু একটি উপন্যাসেও গ্রামজীবনকে ব্যবহার করলেন না, নিম্নবিত্তের জীবন চিত্রিত করলেন না—উপন্যাসে রূপ দিলেন তাঁর চেনাজানা নাগরিক উচ্চবিত্তকে ।

'হুমায়ুন কবির' নিবন্ধটি প্রথম দৈনিক সংগ্রামেই বেরিয়েছিলো ; পরিশোধিতভাবে প্রকাশিত হয় 'উষালোকে' পত্রিকায় । 'উষালোকে'-সম্পাদক মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ পত্রিকাটি পাঠিয়ে দেন হুমায়ুন কবিরের সহোদর আকবর কবিরের কাছে—ফরিদপুরে । সম্পাদককে লেখা আকবর কবিরের পত্র ও হুমায়ুন কবিরের গ্রন্থপঞ্জি 'উষালোকে'-সম্পাদকের অনুমোদনে এখানে পুনর্মুদ্রিত হলো । (এখানে অবশ্য বলা উচিত ঃ আমার ধারণা, হুমায়ুন কবিরের সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জি এটাও নয়—আরো বই আছে তাঁর ।) আমার হুমায়ুন কবির-সম্পর্কিত প্রবন্ধ-সংবলিত 'উষালোকে' পত্রিকাটি সম্পর্কে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় সমালোচনা-প্রসঙ্গে দোষ স্বীকার করেও বলা হয় অনেকটা এ রকম সুরে—বাংলাদেশেই বা হুমায়ুন কবিরকে নিয়ে কি হচ্ছে !—এই সমালোচনাতেই যে তাঁদের দায়িত্ব ফুরোয় না—আশা করি—তাঁরাও তা জানেন । এবং স্মর্তব্য, বাংলা একাডেমী থেকে সম্প্রতি জীবনী সিরিজে শাহরিয়ার ইকবাল-প্রণীত "হুমায়ুন কবির" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে, আর 'উষালোকে' পত্রিকায় নিয়মিতভাবে হুমায়ুন কবির-সম্পর্কিত রচনাদি প্রকাশিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

আরো কয়েকটি লেখা এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছি ।

বিভিন্ন সময়ে আমার কোনো-কোনো লেখা বিতর্কের সূচনা করেছে । সব সময় আমি জবাব দিইনি বা তার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিনি । কখনো-কখনো দিয়েছি । 'আচ্ছাদিত বারান্দা' ও 'জগদীশ গুপ্তের গল্প প্রলয়ংকরী ষষ্ঠী' সম্পর্কে আলোচনা-প্রত্যালোচনা এখানে সংকলিত হয়েছে ।

'আমাদের নবজাগরণ ও ফররুখ আহমদ' প্রবন্ধটি ১৯৮৮-র ১৯শে অক্টোবর ফররুখ আহমদের মৃত্যুবার্ষিকীতে 'বিপরীত উচ্চারণ' আয়োজিত অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ হিশেবে পাঠ করেছিলাম । এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন কবি তালিম হোসেন । আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন সর্বজনাব এ. জেড. এম. ওবায়দুল্লাহ, জয়নুল আবেদীন আজাদ, আবুল আসাদ, কবি আল মাহমুদ ও কথাশিল্পী শাহেদ আলী । প্রবন্ধটি পরে 'কলম' পত্রিকার ডিসেম্বর ১৯৮৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ।

'হাসান হাফিজুর রহমান' প্রবন্ধটি দৈনিক বাংলার সাহিত্যসাময়িকীতে বেরিয়েছিলো । 'আল মাহমুদের সাম্প্রতিক কবিতা' প্রবন্ধটি মাসিক 'শিল্পতরু', দৈনিক জনতা ও দৈনিক সংগ্রামের সাহিত্যপাতায় বেরিয়েছিলো । লেখাটি পড়েছিলাম কবিতাকেন্দ্র-আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে । সৈয়দ আলী আহসান তার সভাপতিত্ব করেছিলেন । অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রকাশিত একটি স্যুভেনিরেও প্রবন্ধটি বেরোয় । 'আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এক ঘন্টার শিক্ষক' লেখাটি প্রকাশিত হয় দৈনিক জনতা-র সাহিত্যপৃষ্ঠায় । 'ঢাকার সাহিত্যচর্চার ধারা'ও ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত । জাতীয় যাদুঘর আয়োজিত 'ঢাকা ঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' অনুষ্ঠানমালার অংশ হিশেবে ১৯৮৯-এর ১২ই নভেম্বর 'ঢাকার সাহিত্যচর্চার ধারা' প্রবন্ধটি যাদুঘরে পাঠ করেছিলাম । ঐ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন কবীর চৌধুরী ।

তরুণ লেখক বুলবুল সরওয়ারের আগ্রহে 'সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড' এই বই প্রকাশ করছেন । আমার এই তাৎক্ষণিক লেখাগুলি পাঠকের ভালো লাগলে আনন্দিত হবো ।

৫১ গ্রীন রোড,
ঢাকা-৫

—আবদুল মান্নান সৈয়দ

www.pathagar.com

আবিদ আজাদ

প্রিয়বরেষু

www.pathagar.com

এই লেখকের সাম্প্রতিক প্রকাশনা ঃ

১ । তোরা সব জয়ধ্বনি কর
২ । নজরুল ইসলাম ঃ কালজ কালোত্তর
৩ । ফররুখ আহমদের গল্প (সম্পাদিত)
৪ । বাংলাদেশের কবিতা (যৌথ সম্পাদনা)
৫ । আমার সনেট (কবিতা)
৬ । সৈয়দ মুর্তাজা আলী (জীবনী)
৭ । মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী-রচনাবলী (সম্পাদনা)
৮ । বুদ্ধদেব বসুর কবিতা (সম্পাদিত)
৯ । সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা (সম্পাদিত)
১০ । সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা (সম্পাদিত)

www.pathagar.com

সূ চি প ত্র

১ আত্মিক স্বাতন্ত্র্য
৬ বেগম রোকেয়ার অন্তঃপরিবর্তন
১১ বাংলাদেশ নজরুলকে যা দিয়েছিলো
১৫ নজরুল ও নির্বাসিত কয়েকজন
১৮ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী
২৩ সেই সনাতন সমস্যা
[আলোচনা ঃ (ক) আতাউর রহমান খান (খ) খাদেম হাফিজ (গ) বুলবুল সরওয়ার (ঘ) সালাহউদ্দীন নিযামী (ঙ) এজাজ আহমদ]
৩৭ হুমায়ুন কবির
[আলোচনা ঃ (ক) আকবর কবির]
৪৫ মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে
৪৯ খাপ-খোলা তলোয়ার
৫৩ পুরোনো পত্রিকা
৫৭ আচ্ছাদিত বারান্দা
[আলোচনা ঃ (ক) আবদুল কাদির (খ) মুজীবুল হক কবীর (গ) আবদুল মান্নান সৈয়দ]
৭৬ জগদীশ গুপ্তের গল্প 'প্রলয়ংকরী ষষ্ঠী'
[আলোচনা ঃ (ক) সুশান্ত মজুমদার (খ) আবদুল মান্নান সৈয়দ]
৮৭ কবির গদ্য
৯৪ আমাদের নবজাগরণ ও ফররুখ আহমদ
১০৫ হাসান হাফিজুর রহমান
১১২ আল মাহমুদের সাম্প্রতিক কবিতা
১২৫ আবুহেনা মোস্তফা কামাল ঃ এক কথার শিক্ষক
১৩৬ ঢাকার সাহিত্যচর্চার ধারা

www.pathagar.com

সৃজনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা ঃ

শওকত ওসমান ও সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্‌র উপন্যাস/আবু রুশ্‌দ্‌
স্রোতোবাহী নদী/সৈয়দ আলী আহসান
মাটি কথা কয়/নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী
সে এবং যাবতীয়/রাবেয়া খাতুন
নিঝুম দ্বীপের উপাখ্যান/সানাউল্লাহ্‌ নূরী
হে মানব মানবী/রিজিয়া রহমান
Selected Poems/Al Mahmud
খুন ও ভালোবাসা/সেলিনা হোসেন
মুসলিম আইনের মুখবন্ধ/ড. আহমদ আনিসুর রহমান
ফেরারী চন্দ্রিমায়/নাজমা তাশমীন
ঝিলাম নদীর দেশ/বুলবুল সরওয়ার
ফররুখ আহমদের গল্প

www.pathagar.com

আত্মিক স্বাতন্ত্র্য

দেশবিভাগের আগে কলকাতা ছিলো বাংলা সাহিত্যের রাজধানী। সাতচল্লিশের দেশবিভাগের পর সাহিত্যের আরেকটি রাজধানী হয়ে ওঠে ঢাকা। আরেকটি—কিন্তু দ্বিতীয় নয়, অপ্রতিম, অতুলনীয়। এই শতাব্দীর বিশের দশকে, কিংবা আরো কোনো-কোনো খণ্ডকালে হয়তো, ঢাকার সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক উজ্জ্বলতা জাজ্বল্য হয়ে উঠেছে। সাতচল্লিশের দেশবিভাগের পরই এই শহর হয়ে ওঠে সাহিত্যের এক নূতন ও স্থায়ী কেন্দ্র-কোরক—জায়মান সৃজনশীলতা ও মননশীলতাকে সে ধরে রাখতে থাকে তার সাগ্রহ সেই কেন্দ্রে। এখন, ইতিমধ্যেই মাত্র এই চল্লিশ বছরে (১৯৪৭-৮৬) ঢাকা-কেন্দ্রিক যে-সাহিত্য সৃজিত হয়েছে, তা হ'য়ে উঠেছে বাংলা সাহিত্যের আবশ্যিক অংশ। ঢাকা থেকে সম্পূর্ণ নূতন এক সাহিত্যধারা প্রবাহিত হচ্ছে আজ। আবার সম্পূর্ণ নূতন বলে কোনো কিছু নেই সাহিত্যে, বীজ বা অন্তর্গত ফল্গুধারা ভিতরে-ভিতরে তার রয়েই যায় কোথাও-না-কোথাও। ঢাকা-কেন্দ্রিক সাহিত্যের আজকের যে-প্রবাহ তার অন্তর্গত ফল্গুধারা তলে-তলে বহমান ছিলো, শীর্ণভাবে কিন্তু তীব্রভাবে, কলকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্যধারায়।

উনিশ শতাব্দীর সূচনামুহূর্ত থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মূল ভূমি হয়ে ওঠে কলকাতা। লিখিত কবিতা, লিখিত গদ্য, লিখিত নাটক—বাংলা সাহিত্য ক্রমাগত আধুনিকতায় দীক্ষিত হতে থাকে। সবাই জানেন, বাঙালি-মুসলমান তাতে যোগ দ্যায় অনেক পরে—শতাব্দীর অর্ধেক অতিক্রান্ত হওয়ার পর। তা-ও বিচ্ছিন্নভাবে, ছেঁড়া-ছেঁড়াভাবে, যতো-না সাহিত্যিক তার চেয়ে বেশি সামাজিক ও ধার্মিক সংক্রামে। প্রকৃতপক্ষে বিশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বাঙালি-মুসলমান ব্যাপকভাবে সাহিত্যে যুক্ত হয়, কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই বাঙালি-মুসলমানের সেই প্রথম সন্দীপনকালে সামাজিক-রাজনৈতিক ভাবনা-বেদনাই ছিলো তার মুখ্য আলোচ্য। তার আসন্ন পথ ও গন্তব্য জেনে নিতেই সে ছিলো ব্যাকুলভাবে সন্ধিৎসু।

www.pathagar.com

সেদিন কলকাতাই ছিলো কেন্দ্রভূমি। সমস্ত দেশ অর্থাৎ ভারতবর্ষ ছিলো অখণ্ডিত। একই কলকাতায় সাহিত্যচর্চা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, তারাশংকর, মানিক, বিভূতিভূষণ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সমরেশ বসু প্রমুখ এবং শেখ আবদুর রহিম, মোজাম্মেল হক, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, বেগম রোকেয়া, কাজী ইমদাদুল হক, এয়াকুব আলী চৌধুরী, ডাক্তার লুৎফর রহমান, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্‌দীন, ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আবু রুশদ, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, কাজী আবদুল ওদুদ, সৈয়দ আবুল হোসেন প্রমুখ। ভাবতে অবাক লাগে, একই কলকাতায় বসে এঁরা একই বাংলা ভাষায় দুই স্বতন্ত্র সাহিত্যধারা প্রবাহিত করেন। 'সুধাকর', 'সওগাত', 'মোহাম্মদী' ও মুসলিম-সম্পাদিত প্রায়-সব প্রধান পত্রিকা কলকাতা থেকেই বেরিয়েছিলো। মুসলিম-সম্পাদিত পত্রিকাসমূহে রবীন্দ্রনাথ, শরৎ চন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল, ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী, অন্নদাশংকর রায় মাঝে-মাঝে অবতীর্ণ হয়েছেন; যেমন নজরুল, জসীমউদ্‌দীন প্রমুখ হিন্দু-সম্পাদিত পত্রিকাসমূহে—কিন্তু মোটামুটিভাবে হিন্দু-সম্পাদিত পত্রিকা-গুচ্ছে হিন্দু আদর্শ এবং মুসলিম-সম্পাদিত পত্রিকাসমূহে মুসলিম আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। অন্য মুসলিম লেখকদের প্রসঙ্গ দূরে থাক, হিন্দু-মুসলমান মিলনের শ্রেষ্ঠ অগ্রদূত নজরুল ইসলামও—আশ্চর্য—প্রধানত প্রকাশিত হয়েছেন মুসলিম-সম্পাদিত পত্রিকানিচয়েই। মুসলিম-সম্পাদিত পত্রিকা-নিচয়ের ছিলো তিনটি বিশিষ্টতা : এক. মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রচার-প্রসার; দুই. বাঙালি-মুসলমানের ভাষা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ও জবাব; এবং তিন. হিন্দু-মুসলমানের মিলনকামিতা। হিন্দু-সম্পাদিত পত্রিকাসমূহে নয়, আশ্চর্য, মুসলিম-সম্পাদিত পত্রিকাসমূহেই হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হতো। মীর মশাররফ হোসেন-সম্পাদিত 'হিতকরী' ছিলো 'হিন্দু মুসলমানের মিলনকামী' (কাজী আবদুল মান্নান)। এর্স. কে. এম. মহম্মদ রওশন আলী-সম্পাদিত 'কোহিনূর' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সম্পাদ-

www.pathagar.com

কীয়তে বলা হয়েছিলো : 'হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি, জাতীয় উন্নতি, মাতৃ-ভাষার সেবা কল্পে এবং কলিকাতার অনাথ-আশ্রমের সাহায্যার্থ "কোহিনুর" প্রচারে ব্রতী হইয়াছি।' সৈয়দ এমদাদ আলী-সম্পাদিত 'নবনূরে'র সম্পাদকীয় থেকে উদ্ধৃতি : 'ভারতবর্ষের অদৃষ্টফলকে হিন্দু মুসলমানের সুখ-দুঃখ এখন একই বর্ণে চিত্রিত; বিজয়দৃপ্ত মুসলমান এখন হিন্দুর ন্যায়ই বিজিত। এই দুই মহাজাতির সম্মিলনের উপরেই ভারতের শুভাশুভ নির্ভর করে। সাহিত্যই এই মিলনের প্রশস্ত ক্ষেত্র।' এই মিলনকামিতাও ছিলো মুসলিম দৃষ্টি ও আক্রম থেকে। এই মিলনকামিতা উভয় পক্ষের সদিচ্ছা সত্ত্বেও যে বাস্তবভাবে ফলপ্রসূ হচ্ছিলো না, তার সাক্ষ্য দেবে মুসলমান-সম্পাদিত কাগজে মুসলমান লেখকের উপস্থিতি, হিন্দু-সম্পাদিত কাগজে হিন্দু লেখকের উপস্থিতি। 'সবুজ পত্রে' এস, ওয়াজেদ আলী লিখেছিলেন বটে, 'কল্লোল' পত্রিকায় নজরুল, জসীমউদ্‌দীন, আবদুল কাদির ছিলেন বটে, 'সওগাতে' রবীন্দ্রনাথ বা 'বুলবুলে' রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী-শরৎচন্দ্র অবতীর্ণ হয়েছেন—কিন্তু তবু পত্রিকাগুলি ছিলো স্ব-স্ব সমাজের প্রতিনিধি। (একমাত্র 'কল্লোলে'র সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক এই নিরিখে বিচার্য নয়, নজরুল ছিলেন ঐ পত্রিকার অন্যতম নায়ক)। হিন্দু-মুসলমান পরস্পর-মিলনকামিতা সত্ত্বেও, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুই ভাবনা-বেদনায় প্রবাহিত ছিলো, সামান্য ব্যতিক্রম বাদে এদের মধ্যে যথার্থ-অর্থে ছিলো না চিন্তার বিনিময়ও। রবীন্দ্রনাথ ও মুন্সী মেহেরুল্লাহ একই বছরে জন্মেছিলেন (১৮৬১), কিন্তু সার্বভৌম কবি রবীন্দ্রনাথের বহুধা কর্মের মধ্যে তিনি ছিলেন একদা ব্রাহ্ম সমাজের সেক্রেটারি, আর 'মুসলিম বাংলার রামমোহন' (মুহম্মদ আবদুল হাই) মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র ধ্যান-জ্ঞান ছিলো ইসলাম প্রচার। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৭) ও "আনোয়ারা" উপন্যাসের প্রণেতা নজিবর রহমান (১৮৭৮-১৯২৩) ছিলেন সমসাময়িক—প্রথমোক্তের চারণক্ষেত্র ছিলো হিন্দু সমাজ, দ্বিতীয়োক্তের মুসলিম সমাজ। সৃজন ও মননের দুই ক্ষেত্রেই হিন্দু-মুসলমানের ছিলো স্বভাবী বিভিন্নতা। একই কলকাতার কেন্দ্রে থেকেও তাঁরা ছিলেন দুই বিভিন্ন ধারার স্রাতক।

দুটি দৃষ্টান্ত দেবো।

১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় উত্থিত 'শিখা' গোষ্ঠীর কথা ধরা যাক। এঁরা 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন করেছিলেন। তার মধ্যে দ্রোহ ছিলো। কিন্তু বিপ্লব ছিলো না। তাঁদের প্রতিষ্ঠানের নামই ছিলো 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'।

www.pathagar.com

তাঁরা ইসলাম ধর্মকেই প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন বুদ্ধি ও প্রযুক্তির উপরে। তাঁদের প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবেদনে ছিলো এই পরিষ্কার বক্তব্য : 'শিখার প্রধান উদ্দেশ্য বর্ত্তমান মুসলমান সমাজের জীবন ও চিন্তাধারার গতির পরিবর্ত্তন-সাধন।' শিখা-গোষ্ঠীর কেন্দ্রনায়ক কাজী আবদুল ওদূদ (১৮৯৬-১৯৭০) হযরত মুহম্মদ (স.)-এর জীবনী রচনা ও কোরআন শরীফের অনুবাদ করেছেন। শিখা-গোষ্ঠীর তাবৎ কর্মকাণ্ডই মুসলিম সমাজ-কেন্দ্রিক।

দ্বিতীয়, নজরুল ইসলাম। সত্য, ঊনবিংশ শতাব্দীতে মীর মশাররফ হোসেনের তুল্য গদ্যপ্রতিভা (রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে) বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া তৃতীয় কেউ নেই। মীর বঙ্কিমচন্দ্রেরও স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন ঠিক, কিন্তু তিনিও পার্শ্ববর্তী হিন্দু সমাজকে তেমন নাড়া দিতে পারেননি, যা দিয়েছিলেন নজরুল। এই নজরুলই ছিলেন হিন্দু-মুসলমানের মিলনের আজ-পর্যন্ত-বিচারে শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। কিন্তু তাঁকেও হিন্দু-মুসলমান মিলনবাণী প্রচার করতে হয়েছে মুসলমান-সম্পাদিত পত্রিকায় এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলন-বাণী প্রচার সত্বেও, এ তথ্যও সর্বদা স্মরণীয় যে, তিনি বাংলা ইসলামী গানের স্রষ্টা এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নির্মাতা। তাঁর সংক্ষিপ্ত সাহিত্যিক জীবনের পুরোটাই ইসলাম ও মুসলমানের ধ্যাননে কেটেছে। বাঙালি-মুসলমানের দীর্ঘদিনের হিন্দু-মুসলমান মিলনের চিন্তা তাঁর মধ্যে চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে, প্রতিবেশী হিন্দু সমাজকে তিনিই তীব্রতমভাবে সচেতন করে তোলেন বাঙালি-মুসলমানদের অস্তিত্ব বিষয়ে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একদা একটি সাহিত্যিক তর্কে তিনি উত্থাপন করেছিলেন বিশ্ব-কবিতার একটি অপ্রতিরোধ্য 'মুসলমানী ঢঙে'র কথা।

'প্রবাসী,' 'ভারতবর্ষ', 'বসুমতী'র পাশে কলকাতাতেই উত্থিত হয়েছিলো 'সওগাত','বুলবুল', 'মোহাম্মদী'র মতো পত্রিকা। একই কলকাতায় পাশাপাশি বাস করে হিন্দু ও মুসলমান সমাজ তাদের আপন ঐতিহ্য ও গন্তব্য ঠিক করে নিচ্ছিলো। মুন্সী মেহেরুল্লাহ, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও ইসমাইল হোসেন সিরাজীর জাগরণকামী বক্তৃতা ও রচনামালা; সৈয়দ এমদাদ আলী, মওলানা আকরম খাঁ ও মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের কুশলী সম্পাদনাশক্তি; বেগম রোকেয়া, কাজী আবদুল ওদূদ ও মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর ভাবুকতা; আরো অসংখ্য লেখক ও কবির বহুমুখী উদ্যম; সর্বোপরি নজরুল ইসলামের অনন্যসাধারণ সাহিত্যকৃতি—এই সবই বাঙালি-মুসলমানের আত্মচেতনাকে স্থানিকতা থেকে মুক্ত করে চৈতন্যের

www.pathagar.com

এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত করেছিলো। বাঙালি-হিন্দু লেখক, এমনকি সাহিত্য-ঐতিহাসিকেরাও পুরোপুরি সচেতন ছিলেন না যে, তাঁদের একান্ত পাশ দিয়েই একটি শব্দহীন ধারা এগিয়ে চলেছে। তবে এখানেই স্মরণীয়, ঐ স্বাতন্ত্র্য কোনো উন্মূল ব্যাপার ছিলো না। বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ধারাবাহিকতা আর নবোন্মেষিত স্বাতন্ত্র্য সাধনা—এই দুয়ের মাত্রাবিতরণে এগিয়ে চলছিলো তাঁদের সাহিত্য। এই স্বাতন্ত্র্য সাধনাই মোহানায় এসে পড়ে দেশবিভাগের পর থেকে। অন্তত প্রায় একশো বছরের চাপ ছিলো তার উপরে। সাংস্কৃতিক চাপ। স্বাতন্ত্র্যের চাপ। একটি ভূখণ্ডকে কেন্দ্র করে সে মুক্তি পেলো। তারপর থেকে তার কেবল ক্রম-পরিণতি, অবিরল দুই ঝিনুকের চাপের ভিতর থেকে মুক্তার জন্ম-জন্মান্তরও বলা যেতে পারে।

সাহিত্য-ঐতিহাসিক মুহম্মদ আবদুল হাই বাঙালি-মুসলমান লেখকদের দুটি দলে ভাগ করেছিলেন—স্বাতন্ত্র্যধর্মী ও সমন্বয়ধর্মী দল। 'সুধাকর' পত্রিকাকেন্দ্রী ও তাঁদের অনুবর্তীদের তিনি বলেছেন স্বাতন্ত্র্যধর্মী; এঁরা ছিলেন ইসলামচিন্তিত। শেখ আবদুর রহিম, মুন্সী রেয়াজউদ্দিন আহমদ, পণ্ডিত রেয়াজউদ্দিন মাশহাদী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ স্বাতন্ত্র্যধর্মী। অন্য লেখকেরা, নজরুল ইসলাম যেমন—সমন্বয়ধর্মী। কিন্তু শেষ-বিশ্লেষণে দেখা যাবে, শুধু স্বাতন্ত্র্যধর্মী লেখকেরাই নয়, সমন্বয়ধর্মী লেখকেরাও সততই স্বধর্মনিষ্ঠ—নজরুল ইসলাম বা কাজী আবদুল ওদুদের মতো সমন্বয়ধর্মীরাও সতত ইসলাম ও মুসলমান নিয়ে ভাবনা-বেদনায় আক্রান্ত।

কী দেখা যাচ্ছে তাহলে? দেখা যাচ্ছে, একই স্থানের অধিবাসী হয়েও, একই দেশ-কালের বাসিন্দা হয়েও, বাঙালি-হিন্দু ও বাঙালি-মুসলমান লেখকেরা দুই ভিন্ন সাংস্কৃতিক আদর্শে উজ্জীবিত হয়েছিলেন বিভাগপূর্বকালে।

স্বাতন্ত্র্য থাকে তাহলে ভূখণ্ডে নয়, পরাধীনতায় নয়—অর্থাৎ নয় রাষ্ট্রে বা স্বাধীনতায়—স্বাতন্ত্র্য থাকে একটি জাতির চৈতন্যে বা আত্মায়। আর, কোনো বহিঃশক্তি নয়—আত্মিক শক্তিই মানুষের সবচেয়ে বড়ো শক্তি। চৈতন্যই তার নীলিমাভেদী নিশান।

জুলাই ১৯৮৬

www.pathagar.com

বেগম রোকেয়ার অন্তঃপরিবর্তন

সাহিত্যের ইতিহাসে বাঙালি-মুসলমান লেখকেরা দীর্ঘকাল উপেক্ষিত থেকেছেন। সুকুমার সেনের "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" নামে যে-চার খণ্ডে সম্পূর্ণ মহাকায় গ্রন্থ সাহিত্যের সবচেয়ে প্রামাণ্য ইতিহাস হিশাবে স্বীকৃত, সেখানেও বাঙালি-মুসলমান লেখকেরা প্রায় অনালোচিত। এই অভাববোধ থেকেই ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান, কাজী আবদুল মান্নান, ডক্টর আনিসুজ্জামান, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, নাজিরুল ইসলাম মুহম্মদ সুফিয়ান প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস রচনা করেছেন। তাঁদের ইতিহাস গ্রন্থসমূহে বাঙালি-মুসলমান লেখকেরা সসম্ভ্রমে উপস্থিত। ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও, এইসব ইতিহাসগ্রন্থেই প্রথমবারের মতো বাঙালি-মুসলমান লেখকদের সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লেখা হয়, অনেক সময় তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের পটে, সমকালীন হিন্দু লেখকদের পরিপ্রেক্ষিতে। এমনকি কোনো-কোনো মুসলমান লেখককে নিয়ে বিস্তারিত-ভাবে আলোচনা হয় এই প্রথম—যেমন মীর মশাররফ হোসেনের মতো অসাধারণ লেখকও এই প্রথম বিশদ পর্যালোচিত হন।

মোটামুটি চল্লিশ বছর (১৯৪৭-৮৬) অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা ধ'রে নিতে পারি অবহেলিত বাঙালি-মুসলমান লেখকদের সম্পর্কে প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এখন ঐসব লেখকদের বিচারে অন্তঃপ্রবেশ দরকার, বিভিন্ন বিচিত্র সূক্ষ্ম স্তরগ্রামের শনাক্তিকরণ জরুরি, একজন লেখকের কেন্দ্রীয় স্বভাবের মধ্যে অনেক চড়াই-উৎরাই, টানাপোড়েনের আবিষ্কার সম্ভব। লেখকের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্ব-কূটাভাসগুলিকে গভীর দরদ ও ও অন্তশ্চক্ষু দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। আর মনে রাখতে হবে, লেখকও চলিষ্ণু—একটি প্রত্যয়ে স্থিত হ'য়েও সে যেহেতু মানুষ, নানা গলি-উপ-গলির মধ্য দিয়ে তার মানসযাত্রা। সব মিলিয়ে সে কিন্তু অভিযাত্রিক, আর সে-অভিযাত্রা সত্যের সন্ধিৎসায়।

www.pathagar.com

বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) লেখিকা হিশাবে বিংশ শতাব্দীর সমবয়সী, এবং চৈতন্যেও তিনি বিংশ শতাব্দীর সন্তান। বুদ্ধিজীবী, লেখিকা ও কর্মী—এই তিন রূপে তাঁর বিকাশ। আবার তাঁর প্রতিভার তাবৎ বিচ্ছুরণ একটিই জ্যোতিষ্মান কেন্দ্র থেকে, কিংবা তারা পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট ও ওতপ্রোত। বাঙালি জাতি, বাঙালি-মুসলমান, নারীশিক্ষা, নারীজাগরণ—তাঁর ভাবনাশীলতা এইসব কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। স্কুল প্রতিষ্ঠা, সংস্থা প্রতিষ্ঠা—এই সব তাঁর কর্মের পরিধি। লেখিকা হিশাবে চিন্তাবাহী গদ্যই তাঁর প্রধান মাধ্যম। গল্প, কবিতা, নকশা ও উপন্যাসের মধ্য দিয়েও তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেই সবের ভিতরে একটি উৎকাঙ্খাই তীব্র হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে—নারীজাগরণ তথ্য সমাজহিত।

১৯০৪-৩২, এই আটাশ বছর ছিল বেগম রোকেয়ার সাহিত্য চর্চার কাল। তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'নিরীহ বাঙ্গালী' (১৩১০ শালে প্রথম প্রকাশিত), শেষ প্রবন্ধ 'নারীর অধিকার' (তাঁর মৃত্যুর পরে ছাপা হয়েছে)। অন্তর্বর্তী-কালে তাঁর মানস বহুলভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। পরিবর্তিত এই রেখা-মালার শনাক্তিকরণই বর্তমান রচনার অভীষ্ট।

তাঁর প্রথম পর্যায়ের দুটি প্রবন্ধ : 'বোরকা' (প্রথম প্রকাশ : 'নবনূর,' বৈশাখ ১৩১১) ও 'আমাদের অবনতি' (প্রথম প্রকাশ : 'নবনূর,' ভাদ্র ১৩১১)। দুটি প্রবন্ধই 'মতিচুর' প্রথম খণ্ডের (১৯০৫) অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে দ্বিতীয় প্রবন্ধটির নাম হয় 'স্ত্রীজাতির অবনতি' এবং তার পাঁচটি পরিচ্ছেদ বর্জিত হয়।

'বোরকা' প্রবন্ধটির সারাৎসার এরকম কয়েকটি বাক্য থেকে নির্ণয় সম্ভব: 'আমাদের ত বিশ্বাস যে অবরোধের সহিত উন্নতির বেশী বিরোধ নাই।' 'অবরোধ প্রথা স্বাভাবিক নহে, নৈতিক।' 'আমরা অন্যায় পর্দা ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পর্দা রাখিব।' এমনকি তিনি বলছেন : 'মোটের উপর আমরা দেখিতে পাই সকল সভ্য জাতিদেরই কোন-না-কোন রূপ অবরোধ-প্রথা আছে। এই অবরোধ-প্রথা না থাকিলে মানুষ ও পশুতে প্রভেদ কি থাকে? এমন পবিত্র অবরোধ প্রথাকে যিনি "জঘন্য" বলেন তাঁহার কথার ভাব আমরা বুঝিতে অক্ষম।'

এই প্রবন্ধে রোকেয়া দেখিয়েছেন, 'সভ্যতার সহিত অবরোধ প্রথার বিরোধ নাই।' তবে তার সীমাও নির্ধারণ ক'রে দিয়েছেন তিনি : 'তবে সকল নিয়মেরই একটি সীমা আছে। এ দেশে আমাদের অবরোধ-প্রথাটা

www.pathagar.com

বেশী কঠোর হইয়া পড়িয়াছে। যেমন অবিবাহিতা বালিকাগণ স্ত্রীলোকের সহিতও পর্দা করিতে বাধ্য থাকেন। কখন কোন প্রতিবেশিনী আসিয়া উপস্থিত হইবে, এই ভয়ে নবম বর্ষীয়া বালিকা প্রাঙ্গণে বাহির হয় না। এইভাবে সর্বদা গৃহকোণে বন্দিনী থাকায় তাহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়।

দ্বিতীয়তঃ তাহাদের সুশিক্ষার ব্যাঘাত হয়। যেহেতু খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয়া আত্মীয় ব্যতীত তাহারা অন্য কাহাকেও দেখিতে পায় না, তবে শিখিবে কাহার নিকট? নববধূদের অন্যায় পর্দাও উল্লেখযোগ্য।'

রোকেয়া এই প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, 'সম্প্রতি আমরা যে এমন নিস্তেজ, সংকীর্ণমনা ও ভীরু হইয়া পড়িয়াছি, ইহা অবরোধে থাকার জন্য হয় নাই—শিক্ষার অভাবে হইয়াছে।' এবং তাঁর মোট সিদ্ধান্ত : 'বোরকা জিনিসটা মোটের উপর মন্দ নহে।'

এই রোকেয়াই পরবর্তীকালে লেখেন, "অবরোধবাসিনী" (১৯২৮), এবং অবরোধের বিরুদ্ধে কঠিনতম ধিক্কার উচ্চারণ করেন।

'আমাদের অবনতি' তথা 'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধের বর্জিত পাঁচটি অনুচ্ছেদে ছিল চূড়ান্ত বিদ্রোহী উক্তিসমূহ। যেমন : 'আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কোন বিশেষ ধর্মের নিগূঢ় মর্ম বা আধ্যাত্মিক বিষয় আমার আলোচ্য নহে। ধর্মে যে সামাজিক আইন-কানুন বিধিবদ্ধ আছে, আমি কেবল তাহারই আলোচনা করিব, সুতরাং ধার্মিকগণ নিশ্চিন্ত থাকুন। পুরাকালে যে-ব্যক্তি প্রতিভাবলে দশজনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আপনাকে দেবতা কিম্বা ঈশ্বর-প্রেরিত দূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এবং অসভ্য বর্বরদিগকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ক্রমে যেমন পৃথিবীর অধিবাসীদের বুদ্ধি-বিবেচনা বৃদ্ধি হইয়াছে সেইরূপ পয়গম্বরদিগকে (অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেরিত মহোদয়দিগকে) এবং দেবতাদিগকেও বুদ্ধিমান হইতে বুদ্ধিমত্তর দেখা যায়।। তবেই দেখিতেছেন, এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ-রচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে।' রোকেয়া স্বভাবত যুক্তিশীল বলেই তিনি ধর্মকে আক্রমণের সময়ও ভোলেন না তাঁর লক্ষ্য ধর্মের 'নিগূঢ় মর্ম বা আধ্যাত্মিক বিষয়' নয়, ধর্মপ্রণীত 'সামাজিক আইন কানুন'। বর্জিত ঐ পাঁচটি অনুচ্ছেদের অন্যত্র তিনি বলেছেন '.....যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক।.....যেখানে ধর্ম-বন্ধন শিথিল, সেখানে রমণী প্রায় পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থায় আছেন।'

www.pathagar.com

এই উক্তির পরেই রোকেয়া এই বাক্যটি যোগ করতে ভোলেন না, 'এস্থলে ধর্ম অর্থে ধর্মের সামাজিক বিধান বুঝিতে হইবে।'

এই রোকেয়াই উত্তরকালে ঈদ ('ঈদ-সম্মিলন'), মুহররম ('পিপাসা'), হজ্ব ('হজ্বের ময়দানে') নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন, মিসেস এ্যানি বেশান্তের 'ইসলাম' শীর্ষক বক্তৃতার অনুবাদ করেছেন ('নূর-ইসলাম')। রোকেয়ার প্রথম পর্যায়ের রচনাগুচ্ছ প্রকাশিত হয়েছিলো সৈয়দ এমদাদ আলী-সম্পাদিত 'নবনূর' পত্রিকায়। ঐ রচনাগুচ্ছে দেখা যাবে তাঁর পৃষ্ঠপট অনেক সময় সমগ্র বাঙালি সমাজ, কিন্তু রোকেয়ার বাস্তববোধ কখনোই স্ব-সমাজকে লংঘন করে যায়নি। যে-অবরোধ প্রথার কথা তিনি বলেছেন, তা মুসলমান সমাজের। অন্যত্রও তাঁর বেদনা থেকে জাগ্রত হয়েছে ঐ সমাজের শুভত্বের বাসনা :

১. কবে মুসলমান "মানুষ" হইবে? রসনা পূজা ছাড়িয়া ঈশ্বর পূজা করিতে শিখিবে? জগতের অনেক জাতি জাগিয়া উঠিয়াছে, ভাল-মন্দ বুঝিয়াছে; কেবল ইহাদের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। এখনত আমাদের আর সে জরির মসনদ তাকিয়া বা দুগ্‌ধফেননিভ শুভ্র কুসুম-কোমল "শাহানা বিছানা" নাই, তবে নিদ্রা যাইতেছি কোন সুখে?..... পরিশেষে বলি, জীবন-ধারণের নিমিত্ত আহার করিতে হয়, খাইবার আশায় জীবন-ধারণ করা উচিত বোধ হয় না। ভরসা করি, এবার রমযান শরীফে আপনারা সাবধান থাকিবেন।

'রসনা-পূজা', 'নবনূর', অগ্রহায়ণ ১৩১১]

২. ঈদ-সমাগমে আজি আমাদের সে দুঃখ যামিনীর অবসান হউক। ঈদের বালার্কের সহিত আমাদের অন্ধকার হৃদয়ে নব-আশার নবনূর উদ্দীপ্ত হউক। সমষ্টির মঙ্গলের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ পদদলিত হউক! বলিয়াছি ত, এবার আমরা একতা মসজিদে ফেলিয়া আসিব না। আমাদের এ মহাব্রতে ঈশ্বর সহায় হউন।

['ঈদ-সম্মিলন', 'নবনূর', পৌষ ১৩১২]

৩. আজি ১০/১২ বৎসর হইতে দেখিতেছি, আমাদের মুসলমান সমাজে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে—চারিদিকে বেশ জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, নানা প্রকার সভা সমিতি গঠিত হইয়াছে।..... কিন্তু প্রকৃত মুক্তির দ্বার উদঘাটনের মন্ত্রটি, অর্থাৎ স্ত্রী শিক্ষার বিষয় ভুলিয়া ছিলেন দেখিয়া আমি মৃদু হাস্য করিতাম।.... এখন মুসলমান

www.pathagar.com

সমাজ বুঝিয়াছেন, স্ত্রী শিক্ষা ব্যতীত এ অধঃপতিত সমাজের উন্নতির আশা নাই।

['সিসেম ফাঁক,' 'সওগাত,' অগ্রহায়ণ ১৩২৫]

স্বসমাজ, স্বধর্ম সম্পর্কে এই ভাবনাধারাই পরবর্তীকালে মোহানায় এসে মেশে। 'ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম' নামক লিখিত বক্তৃতায় তাই রোকেয়া বলেন, '.....এ স্কুলের উন্নতি কেন চাই?—চাই নিজের সুখ্যাতি বাড়াবার জন্য নয়, স্বামীর স্মৃতি রক্ষার জন্য নয়, চাই বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের কল্যাণের জন্য।'

অধ্যাপক গোলাম মুরশিদ লিখেছেন, 'তাঁর [রোকেয়ার] মুসলমান পরিচয়ই শেষ জীবনে প্রকট। "আমরা" "মুসলমান" শব্দের সমার্থক তখন। একদা যিনি ধর্মীয় উৎসবের দিনেও হিন্দু ভাইদের ভুলে থাকতে পারেননি, বলেছেন সমুদয় বাঙালি এক বঙ্গের সন্তান, কেবল মুসলমান বলে নিজেকে চিহ্নিত করার তাঁর পরবর্তী প্রয়াস তাই বিস্ময়কর। সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে যে মানসিক ঔদার্যের কথা তিনি এককালে বলেছিলেন, সে অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁর আয়ত্তে ছিলো। কিন্তু স্ব-সম্প্রদায়ের উন্নতি, সংস্কার এসব তাঁর উদ্বেগের কারণ হয়। এমনকি খৃস্টানরা মুসলমানদের নানা কৌশলে ধর্মান্তরিত করেছেন—এ-ও তাঁর রচনার বিষয়ভুক্ত হয়েছে।' ('ঐতিহ্যের সঙ্গে আপোষ : বেগম রোকেয়ার নারীমুক্তি ভাবনা,' শিবনারায়ণ রায়-সম্পাদিত 'জিজ্ঞাসা', কার্তিক ১৩৮৭, ১:৩) আমরা দেখিয়েছি রোকেয়ার রচনার পৃষ্ঠপট হিশাবে সব সময়ই মুসলমান সমাজ উপস্থিত। তাঁর নারীজাগরণও তো পরিষ্কার বাঙালি-মুসলমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই ('মুসলমানদের যাবতীয় দৈন্য-দুর্দশার একমাত্র কারণ স্ত্রী শিক্ষায় ঔদাস্য।'—'বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি','সওগাত', চৈত্র ১৩৩৩) উপান্ত জীবনে রোকেয়া যদি স্বধর্ম ও স্বসমাজ সম্পর্কে আরো চিন্তিত হয়ে থাকেন, তাহলে বলতে হবে তিনি হয়েছেন আরো ব্যাপক-গভীর। স্বসম্প্রদায়ের উন্নতি বা সংস্কারের চেষ্টা সাম্প্রদায়িকতা নয়—মনুষ্যত্বেরই প্রথম প্রস্ফুটন। রোকেয়া ঐতিহ্যের সঙ্গে আপোষ করেননি—তিনি ছিলেন ঐতিহ্যসচেতন, শিকড়সংলগ্ন,—উন্মূল বা অক্ষিত নন।

নিঃসন্তান বেগম রোকেয়া তাঁর একটি ভাষণে 'আমার কোন বংশধর নাই' বলায় পঞ্চাশ বছর আগে মওলানা আকরম খাঁ প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পঞ্চাশ বছর পরে আমরা আর-একবার প্রতিবাদ করছি।

জুলাই ১৯৮৬

www.pathagar.com

বাংলাদেশ নজরুলকে যা দিয়েছিলো

'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য', নজরুল ইসলামের এই উক্তি তাঁর জীবন ও সাহিত্যের দ্বি-চারিত্র মনে পড়িয়ে দ্যায়। নজরুল একদিকে বিদ্রোহী, অন্যদিকে প্রেমিক। তাঁর সমস্ত কাব্যগ্রন্থকে পরিষ্কার দু'ভাগে ভাগ করা যায় : একদিকে "অগ্নি-বীণা", "বিষের বাঁশী", "জিঞ্জীর", অপরদিকে "ছায়ানট", "দোলন-চাঁপা", "সিন্ধু-হিন্দোল", "চক্রবাক"। সামাজিক-রাজনৈতিক বিদ্রোহের দামামা একদিকে, অন্যদিকে প্রেম-প্রাকৃতিক কোমলকান্ত পদাবলি। এই দুই নজরুল মিলেই সমগ্র নজরুল। নজরুল কখনো মহৎ হতেন না, কিংবা পূর্ণাঙ্গ, যদি এর একটিকে বর্জন করতেন। নজরুলের মহত্ব হচ্ছে এখানেই যে, মাত্র ৪৩ বছরের (১৮৯৯-১৯৪২) সুস্থ জীবনে, মাত্র ২৪ বছরের (১৯১৯-৪২) সক্রিয় সাহিত্যকর্মে তিনি জীবনের প্রায় সমস্ত প্রদেশ সফর করেছেন। নজরুলের বিদ্রোহের যেমন বাস্তব ভূমি ও ভিত্তি ছিলো, তেমনি তাঁর কবিতায় প্রেম-প্রকৃতির মঞ্জরীও ফুটেছিলো বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির জমি থেকেই। তাঁর দ্রোহ ও প্রেম কোনো জীবন-বিচ্যুত ব্যাপার ছিলো না, তা ছিলো জীবনেরই অঙ্গীভূত। তাই নজরুল যতো বড়ো বিদ্রোহী, ততো বড়ো প্রেমিকও। দ্রোহ আর প্রেমিকতা এই কবির ভিতরে এমন আশ্চর্য সাযুজ্যে মিলেছিলো যে তাঁর বিদ্রোহে লেগে-ছিলো মধ্যদিনের দীপ্তি, মধ্যরাত্রির তমসালিপ্ত জ্যোৎস্না। অর্থাৎ তাঁর বিদ্রোহ ছিলো রোমান্টিক বিদ্রোহ। কবিশোভন বিদ্রোহ। রোমান্টিক, কিন্তু বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীসুলভ ড্রয়িংরুম-বিলাসী নয়। এরিখ মারিয়া রেমার্ক-কথিত 'অ-রোমান্টিকদের রোমান্টিসিজম'ও নয়।

তাঁর এই প্রেম-প্রাকৃতিক সত্তাকে বর্ণিলতা দিয়েছিলো তৎকালীন পূর্ব-বঙ্গের, বর্তমান বাংলাদেশের, নারী ও নিসর্গ। রুপ্টিজলের মতো কবি তা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন কবিতায়, গানে। হুমায়ুন কবির-প্রোক্ত বাংলাদেশের প্রকৃতির কোমল শ্যামলিমা রুদ্র নজরুলকে ভরিয়ে দিয়েছিলো স্নিগ্ধতায়। তাঁর চারিত্রে আরক্ত রাঢ়ভূমির সঙ্গে মিলিয়েছিলো সবুজ বাংলাদেশকে।

www.pathagar.com

নজরুল ইসলামের জন্ম বর্ধমানে, পশ্চিম বাংলায়। কিন্তু এক সময়কার পূর্ব বাংলা বা বর্তমান বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগসূত্র রচিত হয়েছিলো। তাঁর অনেক লেখা এদেশে বসে লেখা, বাংলাদেশের নারী ও নিসর্গ তাঁর অনেক রচনার অন্তর্দেশে কাজ ক'রে গেছে। পশ্চিম বাংলার মানসপ্রকৃতির সঙ্গে পূর্ব বাংলার মানসপ্রকৃতির একটি পার্থক্য আছে। "বাংলার কাব্য" গ্রন্থে হুমায়ূন কবির অনেক আগেই তা চিহ্নিত করেছিলেন। তা হচ্ছে মূলত বাংলাদেশের নদীমাতৃকতায় ও আবেগের নিজস্বতায়। বাংলাদেশের নিসর্গ ও নারী নজরুলকে বারেবারে বিমুগ্ধ করেছে। নার্গিস ও প্রমীলা, যে-দুই নারী তাঁর জীবনে ওতপ্রোত যুক্ত, দু'জনই বাংলাদেশের মেয়ে। বাংলাদেশে লেখা তাঁর রচনার পরিচয়ের সূত্রেই এসে পড়ে বাংলা-দেশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের প্রগাঢ় মুহূর্তগুলো। আমরা আগে এই বিষয়টি একবার ধারাবাহিক দেখে নিতে চাই।

১৯১৪ শালে, নজরুলের বয়স যখন মাত্র পনেরো, তখন আসানসোলে নজরুল পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর কাজী রফিজউদ্দীন আহমদের দৃষ্টিতে পড়েন। রফিজউদ্দীন শাহেবের বাড়ি ছিলো ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার কাজীর-শিমলা গ্রামে। রফিজউদ্দীন তাঁর সেই দেশের বাড়িতে নজরুলকে পাঠিয়ে দেন। তারপর নজরুল কাজীর-শিমলা গ্রামের কাছের দরিরামপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এক বছর নজরুল দরিরামপুরে ছিলেন। জীবনীকারের ভাষায়, 'সেই তাঁর পূর্ব বাংলার সঙ্গে প্রথম পরিচয়, যা পরে গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে।' তারপর ১৯২১ শালে নজরুল কুমিল্লায় আসেন আলী আকবর খানের আমন্ত্রণে। ততোদিনে কবি বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন। এখানেই কবির সেই বহুবিতর্কিত বিবাহের ব্যাপারটি ঘটে—সৈয়দা খাতুন বা নার্গিস আসার খানমের সঙ্গে। পরের বছর, ১৯২২ শালে, কবি আবার কুমিল্লায় আসেন, প্রমীলার সঙ্গে পরিচয়। কলকাতায় চলে গিয়ে, বছরের শেষ দিকে 'ধূমকেতু' প্রাসঙ্গিক গ্রেফতারী পরোয়ানা এড়াতে, আবার কুমিল্লায় আসেন এবং এখানেই গ্রেফতার হন। কুমিল্লার মেয়ে প্রমীলার সঙ্গে কলকাতায় বিবাহ সম্পন্ন হয়। ১৯২৪ শালে কুড়িগ্রাম সফর করেন, ১৯২৫ শালে ফরিদপুর। ১৯২৬ শালে প্রথম ঢাকায় আসেন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র বার্ষিক সম্মিলনীতে। সে-বছরই চট্টগ্রাম ও সিলেটে ভ্রমণ করেন। ১৯২৭ ও '২৮ শালেও কবি ঢাকায় এসে-ছিলেন। ১৯২৮ শালে সিলেট, রংপুর, রাজশাহী প্রভৃতি ভ্রমণ করেন। ১৯২৯

www.pathagar.com

শালে সফর করেন দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ, কুষ্টিয়া, বগুড়া প্রভৃতি। ১৯৩২ শালে চট্টগ্রাম ও পাবনা। ১৯৪০ শালে ঢাকা বেতার-কেন্দ্রের প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠানে কবি এসেছিলেন সংগীতানুষ্ঠানে। সুস্থ অবস্থায় কবির সেটাই শেষ সফর। তারপর, সবাই জানেন, ১৯৭২ শালে নির্বাক কবি ঢাকায় নীত হন। এবং এখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে ১৯৭৬ শালে। আজ এই বাংলাদেশের মাটিতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁর মরদেহ শায়িত রয়েছে।

নজরুল সুস্থ ছিলেন মাত্র তেতাল্লিশ বছর। এই তেতাল্লিশ বছর তিনি ছিলেন ক্লান্তিহীনভাবে ভ্রমণশীল। এই ভ্রমণতালিকায় বারবার এসেছে বাংলাদেশ। ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, রংপুর, ফরিদপুর, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, যশোর, খুলনা, পাবনা, কুষ্টিয়া, ঢাকা—বাংলাদেশের হৃদয়ে কবির এই ক্রমাগত সফরগুলো তাঁর সাহিত্যকে দিয়েছে নূতন আয়তন ও সমৃদ্ধি। যে-কোনো কবি বা শিল্পীর জীবন ও সাহিত্য অবিচ্ছেদ্য। নজরুলের ক্ষেত্রে এই উক্তি আরো সত্যি—কেননা সাহিত্যিক নজরুল সম্পূর্ণই উন্মোচিত। আর সেই উন্মোচনে দেখি বাংলাদেশের তিনটি প্রধান স্থান—ঢাকা, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম—বিশিষ্ট ভূমিকা উদযাপন করেছে। কলকাতা, হুগলি বা কৃষ্ণনগরের তুলনায় নজরুল-সাহিত্যে তার গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়।

নজরুল ইসলামের সত্তার দুটি দিক—একটি বিদ্রোহের দিক, একটি প্রেম-প্রকৃতির। 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণ-তূর্য,' কবি নিজেই বলেছেন। বাংলাদেশ তাঁর হাতে বাঁশরী তুলে দিয়েছিলো। অর্থাৎ রোমান্টিকতা। সেই রোমান্টিকতারও দুটি স্তর আছে—প্রেমের ও প্রকৃতির। বাংলাদেশ নজরুলের কবিতায় ও গানে সৃষ্টি করেছে নারী ও নিসর্গের সম্মোহ। 'বিদ্রোহী' যখন লিখেছেন কবি, তখনই লিখলেন প্রেমিকার উদ্দেশে সমর্পিত বিনত কবিতা 'বিজয়িনী', অগ্রহায়ণ ১৩২৮ এ কুমিল্লায় ব'সে লেখা : 'হে মোর রাণী। তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে।/আমার বিজয়-কেতন লুটায় তোমার চরণ-তলে এসে।' অনেক সময় বাংলাদেশে ভ্রমণের সময় নিসর্গের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন কবি : ট্রেনে কুমিল্লার পথে যেতে লেখেন 'নীল পরী', রাত্রিবেলা আর-একবার পথে লেখেন 'জয়দেবপুরের পথে' বা 'চাঁদনী রাতে' কবিতাটি। বাংলাদেশের দিনের আর রাত্রির সৌন্দর্য এই দুটি কবিতায় মূর্ত হয়ে ধরা দিয়েছে।

www.pathagar.com

"সিন্ধু-হিন্দোল" গ্রন্থের 'সিন্ধু', অন্যান্য অনেকগুলো কবিতা চট্টগ্রাম, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জে রচিত। দৌলতপুরে প্রেম ও বিচ্ছেদের যে-একগুচ্ছ কবিতা লিখেছিলেন নজরুল, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য : 'হার-মানা হার', 'মানস-বধূ', 'অ-বেলায়', 'অনাদৃতা', 'বিদায়-বেলায়', 'পাপড়ি-খোলা', 'বেদনা-অভিমান', 'হারা-মণি', 'বিধুরা পথিক-প্রিয়া' ইত্যাদি। ঢাকায় লেখা হয়েছে অনেকগুলো গান ও গজল : 'এ বাসি বাসরে আসিলে কে গো', 'নিশি ভোর হল জাগিয়া', 'আমার কোন কূলে আজ', 'এত জল ও কাজল চোখে', 'মাটির উর্দ্ধে গান গেয়ে ফেরে' ইত্যাদি। সন্দ্বীপ নিয়ে গীতিনাট্য লেখেন নজরুল, 'মধুমালা'। ১৯৪০ শালে শেষবারের মতো সুস্থ নজরুল ঢাকায় এসে বেতার-কেন্দ্রের বার্ষিক অধিবেশনে গেয়েছিলেন 'আমি পূরব দেশের পুরনারী', ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষায় ছড়া, চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় শাম্পানের গান, বা পূর্ব বাংলার ভাষায় ছড়া ও কবিতার প্রসঙ্গও উল্লেখযোগ্য। 'জয়দেবপুরের পথে'র মতো অসামান্য নিসর্গ কবিতা বা 'সিন্ধু'র মতো বিচ্ছেদের উত্তাল কবিতা বা 'বাতায়ন-পাশে গুবাকতরুর সারি'র মতো গভীর নির্জন মর্মস্পর্শী কবিতা বাংলাদেশেরই একান্ত দান। কিন্তু নজরুল কেবল কবিই ছিলেন না। অথবা কবি হিশাবেও তাঁর ভূমিকা কখনোই ছিলো না চিন্তালেশ-শূন্য, এবং মাটি বা মানুষের সঙ্গে সম্পর্কহীন। বাংলাদেশে এসে নজরুল কবিতা বা গান লিখেছেন যেমন, তেমনি অনেকগুলো ভাষণও দিয়েছেন। এই ভাষণগুলো নজরুলের চিন্তার জগৎটিকে খুলে দেয় আমাদের সামনে।

আগস্ট ১৯৮৬

www.pathagar.com

নজরুল ও নির্বাসিত কয়েকজন

নজরুল ইসলামের জন্মই শুধু পশ্চিম বঙ্গে নয়, তাঁর কর্মক্ষেত্রও ছিলো কলকাতা। তৎকালীন পূর্ব বাংলায়--ঢাকায়, চট্টগ্রামে, কুমিল্লায় কিংবা আরো কোনো-কোনো শহরে তিনি অতিবাহিত করেছেন অনেক সময়, একবার কৃষ্ণনগরে বছর দুয়েক একটানা কাটিয়েছিলেন, কিন্তু কলকাতা-কেই তাঁর সমস্ত সৃজনকর্মের লীলাভূমি বলা চলে নির্দ্বিধায়। আর বিশের ও তিরিশের দশকের ঢাকা সংস্কৃতি-তৎপর হ'লেও, কলকাতা ছিলো সাহিত্য-সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় রাজধানী। যতোদিন-না ঢাকা, ১৯৪৭-এর পরে, হয়ে ওঠে বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় কেন্দ্রভূমি।

১৯৪২ শালে নজরুল চিরকালের মতো অসুস্থ হ'য়ে পড়েন। সে অসুস্থতার মধ্যেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন ১৯৭৬ শালে। এই নজরুল—রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও সুভাষচন্দ্র বসু, মোহিতলাল মজুমদার ও কাজী আবদুল ওদুদের মতো তদানীন্তন প্রতিষ্ঠিতদের দ্বারা সংবর্ধিত, কল্লোল যুগের অন্যতম নায়ক, দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সম্মানের পাত্র। কিন্তু ১৯৪২-এ তাঁর স্থায়ী অসুস্থতার পর তাঁর নামের উপরে দ্রুত নেমে আসতে থাকে অন্ধকার। এটা ঠিকই, তাঁর অসুস্থতার এই প্রায় ৫০ বছর পরে যদি একটি তালিকা প্রণয়ন করা যায়, তাহেল পশ্চিম বাংলা থেকে প্রকাশিত নজরুল-বিষয়ক রচনা একেবারে কম হবে না। কিন্তু তার অধিকাংশ নজরুলের বন্ধুদের স্মৃতিচারণ। আজহারউদ্দীন খান, সুশীল কুমার গুপ্ত, বাঁধন সেনগুপ্ত বা মধুসূদন বসুর যে-সব আলোচনা-সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে, তার অধিকাংশ আকাডেমিক। সৃষ্টিশীল ও প্রতিভাবান লেখকদের রচনায়-আলোচনায় তিনি অধিকাংশ সময়ে অনুপস্থিত। প্রতিষ্ঠিত প্রধান পত্রিকাসমূহে তিনি প্রায় অনালোচিত। নজরুলকে নিয়ে গবেষণার সমূহ সুযোগ রয়েছে কলকাতাতেই, কিন্তু তা খুব সামান্যই হয়েছে—ধারাবাহিক ও অনুপুঙ্খ নয়। কলকাতায় তথা পশ্চিমবঙ্গে যথার্থ তদন্ত চালালে আজো নজরুলের বহু রচনা আবিষ্কৃত হবে, তাঁর জীবনের বহু অজ্ঞাত তথা উন্মোচিত হবে, এবং সে-কাজ তো স্বাভাবিকভাবেই নির্দিষ্ট

www.pathagar.com

পশ্চিমবঙ্গের গবেষক, লেখক, সমালোচকদের জন্যে। পশ্চিম বাংলার জনপ্রিয়তম সাপ্তাহিক 'দেশ' বছর-বছর একটি সাহিত্য-সংখ্যা প্রকাশ করে। সেখানে, এবং ঐ পত্রিকার সাধারণ সংখ্যাতেও, নজরুলের অজ্ঞাত ও অপ্রকাশিত রচনা, কিংবা তাঁর আলোচনা-সমালোচনা, আদৌ কি দেখেছি? অমরেন্দ্র চক্রবর্তী-সম্পাদিত 'কবিতা-পরিচয়' পত্রিকায় বা তার গ্রন্থধৃত সংকলনে দেখেছি আমরা রবীন্দ্রনাথ থেকে বিনয় মজুমদার পর্যন্ত আলোচিত হয়েছেন, রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী বা সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতাও সেখানে অন্যতম বিবেচ্য, কেবল মধ্যবর্তী একজন কবি বাদ গেছেন, তিনি: নজরুল ইসলাম। এবং এ কেবল অসংখ্যের মধ্যে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত। এই নজরুল আজীবন তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে ছিলেন হিন্দু-মুসলমানের মিলনসাধক, বাঙালি লেখকদের মধ্যে তিনিই এই মিলনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা।

অন্য আরো দু'একজন লেখকের কথা ধরা যাক। শাহাদাৎ হোসেনের জন্ম পশ্চিম বাংলায়। দেশবিভাগের পরে তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন, কিছু দিন রেডিও-র মুখপত্র 'এলান'-এর সম্পাদনাও করেন, কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক পাকিস্তানের নাগরিকত্ব না-পেয়ে তিনি ফিরে যান। এই শাহাদাৎ হোসেনের লাশ পড়ে ছিলো কলকাতার একটি হাসপাতালে, লাশ নেবারও কেউ ছিলো না, অনেক পরে খবর পেয়ে তাঁর দাফনের ব্যবস্থা হয়। পশ্চিম বাংলার সাহিত্যে আজ তাঁর কি চিহ্নমাত্র আছে?

মুসলিম কবিদের কাব্যসংগ্রহ "কাব্য-মালঞ্চ" সম্পাদনা করেছিলেন কবি আবদুল কাদির ও প্রাবন্ধিক রেজাউল করিম। আবদুল কাদির কর্মময় জীবনান্তে মৃত্যুবরণ করেছেন ঢাকায়। আর রেজাউল করিম? বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তাঁর বেশ-কিছু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিলো এক সময়। বছর কয়েক আগে কলকাতার একটি মুসলিম-পরিচালিত পত্রিকায় তাঁর একটি সাক্ষাৎকার পড়েছিলাম। আজো বেঁচে আছেন কিনা জানি না। কিন্তু পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতিজগতে আজ তাঁর কি ভূমিকা আছে কোনো?

মনে করা যাক, কাজী আবদুল ওদুদ আর হুমায়ুন কবিরের কথা। কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৬-১৯৭০) রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও নজরুল সম্পর্কে গভীর বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেছেন, 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের কেন্দ্রীয় পুরুষ। দেশবিভাগের পরে তিনি স্বেচ্ছায় ঢাকা থেকে চলে যান কলকাতায়। জর্মান কবি গ্যেটের বিষয়ে দুই খণ্ডে

www.pathagar.com

মহাকায় গ্রন্থ রচনা করেছেন। কুরআন শরীফের অনুবাদ ও হযরত মুহম্মদ (স.)-এর জীবনী রচনা তাঁর বিশিষ্ট কীর্তি। বাংলা অভিধানও প্রণয়ন করেছেন। মোহিতলাল মজুমদার ও কাজী আবদুল ওদুদ এক সময় সমালোচক হিশাবে সমভাবে খ্যাতিমান ছিলেন। আর হুমায়ূন কবির (১৯০৬-৬৯) একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক ও দার্শনিক। জওহরলাল নেহেরু ও মওলানা আবুল কালাম আজাদের ঘনিষ্ঠ। অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ও অধ্যাপক (দর্শন)। স্বদেশ ও বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টরেট' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছে। ভারত সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। ভারতে তো বটেই, পৃথিবীর বহু দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বক্তৃতা করেছেন। ত্রৈমাসিক, বর্তমানে মাসিক 'চতুরঙ্গে'র তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। কান্টের দর্শনের একটি অপ্রকাশিত অধ্যায় তিনিই জর্মান ভাষা থেকে ইংরেজি ভাষায় প্রথম অনুবাদ করেন। তিরিশের বাঙালি লেখকদের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ও সহযোগী। আজকে পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এঁদের সামান্যতম স্বাক্ষর কি পাওয়া যায়?

নজরুল ও কয়েকজনের কথা বললাম—যাঁরা কলকাতা তথা পশ্চিম বঙ্গে বসে অবিসংবাদী প্রোজ্জ্বল কাজ করেছেন, কিন্তু সেখানকার সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে নির্বাসিত।

কিন্তু, শেষ-পর্যন্ত, সাহিত্যের ইতিহাসে কে কাকে নির্বাসন দ্যায়? সেখানে আছে প্রকৃত শিল্পীর স্থায়ী বাসস্থান।

আগস্ট ১৯৮৬

www.pathagar.com

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

মুসলমান সাহিত্যিই হউক, আর হিন্দু সাহিত্যিই হউক সেগুলি স্বতন্ত্রভাবে এবং সমগ্রভাবে বাঙালী সাহিত্য হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হইলেও মুসলমানকে তাহার স্বতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। .....মুসলমানের নিজস্ব ভাব ও চিন্তাধারায় বাঙলাকে সুশোভিত করিতে হইবে।

—মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

সাজ্জাদ হোসাইন খান
প্রিয়বরেষু,

আজ ৮ই নবেম্বর। সাহিত্যিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর (১৮৯৬-১৯৫৪) মৃত্যুবার্ষিকী। এখন রাত। যতো রাতই হোক, আজ তাঁকে আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ সম্পন্ন করবো। তোমার অনুরোধে আমাদের এই পূর্বসূরী বিষয়ে লিখতে বসেছি। তাঁকে আমরা ভুলেছি, যেমন আরো অনেককে। বাঙালি-মুসলমান এখনো পুরো সংস্কৃতিবান হয়ে উঠতে পারেনি—পারলে তার নির্মাতাদের এরকম গ্লানিহীনভাবে ভুলে যেতে পারতো না। পূর্বসূরীরা এরকম নামহীন ও নিরুপাধিক একের পর এক ডুবে যেতেন না। মনে রাখার ভার যাঁদের উপরে, তাঁদের কথাই মনে পড়ে বেশি করে। তাঁদের বিস্মরণ-শক্তি অসীম। দেখে-শুনে আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবতে ভয় হয়। কিন্তু ভয় নয়—শেষ-পর্যন্ত ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় আস্থা রাখি, মানুষের অগ্রগমনের যতিহীন প্রগতিশীলতায় আস্থা রাখি।

মরহুম মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীকে আমি দেখিনি, কিন্তু তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে চিনতাম। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মরহুম সুশোভন আনোয়ার আলী ছিলেন জাত সম্পাদক, সরকারী পত্রিকার অচলায়তনেও তিনি খুলে রেখেছিলেন জানালা-দরোজা। আমার সমকালীন তরুণদের তিনি যে-অবাধ প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, তা ছিলো যেমন আন্তরিক তেমনি গভীর। আমাদের সেই প্রথম উত্থানের কালে, ষাটের দশকে, আমার একটি গল্প ছেপে তাঁকে মুশকিলে পড়তে হয়। লিখিত জবাবদিহি। অন্য সম্পাদক হলে হয়তো আমার বিষয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলতেন, তিনি তারপরও আমাকে বাধ্য করেছিলেন লিখতে। সুদর্শন, একটু-খেয়ালি, প্রকৃতার্থে প্রগতিশীল সুশোভন আনোয়ার আলীকে দেখে—আজ বুঝতে পারি—তাঁর পিতার তেজস্বী, নির্ভীক, পরাজিত-

www.pathagar.com

অপরাজেয় জীবনী জেনে, তাঁর পিতার রক্ত বইছিলো তাঁর ভিতরে। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর উত্তরাধিকার কি আমরা বহন করতে পারছি আমাদের চেতনায় ও অস্তিত্বে?

উনিশ শতাব্দীতে বাংলার রেনেসাঁস সংঘটিত হয়েছিলো এদেশে, কিন্তু তা অসম্পূর্ণই ছিলো, কেননা দেশের জনসাধারণের বৃহদংশ বাঙালি-মুসলমানের অংশ গ্রহণ তাতে ছিলো না। বাঙালি-মুসলমানের রেনেসাঁসের সূচনা হয় অনেক পরে—বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে, বিশের দশক তার একটি চূড়া, নজরুল ইসলাম এই রেনেসাঁসের প্রধান পুরুষ। নির্মাতাদের মধ্যে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী অন্যতম। বয়সে নজরুলের চেয়ে ছিলেন কয়েক বছরের বড়ো, তাঁর সাহিত্যিক উত্থানও নজরুলের আগে, কিন্তু প্রকৃত আত্মপ্রকাশ নজরুলের সমকালে বিশের দশকেই ঘটেছিলো।

ব্যক্তিজীবনে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ছিলেন সাংবাদিক। 'মোহাম্মদী', 'নবযুগ', 'সাম্যবাদী', 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা,' 'দি মুসলমান', 'সওগাত,' 'বুলবুল' প্রভৃতি পত্রিকায় কাজ করেছেন। শেষ-জীবনে দীর্ঘ বিশ বছর (১৯৩৫-৫৪) ছিলেন সাতক্ষীরার বাঁশদহ নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে স্বনির্বাসিত। আদর্শ ও অর্থাভাব প্রথম থেকে শেষ-পর্যন্ত ওয়াজেদ আলীর সঙ্গী ছিলো। আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছেন, 'ওয়াজেদ আলী ছিলেন আদর্শবাদী, আদর্শের জন্য যে-কোনো দুঃখবরণে তাঁর কোনোরূপ কুণ্ঠা ছিল না। মনের এই আদর্শবাদ তাঁর সাহিত্য রচনায়ও প্রতিফলিত হয়েছিল। এইজন্যই তাঁর রচনায় সবল সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশেরই চেষ্টা দেখা যেত, তাতে কুজ্‌ঝটিকা সৃষ্টির কসরৎ কখনো দেখিনি।' ('মাহে-নও') শামসুননাহার মাহমুদ লিখেছেন, 'জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বোধহয় তাঁর লেখনী থামেনি। কিছুদিন আগে শোনা গেল তাঁর অসুখের খবর। তিনি অসুস্থ! সে তো নতুন কিছু নয়। তিনি যে চিরকেলে রোগা মানুষ! সাংসারিক অভাব-অনটন, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। সেও তো চিরকাল শুনে এসেছি।' ('মাসিক মোহাম্মদী', অগ্রহায়ণ ১৩৬১) আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন, 'ওয়াজেদ আলী ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধীরস্থির ও গোছালো চিন্তাবিদ। তিনি যেমন গোছাইয়া লিখিতে বা বলিতে পারিতেন চিন্তাও করিতেন তেমনি গোছালো ভাবে।' ('সওগাত,' অগ্রহায়ণ ১৩৬১) 'বার্ষিক সওগাত'-এর প্রথম বর্ষ ১৩৩৩ সংখ্যায় 'সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পরিচয়' শিরোনামে কয়েকজন জীবিত মুসলমান সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের সংক্ষিপ্ত

www.pathagar.com

পরিচয় ও ফোটো ছাপা হয়েছিলো। এতে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর পরিচিতিতে বলা হয়, 'ইংরাজী, বাঙলা ও সংস্কৃত ভাষার উপর ইঁহার বিশেষ অধিকার আছে। ইঁহার রচনাসমূহের মধ্যে যৌক্তিকতা ও সূক্ষ্ম-দর্শিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি স্পষ্টবাদী, নির্ভীক ও তেজস্বী পুরুষ।' ১৯৪১ শালে 'সওগাতে' 'আধুনিক মুসলিম সাহিত্য' নামে একটি প্রবন্ধে বলা হয়, 'যদি কাজী আবদুল ওদুদের সাহিত্যের কোনো মূল্য থাকে সে আমাদের এই মুক্তবুদ্ধির ব্যাপারে। তিনি নির্ভয়ে মুক্ত-বুদ্ধিকে আহবান করেছেন। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবূ সয়ীদ আইয়ুব প্রমুখ লেখকদের মধ্যে এই আন্দোলনেরই বিকাশ দেখা যায়। তবে এঁরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে পাশ্চাত্য দর্শনের কাছ থেকে পাঠ নিয়েছেন।' (অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮) তাঁর মৃত্যুর পরে 'মাসিক মোহাম্মদী'র সম্পাদকীয়তে বলা হয়, 'মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আমাদের গদ্যসাহিত্য দরিদ্র। ওয়াজেদ আলী তাঁর মূল্যবান রচনায় আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সাংবাদিক হিসাবেও তাঁর দান বহুকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।' (অগ্রহায়ণ, ১৩৬১) সমসাময়িক গুণীজন ও পত্র-পত্রিকার এইসব অভিমত সংকলন করে আমরা এটাই বোঝাতে চাচ্ছি যে, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর প্রতিপত্তি তাঁর সমকালে ছিলো দৃঢ়মূল।

প্রথম জীবনে দু'একটি কবিতা ('আল-এসলামে' প্রকাশিত) লিখলেও, মাঝে-মাঝে দু'একটি গল্প লিখলেও, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ছিলেন মূলত প্রাবন্ধিক, চিন্তাবিদ, মননধর্মই ছিলো তাঁর সহজাত। 'সহচর', 'আল-এসলাম', 'কোহিনূর,' 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা', 'মাহে-নও', 'মোহাম্মদী', 'সাম্যবাদী', 'সওগাত,' 'নও-বাহার,' 'দিলরুবা' প্রভৃতি পত্রিকায় আমি তাঁর প্রায় একশো প্রবন্ধের সন্ধান পেয়েছি। আমার প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী তাঁর প্রথম রচনা 'প্রাকৃতিক ধর্ম কি?' (অনুবাদ) 'কোহিনূর' পত্রিকায় মাঘ ১৩২২ শালে প্রকাশিত হয়েছিলো; প্রথম নিজস্ব রচনা 'নামাজের দার্শনিক তত্ত্ব' মোহাম্মদ আকরম খাঁ-সম্পাদিত 'আল-এসলাম' পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ শালে প্রকাশিত। আর শেষ, ১৯৫৪ শালে, তাঁর মৃত্যু-বৎসরে। সেদিক থেকে তাঁর সৃষ্টিকাল চার দশক।

এই চার দশকে অবিশ্রাম লিখেছেন তিনি। উপান্ত জীবনে গ্রামে স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ করলেও তাঁর কলম কখনো থেমে ছিলো না। ভাষা

www.pathagar.com

ও সাহিত্য, ধর্ম ও সমাজ, শিক্ষা ও ইতিহাস প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে ছিলো তাঁর সতত জাগ্রত আগ্রহ। জীবনের শেষ দুই দশক রাজধানী থেকে দূরে থাকায় বরং একটি স্বচ্ছ ও মুক্ত দৃষ্টিই তাঁর অর্জনে ছিলো। আসলে দৃষ্টির এই স্বচ্ছতা ও মুক্ততা ছিলো তাঁর সারা জীবনেই।

অবিরল লিখলেও গ্রন্থভাগ্য তাঁর ভালো ছিলো না। বুলবুল পাবলিশিং হাউস ও আদিল ব্রাদার্স থেকে দু-চারটি বই বেরিয়েছিলো মাত্র। হযরত মুহম্মদের (স.) জীবনীগ্রন্থ "মরু-ভাস্কর" তার মধ্যে খ্যাততম। এই গ্রন্থ লিখে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রসূলুল্লাহ্ সম্পর্কে বাঙালি-মুসলমান লেখকদের যে-রচনা-ধারা তার সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করেন। "স্মার্ণা-নন্দিনী" অনুবাদ-গ্রন্থ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর নারীজাগৃতি বিষয়ে উৎসাহ ও সমর্থনের স্মারক। বুলবুল পাবলিশিং হাউসের পরিকল্পিত 'উন্নত জীবন গ্রন্থমালা' সিরিজে স্যার সৈয়দ আহমদ, নবাব আবদুল লতিফ প্রমুখ সম্পর্কে ছোটোদের উপযোগী কয়েকটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন—তার সবগুলি প্রকাশিত হয়নি। এর মধ্যেও তাঁর ঐতিহ্যচেতন আদর্শবাদী মনের প্রকাশ দ্রষ্টব্য। তাঁর পরিকল্পিত কয়েকটি গ্রন্থের মধ্যে ছিলো "যুগের মন," "কাহিনী ও নকশা," "বিচিত্রা" ইত্যাদি। শেষ-পর্যন্ত এসব প্রকাশিত হয়নি। ১৯৫৪ শালে মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস আগে একটি পত্রে অধ্যাপক মুহম্মদ আবূ তালিবকে তিনি লেখেন, '....আমার সাহিত্যিক প্রকাশ বহুলতঃ কাগজের পাতাতে বন্দী হয়ে আছে। বলার কিছুই নেই কেননা একে একরকম অলংঘ্য অদৃষ্ট বলে না মেনে গত্যন্তর দেখিনে। আমার আর একটা মুশকিল এই যে, আমার লেখায় কিছুটা যুক্তিবাদের মানে, স্বাধীন চিন্তার, স্পর্শ থাকে। আমাদের ধর্মার্ত সমাজে তা পছন্দ করার লোক বেশী নেই।'

হ্যাঁ, এই স্বাধীন চিন্তার ক্ষুরস্য ধারাতেই তাঁর পরিচয় মুদ্রিত হয়ে আছে। বাঙালি-মুসলমানের সাবালক চিন্তাধারার প্রথম প্রকাশ কবিতায় নয়, গদ্যে। আর তার একটি পুষ্পিত ও পল্লবিত শাখা মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর গদ্যরচনাসমূহ। বিশের দশকে একদিকে ছিলেন বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অগ্রণী পুরুষেরা : কাজী আবদুল ওদূদ, আবুল হোসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, মোতাহের হোসেন চৌধুরী; অন্যদিকে আন্দোলনের বাইরে স্বস্থ আবুল কালাম শামসুদ্দীন, তেজস্বী মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী। স্মরণীয়, তিরিশের প্রাবন্ধিকেরাও—বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অন্নদাশংকর রায় প্রমুখ—ছিলেন এঁদের সমকালীন। কিন্তু এঁরা যেহেতু ভিন্ন একটি সমাজ

www.pathagar.com

থেকে আগত. কাজেই এঁদের সমস্যা ছিলো স্বতন্ত্র। আবু সয়ীদ আইয়ুব যেহেতু বাঙালি-মুসলমান সমাজের লোক নন, কাজেই তিনিই উন্নততর সংস্কৃতিবান অংশের উত্তরাধিকার বহন করেছেন। কিন্তু কাজী আবদুল ওদুদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীদের সমস্যা ছিলো স্বতন্ত্র। তাঁরা একটি জায়মান সংস্কৃতির নির্মাতা ছিলেন। বাঙালি সংস্কৃতির বৃহত্তর অংশে তাঁদের দৃষ্টি ছিলো, আবার যে-বিশেষ ধর্ম-সমাজের অধিবাসী তাঁরা তাও ছিলো তাঁদের চিন্তায়। তাই বুদ্ধদেব বসু ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, আবু সয়ীদ আইয়ুব ও অন্নদাশংকর রায়ের মতো তাঁরা বিশুদ্ধ সাহিত্যিক ভাবনা-বেদনায় লিপ্ত থাকতে পারেননি। সমাজের সর্বমুখে তাঁদের জিজ্ঞাসা জাগ্রত রাখতে হয়েছে।

আর সেদিক থেকেই মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রেনেসাঁসী চারিত্র-লক্ষণে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছেন। কখনো-কখনো মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীকে মনে হয়েছে স্ববিরোধী, কিন্তু সব-মিলিয়ে একটি সমীকৃত সংশ্লেষণে তিনি পৌঁছেছিলেন। আবহমান বাঙালি সংস্কৃতিকে তিনি অগ্রাহ্য করতে চাননি, কিন্তু নিজের স্বাতন্ত্র্যকেও তিনি রাজি হননি খোয়াতে। তাই তাঁকে প্রতি পদে হতে হয়েছে যুক্তিশীল। কিন্তু ঐ যুক্তিমালার নেপথ্যে তাঁর অন্তঃশীল আবেগ ও আদর্শ গোপন থাকেনি। তাই কোনো যান্ত্রিকতায় নয়, হৃদয়ের স্পর্শেই তাঁর রচনা পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে। ভুল হয়তো তিনি করেন, কিন্তু তারপর আবার পরিশোধন করেন। নিজের ও অন্যদের সঙ্গে তর্ক করতে-করতে অগ্রসর হন। 'বুলবুলে' প্রকাশিত তাঁর 'হিন্দু-মুসলিম' (আশ্বিন, ১৩৪৩) প্রবন্ধের আলোচনা-প্রত্যালোচনায় অংশ নিয়েছিলেন লীলাময় রায় (অন্নদা-শংকর রায়), কাজী আবদুল ওদুদ ও সৈয়দ এমদাদ আলীর মতো প্রাজ্ঞ ব্যক্তিবৃন্দ। তাঁর আদর্শের খ্যাতির জন্যে মহাত্মা গান্ধীর আহবান এসেছিলো তাঁর কাছে, তাঁর 'যুগের মন' প্রবন্ধ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে নাড়া দিয়েছিলো, নজরুল ইসলাম তাঁর মধ্যে পেয়েছিলেন বাঙালি-মুসলমানের ভবিষ্যতের ভরসা।

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির যে-স্ব-স্ব সমীকরণের উদ্দেশে আজ আমরা চলেছি, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীকে সেখানে পাবো এক দিশারী হিশাবে।

নভেম্বর ১৯৮৬

www.pathagar.com

সেই সনাতন সমস্যা

গত শুক্রবার (২৮শে নবেম্বর, ১৯৮৬) দুপুরবেলা একটি সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থের প্রকাশন-উৎসব হলো বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে। ছোটো অনাড়ম্বর কিন্তু আন্তরিক অনুষ্ঠান। প্রায় ঘরোয়া পর্যায়ের—যদিও নামে আনুষ্ঠানিক। যে-গ্রন্থের প্রকাশন উৎসব আগের দিন রাতে বাড়ি ফিরে তার ফর্মাগুলো পেয়েছিলাম, তখনো বাঁধাই হয়নি। রাতে এবং সকালে ফর্মাগুলোয় মোটামুটি চোখ বুলিয়ে নিয়েছিলাম। অনুষ্ঠানে গিয়ে আরক্ত-লাল মলাটের সুদর্শন বই পেলাম। অন্তরঙ্গ পরিবেশে মাত্র কয়েকজনের উপস্থিতিতে আলোচনা অনুষ্ঠান হলো।

বইটি একটি কবিতাগ্রন্থ। আমাদের বন্ধু মার্কিন-প্রবাসী কবি ওমর শামসের দ্বিতীয় কবিতাগ্রন্থ "খোয়াবনামা"। ওমর শামস খুব পরিচিত কবি নন—সেজন্যে তাঁর একটু পরিচয় দিই। ওমর শামসের বিষয় পদার্থ-বিদ্যা, স্বাধীনতার পর থেকে আমেরিকায় চাকরিরত। কবিতা লেখেন, চিত্রকলা ও সংগীতের গভীর অনুরাগী। দেশে থাকতে চিত্রকলা বিষয়ে লিখেছেন কিছু-কিছু। বছর তিনেক আগে দেশে যখন ফিরেছিলেন একবার, তখন বেরিয়েছিলো তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ "বোধিবৃক্ষতলে"। বিদেশে থাকলেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর অসম্ভব উৎসাহ—কবিতা ও ভাবনাপ্রধান গদ্য, দুই দিকেই। মার্কিনদেশে থাকায় সুবিধা হয়েছে তাঁর মানস প্রসারের, শিল্পসাহিত্যের বহু বিচিত্র উৎস থেকে রস ও আনন্দ আহরণের। তাঁর প্রিয় সংগীত ও চিত্রকলা তাঁর কবিতার নেপথ্যে-প্রকাশ্যে স্বাভাবিকভাবেই কাজ করে গেছে।

এই লেখা যখন বেরুচ্ছে, ওমর শামস ততোদিনে আমেরিকার পথে পাড়ি জমিয়েছেন ফের। আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুমণ্ডলীতে তিনি একটি উষ্ণ উজ্জ্বল আবহ সঞ্চার করে গেলেন। অমিয় চক্রবর্তী বা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মতো তিনিও প্রবাসে থেকে সাহিত্যে নিবিষ্ট। তাঁদের সাফল্য ওমর শামস এখনো পাননি সত্যি, কিন্তু তরুণ এই কবি-প্রাবন্ধিকের সাহিত্য-প্রেমে ও নিষ্ঠায় কোনো খাদ নেই। একদিন যদি তিনি পূর্বোক্তদের তুল্য হন বা তাঁদের অতিক্রম করেন, তাহলে আমাদের চেয়ে কেউ বেশি খুশি হবে না।

www.pathagar.com

মূল প্রসঙ্গে আসি। অনুষ্ঠানে নানা দিক থেকে নানা কথা উঠলো। একটি উক্তি আঘাত করলো আমাকে। ওমর শামসের প্রথম বইয়ের নাম ছিলো "বোধিবৃক্ষতলে", দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম "খোয়াবনামা"। শুধু এই নামের ভিত্তিতেই একজন প্রশ্ন তুললেন যে, ওমর শামস কি অগ্রগমন করছেন, না পশ্চাৎভ্রমণ করছেন?

আমার ভাষণে আমি যা বলেছিলাম ও বলতে চাই, তার প্রাসঙ্গিক সারাৎসার এরকম।—

"বোধিবৃক্ষতলে" বইয়ের নাম-কবিতার কেন্দ্র-নায়ক বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেব এই উপমহাদেশের মহত্তম মানুষ। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতি অসীম শ্রদ্ধাশীল। বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ বাংলা সাহিত্যে বারংবার এসেছে—এবং খুব সংগত ও স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। এই মহামানব জীবন ও মৃত্যুর গভীরতম উজ্জ্বল ও কৃষ্ণ স্তরে-স্তরে প্রবেশ করে মানুষের জন্যে যে-মণিরত্ন সংগ্রহ করে এনেছেন, তার মূল্য চিরকালীন। কবিতায় তার বন্দনা বা বর্ণনা একান্ত স্বাভাবিক। ওমর শামস কোনো অন্যায় কাজ করেননি,যেমন অন্যায় করেননি "খোয়াবনামা" নাম ব্যবহার ক'রে। খোয়াব বা খা'ব শব্দটি বাংলাদেশে বহুল পরিচিত। খোয়াবনামার বৈজ্ঞানিকতা যা-ই থাক, বাংলাদেশের ঘরে-ঘরে খোয়াবনামা দেখা যায়। কবি বা শিল্পী যেমন ইতিহাস নিয়ে কাজ করেন, তেমনি তিনি একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর প্রতিভূ। কবিতায় কবির জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে তার জনগোষ্ঠীর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া কাজ করে যায়। কোনো লেখকই তার পরিপার্শ্বকে অস্বীকার করতে পারেন না, যতো আত্মকেন্দ্রিকই তিনি হোন না কেন। এই এক আশ্চর্য সমাজে বাস করছি আমরা, যেখানে বৌদ্ধ ঐতিহ্যকে স্বীকার করা যাবে, কিন্তু ইসলামী ঐতিহ্যের প্রয়োগ দেখলেই তাকে বলা হবে বিজাতীয়। আমাদের মানে বাঙালি-মুসলমানের ঐতিহ্যের ধারা এসেছে দু'দিক থেকে —মাটির দিক থেকে (ভারতবর্ষ) আর ধর্মের দিক থেকে (আরব-ইরান)। বাঙালি-মুসলমানের ঐতিহ্য বিমিশ্র, বিমিশ্র বলেই জটিল ও সমৃদ্ধ। হিন্দু ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার আমরা বহন করছি, বৌদ্ধ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার আমরা বহন করছি, আর ইসলামী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার তো বটেই। হিন্দু বা বৌদ্ধ ঐতিহ্য আমরা যখন ব্যবহার করি, তখন কথা ওঠে না, কিন্তু ইসলামী ঐতিহ্যের ব্যবহার দেখলেই অনেকের মন ও মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আর এটা হয় সম্যক জ্ঞানের অভাবে। অন্ধ অনুবর্তনের ফলে।

www.pathagar.com

হ্যাঁ, আমি পরিষ্কার বলতে চাই, বাঙালি-হিন্দুর সঙ্গে বাঙালি-মুসলমানের সাযুজ্য বাঙালিত্বে, বৈযুজ্য হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্বে। হিন্দু ধর্ম ভারতবর্ষে কেন্দ্রিত; কিন্তু ইসলামের উৎসারণই ভারতের বাইরে থেকে। কাজেই বাঙালি-মুসলমান উপমহাদেশের সমস্ত ঐতিহ্য স্বাঙ্গীকরণের পরেও আরব-ইরানের দিকে তাকিয়ে থাকে। নজরুল ইসলামের একটি গানে বলা হয়েছে: বাংলাদেশে বসে দূর আরবের স্বপ্ন দেখি। বাঙালি-মুসলমানের এই স্বপ্নদর্শন বা কল্পভ্রমণ একান্ত স্বাভাবিক। এই স্বপ্নদর্শনের কথা এখন-পর্যন্ত যাঁরা সবচেয়ে তীব্রভাবে বলেছেন—নজরুল ইসলাম ও ফররুখ আহমদ—তাঁরাই এই সমাজের সবচেয়ে দ্রোহী পুরুষ। এই জনগোষ্ঠীর নিকটতম প্রতিভূ তাঁরা অন্ধ অনুবর্তন করেননি—সাহস করে নিজের সমাজের কথা বলেছেন। বাঙালি-মুসলমান এমন একটি ভীরু জাতি, যার নিজের মনের ও ঘরের কথা বলতেও সাহসের প্রয়োজন হয়। আমরা লোকভয়ের কাছে, মিথ্যার কাছে সত্যকে জবাই করেছি। আমাদের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে আমাদের অধিকাংশ জনগণের ব্যবধান মেরুপ্রতিম।

প্রতিদিনের সমতল জীবনে আমরা হঠাৎ কোনো দুঃখ বা সুখের আঘাতে উজ্জীবিত হয়ে উঠি। চিন্তার ক্ষেত্রেও তেমনি। প্রকাশন উৎসবের ঐ হঠকারী উক্তির পরে-পরেই আর-একটি বিষয় হঠাৎ করেই নজরে পড়লো কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'দেশ'-এর সাম্প্রতিক (২২শে নভেম্বর ১৯৮৬) সংখ্যায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিখ্যাত লেখক। মানুষ হিশাবে ব্যক্তিগতভাবে জানি, তিনি ভালোমানুষ। তিনি "পূর্ব-পশ্চিম" নামে একটি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখছেন 'দেশে'। এই উপন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য করার সময় এখনো আসেনি—কেননা উপন্যাস সমাপ্ত হলেই তাঁর বক্তব্য বোঝা যাবে, কিন্তু ভ্রান্ত বা বিভ্রান্ত উক্তির উল্লেখ তো করাই যায়। ঐ সংখ্যার এক জায়গায় তিনি লিখছেন: ১৯৬৫ শালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের, অধুনাতন বাংলাদেশের, একটি বর্ণনায়—মৌলভিরা ঘোষণা করলো জেহাদ। কেউ-কেউ কোমরে তলোয়ার ঘুরিয়ে মসজিদে যেতে লাগলো নামাজ পড়তে, জেহাদের সময় তা সুন্নত।—এই তথ্য তিনি কোথায় পেলেন, জানি না। কিন্তু এর হাস্যকরতা আমাদের জানিয়ে দ্যায় যে, যে-বিষয়ে তিনি লিখছেন তার সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান শোচনীয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এঞ্জিনিতে কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন স্বস্থ লেখক। তিনিও-যে

www.pathagar.com

এরকম উক্তি উচ্চারণ করতে পারলেন, তা দেখে আমরা বুঝি, বাঙালি-মুসলমান সম্পর্কে বাঙালি-হিন্দুর অজ্ঞতা কত গভীর।

সম্ভবত প্রমথ চৌধুরীই বলেছিলেন, সংকীর্ণতার সীমা আছে, কিন্তু ঔদার্যের কোনো সীমা নেই। কথাটিকে উল্টো ক'রে ঘুরিয়ে বলতে ইচ্ছা হয়, জ্ঞানের সীমা আছে বটে, কিন্তু অজ্ঞানতার সীমা নেই।

ডিসেম্বর ১৯৮৬

আলোচনা

১ঃ আতাউর রহমান খান

আপনার সম্পাদিত দৈনিক সংগ্রামের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে চতুর্থ পৃষ্ঠায় আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখিত 'সেই সনাতন সমস্যা' শীর্ষক একটি রচনায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত কলিকাতায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় 'পূর্ব-পশ্চিম' নামক একটি ধারাবাহিক উপন্যাসের বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়া তাহা হাস্যকর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে প্রবন্ধ-কারের জ্ঞান শোচনীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং আরও মন্তব্য সংযোগ করিয়াছেন। আমি উক্ত উপন্যাস কিংবা তাহার প্রকাশিত অংশও পড়ি নাই। সুতরাং কোন পটভূমিকায় কিংবা কি উদ্দেশ্যে বা প্রসঙ্গে এই ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু উদ্ধৃত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কথা উল্লেখ করিতে পারি। মৌলভীরা জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন কি না, তাহাও জানি না। তবে, বায়তুল মোকাররমে আমি জুমার নামায আদায় করিতে গিয়া কিছু সংখ্যক নও-জোয়ানের কোমরে খাপের ভিতর টিনের তলোয়ার ঝুলিতে দেখিয়া মনে কৌতূহলের উদ্রেক হয়। আমি দুইজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কি? তাহারা বলিল, দেশে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে; এই অবস্থায় সর্বদা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকা সুন্নত। বলিলাম, যুদ্ধ তো হইতেছে এক হাজার মাইল দূরে পশ্চিম পাকিস্তানে, এখানে নয়। উত্তরে বলিল, সেটা আমাদের দেশ নয়? সেখানে যুদ্ধ মানে আমাদের যুদ্ধ। তাহাদের জেহাদ, আমাদের জেহাদ

www.pathagar.com

হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। খুব আবেগের সাথে কথাগুলি বলিল। আমার মনে পড়ে, আমাদের টেলিভিশনেও এই দৃশ্য দেখিয়াছি। এই প্রসঙ্গে আরও একটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি।

ঐ সময়ে বহুসংখ্যক কিশোরী-যুবতী-তরুণীদের চাকায় রাইফেল শিক্ষার প্রশিক্ষণ নিতেও দেখিয়াছি। নির্দিষ্ট স্থানে তাহারা মাটির উপর উপুড় হইয়া রাইফেল চালনা শিক্ষা করিতেছে। তাহাদের জনৈক পরিচালককে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে সেও প্রায় একই ধরনের উত্তর দেয়। বলে, বলা তো যায় না কখন আমাদের এই এলাকাও আক্রান্ত হয়। না হইলেই বা কি। পশ্চিম পাকিস্তান তো আমাদেরই দেশ। সেখানে জেহাদ হইলে সেটা আমাদেরও জেহাদ হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। বলিলাম, যুবক-তরুণরাই তো যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে পারে। তাহারাই তো এই কাজের যোগ্য। বলিল, আমাদের মেয়েরাও তাহাদের চাইতে কম কিসে? তাহাদেরও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তা করিয়া প্রস্তুত রাখিতে হইবে। প্রয়োজনে তারাও সাহায্যে আগাইয়া আসিবে ইত্যাদি।

এই দৃশ্যও টেলিভিশনে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে।

সুতরাং ঐ গ্রন্থের উদ্ধৃত অংশ ভিত্তিহীন বলিয়া কিংবা শোচনীয় জ্ঞানের পরিচায়ক বলিয়া মন্তব্য করা সঠিক হয় নাই।

ডিসেম্বর ১৯৮৬

২ঃ খাদেম হাফিজ

গত ৪ঠা ডিসেম্বর দৈনিক সংগ্রাম সাহিত্য বিভাগে প্রকাশিত ষাটের দশকের ধীমান কবি ও গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর 'সেই সনাতন সমস্যা' শিরোনামের লেখাটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। জনাব সৈয়দ লেখাটি উপস্থাপন করেছেন তাঁরি বন্ধু মার্কিন প্রবাসী কবি ও প্রবন্ধকার ওমর শামসের কবিতাগ্রন্থ "খোয়াবনামা"-এর আলোচনা প্রসঙ্গে। আর এ গ্রন্থের উপর আলোচনা অনুষ্ঠানটি গত ২৮শে নবেম্বর সম্পন্ন হয় বিশ্বসাহিত্যকেন্দ্রে। তাঁর কথায়, 'অনুষ্ঠানে নানা দিক থেকে নানা কথা উঠলো। একটি উক্তি আঘাত করলো আমাকে। ওমর শামসের প্রথম বইয়ের নাম ছিলো "বোধিবৃক্ষতলে", দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম "খোয়াবনামা"। শুধু এই নামের

www.pathagar.com

ভিত্তিতেই একজন প্রশ্ন তুললেন যে, ওমর শামস কি অগ্রগমন করছেন, না পশ্চাৎগ্রমণ করছেন?'

প্রশ্নকর্তার এহেন প্রশ্নের জবাব প্রসঙ্গে জনাব সৈয়দ বেশ কিছু অপ্রিয় সত্য বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তাঁর ভাষায় : 'এই এক আশ্চর্য সমাজে বাস করছি আমরা, যেখানে বৌদ্ধ ঐতিহ্যকে স্বীকার করা যাবে, কিন্তু ইসলামী ঐতিহ্যের প্রয়োগ দেখলেই তাকে বলা হবে বিজাতীয়।...হিন্দু বা বৌদ্ধ ঐতিহ্য আমরা যখন ব্যবহার করি তখন কথা ওঠে না, কিন্তু ইসলামী ঐতিহ্যের ব্যবহার দেখলেই অনেকের মন ও মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।'

তার কারণ নির্দেশ করতে যেয়ে তিনি বলেছেন, 'আর এটা হয় সম্যক জ্ঞানের অভাবে। অন্ধ অনুবর্তনের ফলে।' জনাব সৈয়দ-এর উত্তর সম্পূর্ণ মেনে নেয়া যায় না, শুধু আংশিক সত্য বলে ধরে নেয়া যায়। ইসলামী ঐতিহ্যের ব্যবহার দেখলেই যদি তার জের স্বরূপ অনেকের মন ও মেজাজ খারাপ হয়ে যাওয়া অবদিই বিষয়টি সীমাবদ্ধ থাকতো তবে হয়তো জনাব সৈয়দ-এর জবাব মেনে নিতে আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো বিষয়টি সেই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে কি না। থাকে না। উপরন্তু কোনো কোনো মহল সেই বিষয়টিতে রাজনৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য আপত্তি তোলেন। আর এ আপত্তি ইতিহাস সমর্থিত নয়। লেখক নিজেও ভালোভাবে জানেন। তাই সম্যক জ্ঞানের অভাবে বা অন্ধ অনুবর্তনের ফলে এটা হয়। তাঁর এ কারণ নির্ধারণ অপ্রিয়, পুর্ণ সত্য নয়।

কারণ, আমরা মনে করি, জীবন যখন আছে সেখানে সমস্যাও আছে। আর সমস্যা যখন আছে সেখানে রাজনীতি অবিশ্যি থাকবে। অর্থাৎ সামাজিক প্রতিটি মানুষ কোনো না কোনো ভাবে রাজনৈতিক জীব। তাই লেখকের উত্তর দানও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিলো। তিনি কিন্তু সম্পূর্ণ এড়িয়ে যান।

অবশ্য সেজন্য লেখককে অভিযুক্ত করা যায় না। কারণ লেখক নিজের সীমাবদ্ধতার দোষকে মেনে নিয়েই যেন বলেছেন, 'বাঙালি-মুসলমান এমন একটি ভীরু জাতি, যার নিজের মনের ও ঘরের কথা বলতেও সাহসের প্রয়োজন হয়। আমরা লোকভয়ের কাছে, মিথ্যার কাছে সত্যকে জবাই করেছি।'

www.pathagar.com

অন্যদিকে আমাদের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর সংগে আমাদের অধিকাংশ জনগণের ব্যবধান মেরু-প্রতিম বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর ঐ মন্তব্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু সে ব্যবধানের হেতু কি, তিনি তা উল্লেখ করেননি, অথচ সে সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন ছিলো।

জনাব সৈয়দ সবশেষে তাঁর লেখায় বাঙালি-মুসলমান সম্পর্কে বাঙালি হিন্দুর অজ্ঞতার গভীরতা সম্পর্কে খানিকটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে তিনি সে মাল-মশলা পেয়েছেন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন সুস্থ লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি আপত্তিকর উক্তি থেকে। আর তা প্রকাশ পেয়েছে কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'দেশ'-এর সাম্প্রতিক (২২শে নবেম্বর, ১৯৮৬) সংখ্যায়।

অবিশ্যি এ অজ্ঞতাজনিত হীনমন্যতার জন্য বিখ্যাত লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে এককভাবে দোষ দেয়া যায় না। আমরা মনে করি, তিনি তাঁর পূর্বসূরী জাতভাইদের জাত রক্ষা করতে এমনটি করেছেন। শত হলেও রক্তের টান। যেমন "বিবেকানন্দ রচনা সমগ্রে"র পৃষ্ঠা নং ৫৭৯-৫৮০তে 'মহম্মদ' চ্যাপটারে বলা হয়েছে : 'মহম্মদ যৌবনে ধর্ম বিষয়ে আগ্রহ দেখাতেন বলে মনে হয় না; অর্থ উপার্জনেই তাঁর ঝোঁক ছিল। .... আমরা সব সময়ই তাড়াহুড়ো করি। কিন্তু মহৎ কাজ করতে গেলে বিরাট প্রস্তুতি দরকার। দিনরাত প্রার্থনার পর মহম্মদ স্বপ্নে অনেক কিছু দেখতে থাকেন। জিব্রাইল স্বপ্নে দেখা দিয়ে মহম্মদকে বলেন যে, তিনি সত্যের দূত, দেবদূত তাঁকে আরো বলেন যীশু, মুসা ও অন্যান্য প্রেরিত পুরুষদের বাণী লুপ্ত হয়ে যাবে। তিনি মহম্মদকে ধর্ম প্রচারের আদেশ করেন। খ্রীস্টানরা যীশুর নামে রাজনীতি ও পারসিকরা দ্বৈতভাবে প্রচার করেছিলেন দেখে মহম্মদ বললেন, আমাদের ঈশ্বর এক, যা কিছু আছে সব কিছুরই প্রভু তিনি। ঈশ্বরের সঙ্গে অন্য কারো তুলনা হয় না।'

স্বামীজি বলে কথিত বিবেকানন্দের রচনা সমগ্রের বিভিন্ন অংশে এমনি ধরনের আরো বহু অজ্ঞতাজনিত অবাঞ্ছিত আচরণ প্রকাশ পেয়েছে। তাই তেমন ধৃষ্টতা প্রকাশের জন্য শুধু লেখক সুনীলকেই দায়ী করা চলে না। বরং বলা চলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কেবল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দায়িত্বটুকু পালন করেছেন মাত্র, এর বেশি নয়।

ডিসেম্বর ১৯৮৬

www.pathagar.com

৩ঃ বুলবুল সরওয়ার

গত সপ্তাহের সংগ্রাম সাহিত্যে জনাব আতাউর রহমান খানের একটি চিঠি আমার চোখে পড়েছে। চিঠিটি আবদুল মান্নান সৈয়দের প্রবন্ধ প্রসঙ্গে। সে প্রসঙ্গটিও প্রকাশিত---'দেশ'-এর ধারাবাহিক উপন্যাস 'পূর্ব-পশ্চিম' বিষয়ক।

যদিও লেখার প্রতিবাদের-প্রতিবাদ করতে যাওয়ার মধ্যে নিন্দা প্রাপ্তির সম্ভাবনা সমূহ, তবুও এ লেখার জবাব লিখছি বাধ্য হয়ে। পুস্তক উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে যেমন কোনো অখ্যাত-অনামীকে জাতে ওঠানো হয় কিংবা খ্যাতিমানের জাতে ওঠার চেষ্টা চলে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর চিঠির জবাব দেবার মধ্যে তেমন কোনো দুরভিসন্ধিও নেই। এ হলো প্রাণের টান—যে সুতা ছিঁড়ে গেলে স্বাজাত্যবোধ ও খুদী বিলুপ্ত হয়। কবি-প্রাবন্ধিক আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্প্রতি সংগ্রামে যে সিরিজ ভিত্তিক প্রবন্ধ লিখছেন—তার সব লাইন আমার মুখস্ত নেই। নেই এ কারণে যে, তার অনেক কথাই কথার ছলে বলা। কিন্তু কোনো কোনো 'পুনর্বিবেচনা' পুনরায় বিবেচনা করবার মতো সাহস ও স্মরণ অনেকের মতো আমারও আছে। সে কারণেই প্রবীণ, বিচক্ষণ এবং খুঁটিয়ে-পড়া-পাঠকের মতামতকেও শ্রদ্ধা করতে পারছি না।

তিনি তাঁর লেখায় বলেছেন, মৌলবীদের জেহাদ তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন —অতএব প্রবন্ধকারের তথ্য ভুল। ভালো কথা, মন্দকে প্রতিহত করার উত্তম ব্রতই তিনি পালন করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন সেখানে নয়—প্রশ্ন হচ্ছে উপস্থাপিত বিষয়ে। সাংস্কৃতিক যে লড়াই চলছে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে--সমস্যা হচ্ছে সেখানে। কেননা আরবী-ফার্সি শব্দ ব্যবহারে আপত্তির প্রধান কারণ তো এখানেই যে, আরবী মানে আরব (মানে ইসলাম) আর ফার্সী মানে ইরান (অর্থাৎ খোমেনী)। প্রগতিশীল আর প্রতিক্রিয়াশীল ছদ্মবেশের আড়ালের আসল দ্বন্দ্ব : পাঠান এবং রাশিয়ান।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় খেটেখুটে "সেই সময়" উপন্যাসটি লিখে অর্থ পেয়েছেন যত, খ্যাতি পেয়েছেন ততোধিক। সেই অর্থ কিংবা খ্যাতি জানি না কার টানে, তিনি দ্বিতীয়বার লিখতে বসেছেন "পূর্ব-পশ্চিম"। হয় তিনি জানতেন না (অথবা ফেঁসে গিয়ে জেনেছেন) যে, এক তলস্তয় দুবার "ওয়ার এণ্ড পিস" লিখতে পারেন না। অনন্যোপায় হয়ে তাই তিনি বেছে

www.pathagar.com

নিয়েছেন সাম্প্রদায়িক বিষয়—শস্তা জনপ্রিয়তার মাধ্যম। তার সাথে আবার চাটনি হিশেবে আছে যৌনতার সুড়সুড়ি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সুনীল সম্ভবত ভুলে গেছেন যে সাহিত্যের বিচার বড় ক্ষমাহীন। কালের বিচারে কেবল মৌলিক সৃষ্টি ছাড়া বাকি সবই তলিয়ে যায়। একটা উদাহরণ দেই: গোলাম মোস্তফা সম্ভবত পাকিস্তানের, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের সবচে' দাপটের কবি ছিলেন। বলা যায়, প্রায় রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতির মুখপাত্র। কিন্তু মাত্র পনের বছরের মধ্যেই তিনি প্রায় জাদুঘরে পৌঁছে গেছেন। কোনো কোনো কবির বিশাল কাব্যসৃষ্টি তলিয়ে গিয়ে হয়তো অবশিষ্ট থাকে একটি-দুটি লাইন (যেমন: 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' কিংবা 'যে জন বঙ্গেতে জন্মি হিংসে' বঙ্গবাণী')। আবার উল্টোটাও হয়ে থাকে। কেউ হয়তো জীবদ্দশায় বিন্দুমাত্র সমাদর পাননি কোথাও—কিন্তু মৃত্যুর দুয়ার পার হয়ে যাওয়ার পরই মানুষ তাঁকে চিনতে পেরেছে। এ কেবল মৌলিক সৃষ্টিরই সাফল্য। "পূর্ব-পশ্চিমে" তার কোন্‌টি আছে?

অন্যদিকে সাম্প্রতিক কলকাতা সম্পর্কে যাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে, তারা নিশ্চয়ই জানেন, শিয়ালদহ স্টেশনে প্রতি শুক্রবার বিকেলে একটি সভা হয়। আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ জাতীয় কারা কারা যেন এর উদ্যোক্তা। তার একটি সভায় যোগদান করার 'সৌভাগ্য' আমার হয়েছিল। সভার প্রধান আকর্ষণ ছিল, বাংলাদেশ থেকে 'ধর্ষিতা' এক নারী এবং তার 'নির্যাতিত' পরিবার। মাত্র দিন সাতেক আগে বাংলাদেশের মুসলমানরা যার শ্লীলতাহানি করেছে এবং তার বাড়িঘর আগুনে পুড়িয়ে তাদেরকে ভারতে যেতে বাধ্য করেছে। কাহিনীর পর চললো বক্তৃতা। সেই তূরীয় আবেগের প্রধান ভাষ্য ছিল, হয় মুসলমানরা হিন্দু হয়ে যাও, না হয় পাকিস্তান চলে যাও। হিন্দুস্থান হিন্দুদের দেশ, এর অন্যথা হবে না ইত্যাদি অনেক কথা। আমি যে বন্ধুটির সাথে সভায় গিয়েছিলাম, সে বলেছিল, ঐ মহিলাটি কুমীরের দেখানো শিয়াল ছানার মতো, কিংবা খোঁজ নিলে হয়তো দেখা যাবে, ও নিজেই কুমীরের ছানা।

আরেকটি ব্যাপারও লক্ষণীয়, যারা এপার ছেড়ে ওপারে গিয়েছেন এমন যে কজন হিন্দুর সাথে আমার পরিচয় হয়েছে, তারা প্রায় প্রত্যেকেই দাবি করেছেন যে, তারা এপারে ছিলেন জমিদার, তাদের ভিখিরি করে পাঠানো হয়েছে ইত্যাদি। যদিও আড়ালে আবডালে আমি ওপারের ছেলেদেরই এসব 'গল্প' শুনে হাসি চাপতে দেখেছি।

www.pathagar.com

এইসব ট্রান্সফার্ড কিংবা কথিত ট্রান্সফার্ড লোকেরা অত্যন্ত উন্নাসিক। বিশেষত, এপার বাংলার উপর তাদের ক্রোধ অত্যন্ত নগ্ন এবং অশালীন। বলা বাহুল্য সুনীলও তাঁদেরই উত্তরপুরুষ। নিজের প্রজন্মের কথা বাদ দিলে কলকাতায় তিনি নড়বড়ে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এসব ক্ষেত্রে সচরাচর যা হয়, অবচেতনে বেরিয়ে আসে ক্ষোভ-ঘৃণা, তাঁর বেলাও তাই ঘটেছে। তাই এ বাংলার সমস্ত বরেণ্য ও খ্যাতিমান কবি সাহিত্যিক রাজনীতিবিদদের চরিত্রে তিনি কলঙ্ক-কালি ঢেলে স্বস্তি পেতে চাচ্ছেন। কিংবা হতে পারে, তিনিও সেই শিয়ালের পোশাকের নিচে কুমীরের ছানা। নাহলে, কোটালীপাড়া থানার জেলার নামটা যেখানে তিনি সঠিকভাবে লিখতে পারেন না (যদিও লোকে বলে, সেটাই নাকি তাঁর পিত্রালয়), সেখানে শেখ মুজিব কিংবা ভাসানীর সমস্ত 'কুকীর্তির' অনুপুংখ হদিস তিনি কোত্থেকে পেলেন?

এছাড়া আধুনিক কালে ভারতে যে উগ্র হিন্দু নবজাগরণ শুরু হয়েছে, লেখক হিশেবে সুনীল সে ধারারই প্রতিনিধিত্ব করছেন। নাহলে চৌষট্টি পঁয়ষট্টিতে পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটেছিল তা তিনি বিশেষ মহলের মন যোগাবার জন্য না লিখে, সত্য প্রকাশের আন্তরিকতা নিয়ে লিখতেন। হিটলারের সমর্থন করার জন্য নোবেল জয়ী লেখক ন্যুট হামসুনকে যুদ্ধোত্তর বিচার করা হয়। হামসুন একবারও ক্ষমা প্রার্থনা না করে বরং নরওয়ে জাতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, যে জাতির নৈতিক আগ্রহ হিটলারের এক-নায়কত্বের চেয়েও মন্দ, লেখক হিশেবে আমি তার সমর্থন করতে পারি না। হোক সে মতামত দেশের আপামর জনসাধারণের, কিংবা নাই হোক। পঁচাশি হাজার ডলার জরিমানা এবং নির্বাসন মেনে নিয়েও হামসুন সত্যকে আঁকড়ে ছিলেন (দ্রষ্টব্য : নরওয়ের নৈতিক অধঃপতন আজ বিশ্বখ্যাত)। পক্ষান্তরে সাম্প্রদায়িকতার মিথ্যা জঞ্জাল ছড়িয়ে সুনীল "পূর্ব-পশ্চিমে" প্রমাণ করলেন যে, এদের চেয়ে তিনি অনেক-অনেক ছোট মাপের লেখক।

সে যাক, এসব কাহিনী বলতে হলো জনাব আতাউর রহমান খানের চিঠির কারণে। একথা ঠিক, মান্নান সৈয়দ যে তথ্য দিয়েছেন তাতে ভুল ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু তিনি যে মৌলিক দ্বন্দ্ব তুলে ধরেছেন তা তো আর মিথ্যে নয়। আর নিজের দেশকে রক্ষা করতে যদি নওজোয়ানরা জেহাদের প্রশিক্ষণও নিয়ে থাকে, সে তো গৌরবেরই ইতিহাস। সে প্রসঙ্গ ভিন্ন ঢঙে পরিবেশন করার মধ্যে খান সাহেব যতখানি গুরুত্ব দিয়েছেন, তারচে বেশী গুরুত্ব কি দেয়া উচিত ছিল না—সমগ্র জাতি সম্পর্কে কোনো লেখকের

www.pathagar.com

মিথ্যাচারের জন্য? আজ আমাদের জাতীয় জীবনে যে চরম ঐতিহ্যিক ও অপসাংস্কৃতিক সংকট তার মূলেও যে নৈতিক ও শিক্ষাগত অব্যবস্থা তা তো তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। যদি তাই হয়, তাহলে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের গূঢ়তম প্রশ্নে কথা না বলে কেবল মোল্লা-মসজিদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করা কি যৌক্তিক? যদি নাও হয়, তবু কি তাঁর ভুলে যাওয়া উচিত যে, যে অসৎ কলম তাঁরই পূর্বসূরী ও সমসাময়িকদের চিত্রিত করছে মিথ্যা ও অসাধু রঙে, সে কলম আগামী দিন তাঁর চরিত্রেও কলঙ্ক আরোপ করতে দ্বিধা করবে না।

বরং আমি সাধুবাদ জানাই দ্বিতীয় পত্রলেখক জনাব খাদেম হাফিজকে ---যার পত্রের গভীরে রয়েছে আত্মবিশ্বাস ও আত্মপরিচয়ের অকুণ্ঠ সাহস ও প্রত্যয়!

জানুয়ারি ১৯৮৭

৪ ঃ সালাহউদ্দীন নিযামী

উপযুক্ত শিরোনামে আবদুল মান্নান সৈয়দের একটি লেখা সাহিত্যপাতায় মুদ্রিত হওয়ার পর সচেতন পাঠক সমাজে কিছু চিন্তাপ্রতিচিন্তার সৃষ্টি হয়েছে দেখে বেশ ভালো লাগছে। এ প্রসঙ্গে জনাব আতাউর রহমান খান ও জনাব খাদেম হাফিজ ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে তাঁদের মন্তব্য-অনুমন্তব্য 'সংগ্রামে' উপস্থিত করেছেন। খান সাহেব আশ্রয় নিয়েছেন তীক্ষ্ণ প্রতীকিতার, আর খাদেম হাফিজ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে বিষয়টি ভাবতে বলেছেন। সে যাই হোক।

আবদুল মান্নান সৈয়দ ষাট দশকের বিতর্কিত কবি, বিতর্কিত লেখক। বিতর্কিত তিনি কোনো রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীর জন্যে নয়, বরং তাঁর বিশিষ্ট রচনারীতি ও বাক্য প্রকরণের জন্যে। এককথায় জটিল অসরল মেধাবী বিদ্যুৎকীর্ণ প্রাতিস্বিকতার জন্য। বিতর্কিত তিনি কবিতার জন্য, দুর্বোধ্য কবিতার জন্য, কারণ শ্রুতবোধ্য কবিতা তিনি লিখতে জানেন না। "সত্যের মতো বদমাশ" লিখে তিনি রাষ্ট্রীয় রাডারেও ধরা পড়ে যান। তাঁর গবেষণাকর্মও কি বিতর্কিত নয়? বিতর্কিত কারণ সেক্ষেত্রেও তিনি তাঁর কেন্দ্রীয় কূলপ্লাবী সৃজনশীলতাকে বলি দিতে পারেন না। বস্তুত যে ক্ষেত্রেই তিনি কাজ করেছেন, প্রথাবদ্ধতাকে অস্বীকার করে, আধুনিকতাকে আলিঙ্গন

www.pathagar.com

করেছেন। আজ আর তাঁর রচনারীতি বিতর্কিত নয়। স্বাভাবিক এবং গ্রহণ-যোগ্য, শুধু তাই নয়, অনুকরণও চলছে তার বড় বড় কবিতা কোম্পানীতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সমাজে, সরকারী সমালোচনায়।

মান্নান সৈয়দের কাজের পৃথিবী, প্রকৃত অর্থেই ভয়ঙ্কর। কোনো বিশেষ বিষয়ে বা মাধ্যমে সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং শিল্পের সমস্ত ঝরনায় অবগাহিত হয়েছেন তিনি। তাই মুসলিম সাহিত্য নিয়েও কাজ করেছেন। ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা-র সম্পাদনা করেছেন, শাহাদাৎ হোসেনের কবিতা সম্পাদনা করেছেন, নজরুল ইসলাম নিয়ে বই লিখেছেন, আরো কতো কি—তাঁর হাতেই তো সম্পন্ন হলো নজরুলের নতুন উদ্ধার। "জন্মান্ধ কবিতা-গুচ্ছে"র কবি এই সব কেন করেন—অনেক বিদগ্ধ অধ্যাপকেরই অবশ্য বুঝে আসে না। আবদুল মান্নান সৈয়দ বর্তমানে বাঙালি-মুসলমান বিষয়ে যে নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা করছেন তার জন্যে আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ তাঁর হাতেই বিষয়টি নতুন স্বরূপে উদঘাটিত হতে পারে। 'পুনর্বিবেচনা' শিরোনামে তিনি যে লেখাগুলো লিখেছেন, তা গভীরভাবে পাঠযোগ্য বলেই আমি মনে করি। যে দেশের একজন সৈয়দ আলী আহসান একজন রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা নিতে পারতেন—সেখানে একজন মান্নান সৈয়দকে উপদেশ দিয়ে কোনো লাভ নেই। অনেকে আবার বিশেষ সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে দোযখ-জান্নাতের ফয়সালা করতে বসেন, সেখানেই মুশকিল হয়ে যায়। আমিও মনে করি: অজ্ঞতা এবং অনুবর্তিতা এবং সর্বগ্রাসী হীনমন্যতার কারণেই বিষয়টি বিভিন্ন সংশয়ে ভারাক্রান্ত হয়েছে। সুকুমার সেনের 'ইসলামী সাহিত্যের ইতিহাস' নয়—আমরা চাই নতুন ইতিহাস। আমরা কেন ভুলে যাই যে, বুদ্ধদেব বসুর মতো বিতর্কিত আধুনিকতার শিক্ষককে শেষ জীবনে লিখে যেতে হয়, "মহাভারতের কথা"? কেন ইলিয়ট পাউণ্ডকে শুধুমাত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার জন্যে শিখতে হয় বিভিন্ন বিদেশী ভাষা? কেন 'পোড়ামাটির কবি'র চিন্তার এক বিরাট অংশ অধিকার করে থাকে ট্রাডিশন রিলিজিয়ন? পিকাসো কেন ফিরে যান আদিমতায়? গগাঁ'কে ছুটতে হয় কেন তাহিতিতে?

রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে আদৃত হয়েছিলেন তাঁর প্রশান্ত এশীয় প্রতিভার জন্যে, এ কথা ভুলে যাওয়া ঠিক নয়। গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসে আলোকিত রবীন্দ্রনাথ। এই রবীন্দ্রনাথই মুগ্ধ করেছিলো বিক্ষুব্ধ আয়ারল্যাণ্ডের বিচলিত য়েটসকে। যে বিশ্বাসের জন্যে আকুল হয়েছিলেন য়েটস তা পেয়ে

www.pathagar.com

গেলেন রবীন্দ্রনাথে। য়েটসের কাছে রবীন্দ্র-জগত ধরা দিলো নতুন অলৌকিকতায়। কিন্তু পরে রবীন্দ্র বিষয়ে নিরুদ্যম হয়ে গেলেন য়েটস কারণ, ততো দিনে মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমে ঔপনিষদিক পাঠ সম্পন্ন হয়ে গেছে তাঁর।

যাই হোক, অজ্ঞতার কথাই বলছিলাম। হ্যাঁ, অজ্ঞতার কারণেই আবু সয়ীদ আইয়ুবকেও ভাবতে দেখি না বাঙালি-মুসলমান বিষয়ে। তিনি ছিলেন অবাঙালি, তাই তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

বিশের দশকে এদেশে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, অধ্যাপক আবুল হুসেন, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল প্রমুখ। কিন্তু তাঁরাও কেন জানি না বাঙালি-মুসলমানের মানস গঠন এবং প্রধান অভিমুখিতা সম্পর্কে অচেতন ছিলেন। কাজী আবদুল ওদুদের মিলন চিন্তা সে সময়ে যেরকম অস্বাভাবিক ছিলো এখনো তাই আছে। আবার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র কেউ কেউ বলেছিলেন: 'যে কেউ ইচ্ছে করলে চরিত্র গুণে মুহম্মদ (স.)-কে ছাড়িয়ে যেতে পারেন'—এ ধরনের উক্তিতে রাগের চেয়ে হাসির উদ্রেক হয় বেশি। এ ধরনের বিভিন্ন কারণে বাঙালি মুসলমানের কল্যাণচিন্তা থাকলেও কল্যাণ সাধন সম্ভব হয়নি তাদের। বরং ব্যর্থই হয়েছেন। কবি আবদুল কাদির 'বুদ্ধির মুক্তি'র এইসব ভুলের জন্যে অনুতপ্ত ছিলেন পরবর্তীকালে: তাঁর মৃতুর পর ইত্তেফাকে প্রকাশিত মোহাম্মদ কাসেমের একটি লেখা থেকে তা জানা যায়।

যাই হোক, আমরা মনে করি বাঙালি-মুসলমান প্রসঙ্গে নতুনভাবে ভাবার প্রয়োজন আছে। এবং তা আবদুল মান্নান সৈয়দের মতো লেখকদের দ্বারাই সম্ভব বলে আমাদের বিশ্বাস।

জানুয়ারি ১৯৮৭

৫ঃ এজাজ আহমদ

বিগত ১৭ই অগ্রহায়ণ '৯৩ দৈনিক সংগ্রামের সাপ্তাহিক সাহিত্য কলামে 'সেই সনাতন সমস্যা' শিরোনামে বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক জনাব আবদুল মান্নান সৈয়দ সাহেবের লেখা পড়লাম। তিনি নির্মম সত্যকে সহজভাবে স্বীকার করে পাঠকদের সামনে প্রকাশ করেছেন, সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

www.pathagar.com

ঐ নিবন্ধের এক জায়গায় তিনি বলেছেন—'এক আশ্চর্য সমাজে বাস করছি আমরা, যেখানে বৌদ্ধ ঐতিহ্যকে স্বীকার করা যাবে, কিন্তু ইসলামী ঐতিহ্যের প্রয়োগ দেখলেই তাকে বলা হবে বিজাতীয়। আমাদের মানে বাঙালি-মুসলমানের ঐতিহ্যের ধারা এসেছে দু'দিক থেকে (ভারতবর্ষ) আর ধর্মের দিক থেকে (আরব-ইরান)। বাঙালি-মুসলমানের ঐতিহ্য বিমিশ্র, বিমিশ্র বলেই জটিল ও সমৃদ্ধ। হিন্দু ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার আমরা বহন করছি, আর ইসলামী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার তো বটেই। হিন্দু বা বৌদ্ধ ঐতিহ্য —আমরা যখন ব্যবহার করি তখন কথা ওঠে না, কিন্তু ইসলামী ঐতিহ্যের ব্যবহার দেখলেই অনেকের মন ও মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আর এটা হয় সম্যক জ্ঞানের অভাবে, অন্ধ অনুবর্তনের ফলে।'

জনাব আবদুল মান্নান সৈয়দ সাহেব এতটুকু বলেই শুধু ক্ষান্ত হন নাই, তিনি ভদ্র সমাজের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের চোখে আঙুল দিয়ে খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দিয়েছেন—'হ্যাঁ, আমি পরিষ্কার বলতে চাই বাঙালি হিন্দুর সঙ্গে বাঙালি-মুসলমানের সাযুজ্য বাঙালিত্বে, বৈযুজ্য হিন্দুত্ব ও মুসলমানিত্বে। হিন্দু ধর্ম ভারতবর্ষে কেন্দ্রিত: কিন্তু ইসলামের উৎসারই ভারতের বাইরে থেকে। কাজেই বাঙালি-মুসলমান উপমহাদেশের সমস্ত ঐতিহ্য স্বাঙ্গীকরণের পরেও আরব-ইরানের দিকে তাকিয়ে থাকে।'

আমরা আশা করি জনাব আবদুল মান্নান সৈয়দ মাঝে মধ্যে নয় বরং নিয়মিত সংগ্রামের সাহিত্য পাতায় তাঁর পুনর্বিবেচনা কলামে লিখবেন।

জানুয়ারি ১৯৮৭

www.pathagar.com

হুমায়ুন কবির

কলকাতার এক পরিচিত শিক্ষিত প্রকাশক একদিন কথায়-কথায় আমাকে বললেন, 'আচ্ছা, হুমায়ুন কবিরকে নিয়ে কি করছেন আপনারা?'

আমি বললাম, 'কেন, হুমায়ুন কবিরকে নিয়ে আমরা কেন করবো? হুমায়ুন কবির তো আপনাদের জন্যেই জীবনপাত করেছেন। নিজে তিনি যথেষ্ট কৃতী মানুষ, তার পরেও বাঙালি লেখকদের জন্য প্রচুর করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কম এনে দেননি—পুরস্কারের ব্যবস্থা করে, বিভিন্ন ভারতীয় ও বিদেশী ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করে এবং অন্যান্য বহুভাবে।'

তিনি বললেন, 'হুমায়ুন কবিরের সাহিত্যিক কৃতিত্ব এমন বেশি নয়, যা স্মরণীয়তা পেতে পারে।'

আমি বললাম, 'তা হতে পারে। কিন্তু যেটুকু তাঁর পাওনা, সেটা তো তাঁকে দিতে হবে। তা কি দেওয়া হয়েছে?'

বাক্যালাপে যা হয়, এক প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তর চলে আসে। সেদিনও তা হয়েছিলো।

কিন্তু বিষয়টা আমি ভুলিনি। মাঝে-মাঝে ভাবি, হুমায়ুন কবির কি এতোটাই অমনোযোগের যোগ্য?

হুমায়ুন কবির সম্পর্কে আমি নিজেও খুব বেশি জানি না। জানার সুযোগও নেই। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'চতুরঙ্গ' পত্রিকা এখন ত্রৈমাসিক থেকে মাসিকে রূপান্তরিত হয়েছে, কাজেই সুযোগ ও পরিসরও বেশি, কিন্তু এ বিষয়ে তাদের কোনো দায়িত্ব আছে ব'লে মনে হয় না—'চতুরঙ্গ' পত্রিকাও অন্যদের মতো চমৎকারভাবে নীরব। তাঁর মৃত্যুর পরে অন্নদাশংকর রায়ের 'হুমায়ুননামা' নামে একটি শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশ করেই 'চতুরঙ্গ' তার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছে বলে মনে হয়। ফলত তাঁর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে—যা ছিলো বহুধা বিস্তৃত—আমরা তেমন কিছু জানি না। আমি সামান্য যেটুকু জানি, তা এখানে সংকলন ক'রে দিচ্ছি।

হুমায়ুন কবির (১৯০৬-৬৯) ফরিদপুরের সন্তান, কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে আই. এ., বি. এ. (অনার্স) ও এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম

www.pathagar.com

শ্রেণীতে প্রথম। অক্সফোর্ডের 'মডার্ন গ্রেটস' (দর্শন, অর্থনীতি ও রাজনীতি) পরীক্ষায়ও প্রথম। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ও দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন (১৯৩৩-৪৫)। শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শনের বিবিধ ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব বিশাল। এশিয়াবাসীর মধ্যে তিনিই প্রথম অক্সফোর্ডে হার্বার্ট স্পেন্সার বক্তৃতা দেন—যেখানে তাঁর পূর্বগামী বক্তা ছিলেন আইন-স্টাইন ও বার্ট্রান্ড রাসেল-এর মতো মনীষী। স্বদেশ ও বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টরেট' উপাধিতে ভূষিত করে। বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বক্তৃতা করেছেন। সাহিত্য, দর্শন, এমনকি বিজ্ঞান বিষয়েও তিনি বহু ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। কান্টের একটি অপ্রকাশিত রচনা জর্মান ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদের দুর্লভ কৃতিত্ব তাঁর অর্জনে।

হুমায়ুন কবিরকে যাঁরা গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন প্রথম শ্রেণীর বাঙালি লেখকেরা—অমিয় চক্রবর্তী ও জীবনানন্দ দাশ, আবু সয়ীদ আইয়ুব ও অন্নদাশংকর রায় এবং অন্যরা। কালের হিশাবে হুমায়ুন কবির তিরিশের লেখক। তাঁকেও কল্লোলীয় লেখকরূপে চিহ্নিত করেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। "কল্লোল যুগ" গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমারের বর্ণনা এরকম :

> হুমায়ুন কবির কখনো-কখনো আসত 'কল্লোলে' কিন্তু কায়েমী হয়ে খুঁটি পাকাতে পারেনি। নম্র, মুখচোরা—কিন্তু সমস্ত মুখ নিয়ত হাসিতে সমুজ্জ্বল। তমোঘ্ন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় দুই চোখ দূরান্বেষী। কথার অন্তে তত হাসে না যত তার আদিতে হাসে, তার মানে তার প্রথম সংস্পর্শটুকু প্রতি মুহূর্তেই আনন্দময়। কবিরের তখন নবীন নীরদের বর্ষা, কবিতায় প্রেমের বিচিত্র বর্ণ-কলাপ বিস্তার করছে।

লেখক হিশাবে হুমায়ুন কবির বহুমুখী—কবি, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক। তাঁর কবিতাগ্রন্থ "স্বপ্নসাধ", "সাথী", "অষ্টাদশী" প্রভৃতি। রবীন্দ্রানুসারী কবি তিনি—তিরিশের আধুনিকতা তাঁকে স্পর্শ করেনি। "নদী ও নারী" নামে একটি উপন্যাস প্রণয়ন করেছিলেন হুমায়ুন কবির। বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসের একটি তীক্ষ্ণ রিভিয়ু লিখেছিলেন 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই। কবিতা বা উপন্যাস নয়—সাহিত্য-সমালোচনা বা চিন্তামূলক রচনা ছিলো হুমায়ুন কবিরের স্বক্ষেত্র। অন্নদাশংকর রায় লিখেছেন, 'রাজনীতি যদি

www.pathagar.com

তাঁকে চুম্বকের মতো না টানত, তাহলেই তাঁর প্রতিভার সম্যক পরিস্ফুরণ হতো।'

খুব সত্যি। আর সে পরিস্ফুরণের এলাকা হতো সাহিত্য—বিশেষত মননমূলক সাহিত্য। সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি মানবিকী বিদ্যায় তাঁর আগ্রহ ও অন্বেষা ছিলো অশেষ। মননের দেশই ছিলো হুমায়ুন কবিরের স্বদেশ। এক্ষেত্রে তিনি সমকালীন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বা বুদ্ধদেব বসু, অন্নদাশংকর রায় বা আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে তুলনীয়—আবার তিনি সাহিত্যিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক বহুধা আগ্রহের অভিব্যাপ্তিতে একক। আবার, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বাংলা সাহিত্যে তো বটেই ভারতীয় সাহিত্যেও তিনি সর্বাগ্রণী। জওয়াহের-লাল নেহরুর "Discovery of India" ও সরদার পানিক্করের "Survey of Indian History"-র পূর্বগামী ও প্রাক-চিন্তক হুমায়ুন কবিরের রচনাবলি।

আমি কেবল হুমায়ুন কবিরের দুটি সমালোচনা-গ্রন্থের উল্লেখ করবো : একটি বহুখ্যাত "বাংলার কাব্য", অন্যটি ইংরেজিতে লেখা "Bengali Novel"। প্রথম বইটি হুমায়ুন কবিরের খ্যাততম এবং শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। দ্বিতীয়টিও আমার বিবেচনায় অতি গুরুত্বপূর্ণ। (এই আচ্ছাদিত বইটির সন্ধান দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন বহুভাষী, বহুপাঠী লেখক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা-মূলক সাহিত্যের অধ্যাপক মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।)

"বাংলার কাব্য" হুমায়ুন কবিরের অন্যান্য গ্রন্থের মতোই কৃশ। হাজার বছরের বাংলা কবিতাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে সমাজতাত্ত্বিক অন্তরাখ্যানে। এই বিশ্লেষণের আলোকেই তিনি লক্ষ্য করেন 'বৌদ্ধ দোঁহার প্রধান বৈশিষ্ট্য তার ভাষা।' সংস্কৃত থেকে সরে এসে দেশজ ভাষার আবিষ্কার ও নির্মাণ। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার প্রাকৃতিক বিশিষ্টতা তাদের স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। প্রকৃতি ও ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি—এই সবের আলোয় একটি বৃহৎ পরিসরের মধ্যে বাংলা কবিতার বিবেচনা, হুমায়ুন কবিরের এই গ্রন্থটিকে একটি হিরন্ময় মহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠ করেছে।

"Bengali Novel" বইটিও অসাধারণ। এই বইটি রবীন্দ্রশতবর্ষে একটি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি বক্তৃতার সংকলন। বক্তৃতা চারটির বিষয় : বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলা উপন্যাসের জন্ম; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; বাস্তববাদী উপন্যাস এবং সমকালীন বাংলা উপন্যাস। এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে তরুণতম ঔপন্যাসিকের রচনা বিশ্লেষিত হয়েছে।

www.pathagar.com

এবং বিশ্লেষণ হুমায়ুন কবিরের স্ব-স্বভাবী, নিজস্ব। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর বিবেচনা বিস্ময়কর।

সব মিলিয়ে তিরিশের সমালোচকদের মধ্যে হুমায়ুন কবিরের একটি অবিসংবাদী স্থান আছে।

অনালোচিত বলেই হুমায়ুন কবিরের গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ তালিকা সুলভ নয়। সেজন্যে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তাঁর গ্রন্থের একটি পঞ্জি--অসম্পূর্ণ হ'লেও—প্রণয়ন করে দেওয়া হল এখানে।

হুমায়ুন কবিরের গ্রন্থাবলি

স্বপ্নসাধ (কবিতা, ১৯২৮), সাথী (কবিতা, ১৯৩০), অষ্টাদশী (কবিতা), নদী ও নারী (উপন্যাস, ১৯৪৫), বাংলার কাব্য (প্রবন্ধ, ১৯৪৫), ইমানুয়েল কান্ট (প্রবন্ধ, ১৯৩৬), ধারাবাহিক (প্রবন্ধ, ১৯৪০), মার্কসবাদ (প্রবন্ধ), *Poems* (1932), *Kant on philosophy in General* (1935), *Poetry, Monads and Society* (1941), *Sarat Chandara* (1942), *Muslim politics* (1943), *Mahatma and other Poems* (1944), *Men and Rivers* (1945), *Three Stories* (1947), *Of Cabbages and Kings* (1948), *Student Indiscipline* (1954), *The Indian Heritage* (1955), *Science, Democracy and Islam* (1955), *Education in New India* (1956), *Green and Gold* (*Editor*, 1957), *Britain and India* (1960), *Indian Philosophy of Education* (1961), *Lessons of Indian History* (1961), *Mirza Abu Talib Khan* (1961), *Rabindranath Tagore* (1962), *Studies in Bengli Poetry* (1963), *Gandhian philosophy* (1964), *The Bengali Novel* (1968), *Minorities in Democracy* (1968).

১৯৮৭

www.pathagar.com

আলোচনা

আকবর কবির
পোঃ কোমরপুর
ফরিদপুর।

তাং ৬ই কার্তিক ১৩৯৫ বাং

জনাব মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ,
সম্পাদক, উষালোকে,
৪৩ পশ্চিম মাদীবাগ, ঢাকা ১২১৭

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার ইং ০৬-১০-৮৮ তারিখের চিঠি ও 'উষালোকে'র একটি কপি পেলাম। অনেক ধন্যবাদ।

অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের লেখা বই-র আমার জানামতে পূর্ণাঙ্গ তালিকা এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। এই লিস্টে তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা বা প্রখ্যাত সংকলনে লেখারও উল্লেখ করলাম। এটা ইংরেজীতে টাইপ করতে হচ্ছে।

ইং ১৯৬৯ সালের ১৮ই আগস্ট তিনি মারা যান, তখন ঢাকার দৈনিক সাময়িকীতে ওঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন অধ্যাপক আবুল ফজল, আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ। এছাড়া বিক্ষিপ্তভাবে অনেকের বইতে ওঁকে নিয়ে লেখা রয়েছে। যেমন সৈয়দ মুর্তজা আলী তাঁর অনুজ সৈয়দ মুজতবা আলী সম্পর্কে লেখা "মুজতবা কথা ঐ অন্যান্য প্রসংগ" নামক বইতে, 'ঢাকা ডাইজেস্ট'এর মার্চ এপ্রিল ১৯৭৬ সংখ্যায় আমিনুর রহমান মানুনের লেখা স্মৃতিকথা : 'আমার দেখা হুমায়ুন কবির ও তাঁর ভায়েরা', আবু রুশদের আত্মজীবনী 'জীবন ক্রমশ'তেও ওঁর সম্পর্কে বহু উল্লেখ আছে। ভারতে প্রকাশিত অনেক বইয়ে ওঁর সম্পর্কে লেখা রয়েছে। শ্রী দীপঙ্কর দত্ত ওঁর জীবিতকালে "Humayun Kabir : A Political Biography"প্রকাশ করেন। ওঁর অক্সফোর্ড প্রবাস জীবন নিয়ে লিখেছেন ডি. এফ. কারাকা, অক্সফোর্ড ইউনিয়নের প্রথম এশিয়াবাসী প্রেসিডেণ্ট।

অধ্যাপক কবির ছিলেন বিস্ময়কর বহুমুখী প্রতিভাধর। আবদুল মান্নান সৈয়দ সাহেবের সংক্ষিপ্ত লেখাটি * শুধু সারগর্ভ ও সুপাঠ্য নয়, সাহিত্যে অধ্যাপক কবিরের স্থান সম্পর্কে তাঁর উক্তি অত্যন্ত খাঁটি। আমাদের দেশে রাজনীতির প্রভাব এত নৈরাশ্যজনকভাবে বেশী, অধ্যাপক কবির যে ভারতের মন্ত্রীসভার একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন তারই উল্লেখ্য বেশী হয়েছে। দর্শনশাস্ত্রে তাঁর যে পাণ্ডিত্য—অনেকেরই জানা নেই। বিশেষ করে এদেশে

www.pathagar.com

ছাত্রাবস্থায় ইংরেজী সাহিত্যে তিনি কৃতিত্ব লাভ করেছিলেন। ইতিহাস, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন, তারও বিশেষ উল্লেখ শোনা যায় না।

আমি সাহিত্যানুরাগী, তবে সাহিত্যিক নই, লেখার আদত নেই, দক্ষতাও নেই। তাই ওঁর সম্পর্কে নিজের কোন লেখা দিতে পারলাম না। দুঃখিত। আপনি যে উদ্যোগ নিয়েছেন তার জন্য বাংগালী হিসেবে এবং পরিবারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। আপনার প্রয়াস সার্থক হোক।

শুভেচ্ছান্তে—
আকবর কবির

---

* আকবর কবিরকে প্রেরিত 'উষালোকে', ৫ম বর্ষ ১ম-৪র্থ (আগস্ট '৮৭) সংখ্যায় প্রকাশিত আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর 'হুমায়ুন কবির' লেখা প্রসঙ্গে।—সম্পাদক, 'উষালোকে'

www.pathagar.com

হুমায়ুন কবির-এর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থতালিকা

	গ্রন্থ	প্রকাশকাল
১.	গান	১৯২৬
২.	স্বপ্নসাধ (কবিতা)	১৯২৭
৩.	সাথী (কবিতা)	১৯৩১
৪.	Poems	১৯৩২
৫.	Kant's Philosophy In General	১৯৩৫
৬.	Immanuel Kant	১৯৩৬
৭.	অষ্টাদশী (কবিতা)	১৯৩৮
৮.	ধারাবাহিক (প্রবন্ধ)	১৯৪০
৯.	Poetry, Monads and Society	১৯৪১
১০.	Sarat Chandra Chatterjee	১৯৪২
১১.	Muslim Politics (1906-42)	১৯৪৩
১২.	Masadas-e-Hali	১৯৪৩
১৩.	Mahatma and other Poems	১৯৪৪
১৪.	বাংলার কাব্য (প্রবন্ধ)	১৯৪৫
১৫.	Men and Rivers	১৯৪৫
১৬.	Our Heritage	১৯৪৭
১৭.	Three Stories	১৯৪৭
১৮.	Of Cabbages and Kings	১৯৪৮
১৯.	নদী ও নারী (উপন্যাস)	১৯৫২
২০.	A National Plan of Education in India	১৯৫৩
২১.	Student Indiscipline	১৯৫৪
২২.	The Indian Heritage	১৯৫৫
২৩.	Two Studies on Education	১৯৫৫
২৪.	Science, Democracy and Islam	১৯৫৫

www.pathagar.com

২৫. Education in New India ১৯৫৬
২৬. An Indian Look at American Education ১৯৫৬
২৭. Letters on Discipline ১৯৫৬
২৮. শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ১৯৫৭
২৯. Student Unrest ১৯৫৮
৩০. Britain and India ১৯৬০
৩১. Indian Philosophy of Education ১৯৬১
৩২. Lessons of Indian History ১৯৬১
৩৩. Mirza Abu Talib Khan ১৯৬১
৩৪. Rabindranath Tagore ১৯৬২
৩৫. Studies in Bengali Poetry ১৯৬৪
৩৬. The Bengali Novel ১৯৬৮
৩৭. Minorities in Democracy ১৯৬৮
৩৮. Education for Tomorrow ১৯৬৯
৩৯. Muslim Politics (1907-1946) ১৯৬৯

www.pathagar.com

মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে

২৬শে মার্চ, বৃহস্পতিবার, স্বাধীনতা দিবস। টেলিভিশনে রাত আটটার বাংলা খবরে শুনলাম এক মর্মান্তিক মৃত্যুসংবাদ। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জনাব আলী আসগর ভূঁইয়া ইন্তেকাল করেছেন। মুহূর্তে আমার চেতনা ঝড়ের সমুদ্রের মতো দুলে উঠলো। অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিলো। ঠিক শুনেছি তো? তাঁর পরিচয়ের বাকি অংশ তো আচ্ছন্নতার ভিতর ঠিকই শুনলাম—বাংলা উন্নয়ন সেলে কাজ করেন। আমি আমূল কম্পিত হচ্ছিলাম, বিপর্যস্ত বোধ করছিলাম, স্থির হতে পারছিলাম না কিছুতেই।

ঠিক এক সপ্তা আগে, ১৯শে মার্চ, বৃহস্পতিবার, সকালের দিকে তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছিলো। উনিই ফোন করেছিলেন। দীর্ঘ, সহাস্য, সহৃদয়, বুদ্ধিদীপ্ত, বিনিময়ধর্মী, লঘু কিন্তু সুগভীর কথোপকথন—তাঁর সঙ্গে যেমন কথাবার্তা হতো আমার। কতোরকম কথা উঠেছিলো—আলাপে যেমন হয়। এক প্রসঙ্গ থেকে আর-এক প্রসঙ্গ। আশ্চর্য, মৃত্যুর কথাও উঠে-ছিলো।

কিছুদিন আগে ভীষণভাবে অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলাম আমি। মাস-খানেক ভুগেছি। এখনো তার জের রয়েছে। চিকিৎসকের নির্দেশে অতি-রিক্ত চা পান কমাতে হয়েছে। সেটা নিয়েই কথা হচ্ছিলো। ভূঁইয়া শাহেব তাঁর আব্বার কথা বললেন, যিনি বেঁচে ছিলেন ৯৩ বছর। বললেন, ঐ বয়সেও তিনি নিয়মিত চা খেতেন। শেষ-পর্যন্ত আমরা দুজনই একমত হলাম : বেঁচে থাকার কোনো নিয়ম নেই, মৃত্যু যে-কোনো সময়ে যে-কারো হ'তে পারে। তাঁর সঙ্গে এই আমার শেষ কথা। তখন কে জানতো, এসব কথা-বার্তার ঠিক এক সপ্তা পরে তিনি নিজেই মারা যাবেন। কে জানতো, তাঁর আব্বা ৯৩ বছরে মারা গেলেও তিনি ইন্তেকাল করবেন মাত্র ৫৪ বছর বয়সে—পিতা-পুত্রের আয়ুষ্কালের ব্যবধান থাকবে সুদীর্ঘ ৪০ বছরের। মৃত্যুর কোনো নিয়ম নেই তিনি নিজেই প্রমাণ করবেন—তা কি ভেবেছিলাম?

যন্ত্রণাহীন, দ্রুত, আকস্মিক মৃত্যু। কোনো রোগ ভোগ না, আগের দিনও অফিস করেছেন। ছুটির দিনের অলস বেলা এগারোটায় খবরের

www.pathagar.com

কাগজ পড়ছিলেন। এই সময়ই চেয়ার থেকে গড়িয়ে পড়েন মেঝেয়। মুহূর্তে দীপ নিভে যায়, ডাক্তার আসার আগেই সব শেষ। আকস্মিক, যন্ত্রণাহীন, নিঃশব্দ মৃত্যু। জীবনে যিনি ছিলেন শান্ত, সমাহিত, নিরুত্তেজ—তাঁর মৃত্যুও ঘটলো উত্তেজনাহীন শান্ত সমাহিতির ভিতর।

আলী আসগর ভুঁইয়ার কথা এতো সাতকাহন করে বলার দরকার হতো না—যদি তা হতো শুধু আমার ব্যক্তিগত শোক। কিন্তু বহু ছেঁড়া-খোঁড়া অর্ধভগ্ন মানুষের মধ্যে এই একটি সম্পূর্ণ মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম—এই কথাটাই জরুরি।

প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের মধ্যে রয়েছে কোনো-না-কোনো গুণপনা, কোনো-না-কোনো স্বর্গখণ্ড। জীবনে যাঁদের সংস্পর্শে এসেছি, তাঁদের অনেকের অনেক অংশ আমি নিজের ভিতরে শোষণ ক'রে নিয়েছি। ব্যক্তির ভিতর থেকেই কেবল এরকম আহরণ আমি করিনি—করেছি প্রকৃতির ভিতর থেকে, বইয়ের ভিতর থেকে। আমি বইকেও দ্বিতীয় প্রকৃতির মতো ব্যবহার করেছি। কিন্তু মানুষ হলো মানুষ, তার কোনো বিকল্প নেই, সে হলো জীবন্ত গ্রহিষ্ণু তরতাজা সঞ্জীবক, আমি প্রকৃতির চেয়ে মানুষকেই বেশি মূল্যবান মনে করি। আমার অধ্যাপক-জীবনে আর-কোনো সহজীবীর সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা বোধ করিনি, আর-কেউ এমন দীর্ঘ গভীর দূরপ্রসারী প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেননি আমার ভিতরে। আমার ভিতরে ভালো ও মন্দের তীব্র সংরক্ত দ্বন্দ্ব সুদীর্ঘ কালের। আমি যেমন পাতালের দিকে নেমে যেতে চাই, তেম্নি নীলিমার দিকে উড়াল দিতেও উৎসুক। ভালো ও মন্দের দিকে যুগপৎ এমন তীব্র টান অন্যেরা বোধ করেন কিনা জানি না। আমি আবাল্য করি। ভালোত্বের ঐ তৃষ্ণা যাঁরা জাগিয়েছেন, ভুঁইয়া সাহেব তাঁদের প্রধান।

তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। জগন্নাথ কলেজের নৈশ বিভাগে আমরা একসঙ্গে প্রায় দশ বছর কাজ করেছি। তাঁর সময়েই বাংলা ভাষা-সাহিত্যে এম. এ. প্রবর্তিত হয়। বিভাগীয় প্রধান হিশাবে তাঁর হাতেই সংগঠিত হয় ডিপার্টমেন্ট—এবং তা কোনো কঠিন হৃদয়হীন নিয়মাবলির ভিতরে নয়, একান্ত স্বাভাবিক অনুগ্রতায়। প্রায়ই সবার আগে আসতেন, কোনো অধ্যাপকের অনুপস্থিতি সাধারণত নিজেই পূরণ করতেন, তখন বা পরেও কখনো নিজের প্রাধান্য চাপাতেন না—সততই ছিলেন তিনি নম্র, সহাস্য, যুক্তিশীল। অধ্যাপক-জীবনে দেখেছি অধিকাংশ অধ্যাপক কোটরবদ্ধ, বিশ্ব-বিদ্যালয় ছাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে দিয়েছেন, জগৎ-ব্যাপারে

www.pathagar.com

অন্ধ বা বিতৃষ্ণ বা ক্রুদ্ধ, সাহিত্যের অধ্যাপক যিনি তিনি চলিষ্ণু সাহিত্য সম্পর্কে বীতস্পৃহ—আলী আসগর ভূঁইয়া ছিলেন, আরো কারো-কারো মতো, এসবের উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। কৃতী ছাত্র, কৃতী অধ্যাপক, সাম্প্রতিক সাহিত্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ও সশ্রদ্ধ—'সংগ্রামে'র এই সাহিত্য-সাময়িকী, এমনকি এই 'পুনর্বিবেচনা'রও, তিনি ছিলেন নিবিষ্ট পাঠক। জগন্নাথ কলেজে আমার লেখক-বন্ধুরা এলে তিনি খুশি হতেন, আলাপ করতেন সোৎসাহে।

মনে আছে, জগন্নাথ কলেজের নৈশ বাংলা বিভাগ থেকে আমরা একটি ক্ষুদ্র সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলাম। আর-কিছু নয়—কবি মঈনুদ্দীন নজরুল সম্পর্কে তাঁর অন্তরঙ্গ স্মৃতিচারণ করবেন। কবি মঈনুদ্দীনের সঙ্গে এভাবেই আমার একটি যোগাযোগ স্থাপিত হয়—এবং তা তাঁর মৃত্যু-কাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। মনে আছে, সত্তরের দশকের শেষ দিকে বাংলাদেশের হৃদয়ে আমাদের এক সম্মিলিত অভিযান। শিক্ষা সফর। ছাত্রদের নিয়ে আমরা কুমিল্লা, সিলেট, জাফলং, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, কক্স-বাজার, টেকনাফ অবধি একটি অতিদ্রুত ভ্রমণ করেছিলাম। আমি স্বভাবত নীড়াভিমুখী ও আত্মবৃত। ঐ আত্মবৃতি ছিঁড়ে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি প্রায় জোর করেই। বেরিয়ে পড়ে কিন্তু আমার আশ্চর্য ভালো লাগে। বিশেষ করে কক্সবাজারে কয়েক দিনের অবস্থান ও সমুদ্র দর্শন আমাকে আজো আবিষ্ট করে রেখেছে।

জীবন ব্যাপারে এমন নির্মোহ ও নিলিপ্ত কিন্তু সুরসিক এরকম মানুষ আমাদের এই সতত প্রতিযোগী ও ধাবমান সমাজে বিস্ময়কর। মানুষটি কোমল—কোমল কিন্তু মতাদর্শের ব্যাপারে দৃঢ়—দৃঢ় কিন্তু উগ্র নন: ভূঁইয়া শাহেব আমাকে সাধারণ মানুষের অসাধারণত্বে সশ্রদ্ধ করেছেন। তাঁর গাত্রত্বক ছিলো স্বর্ণবর্ণ, তাঁর হৃদয়ও ছিলো সোনার। আমাদের এই হতাশ ও পরশ্রীকাতর সমাজে এরকম আনন্দময়, স্বর্ণময় মানুষ বিরল। বিরল, কিন্তু একেবারে নেই তা নয়। আমার বিশ্বাস, আলী আসগর ভূঁইয়ার মতো সৎ, নিলিপ্ত, জাগ্রত, বিবেকী, প্রকৃত মানুষ সমাজের সর্বক্ষেত্রেই—অল্প হলেও—আছেন। তা না হলে দেশ চলছে কি করে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে কতোভাবে-যে উপকৃত। আমি-যে আজ নিজস্ব দেশ জাতি-ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তার কারণ তিনিই আমাকে অনেকখানি ফিরিয়েছেন সেদিকে। যেমন—আজ আমি

www.pathagar.com

আর 'নৌকো' লিখবো না, লিখবো 'নৌকা', কেননা এটাই আমার দেশের স্বাভাবিক উচ্চারণ।

আমি-যে মানুষের প্রতি শেষ-পর্যন্ত শ্রদ্ধাশীল, তার কারণ জীবনে এসে ভুঁইয়া শাহেবের মতো মানুষের সংস্পর্শ পেয়েছি। এরকম মহার্ঘ মানুষের সঙ্গ পেলে বেঁচে থাকাটাই দারুণ মূল্যবান হয়ে ওঠে। মানুষ ও প্রকৃতি এই দুই নিরন্তর উৎসের মধ্যে কার প্রতি আমার আকর্ষণ বেশি যেন আজ তার একটি পরিমাপ করতে পারছি। বিরূপতা, তিক্ততা, ক্ষুদ্রতা, বিশ্বাসভঙ্গ—সব-কিছুর পরেও জীবন্ত মানুষের মধ্যে যে-ঘনিষ্ঠ তাপ, আর কোথাও কি তা পাওয়া যায়?

তাঁর সঙ্গে একত্র ভ্রমণেরই একটি ঘটনা মনে পড়ছে আমার। এরকম ঘটনাকে আমি বলতে চাই অভিজ্ঞতা।

ছাত্রদের নিয়ে ইঞ্জিন-চালিত বোটে মহেশখালিতে গেছেন তিনি। আমি একা সমুদ্রতীরবর্তী বিজন মোটেলে। দুপুরে ঘুম ভাঙার পরই সমুদ্রতীরে ছুটে গেলাম। স্নানার্থীরা চলে গেছে তখন, বৈকালিক ভ্রামণিকরা তখনো আসেনি। বেলাভূমি পড়ে আছে দিগন্তবিস্তৃত। সামনে অথৈ সমুদ্র। চতুর্দিকে চেয়ে দেখি, একটিও জনপ্রাণী নেই। হঠাৎ আমার ভয় পেলো—ভীষণ ভয়। আমি মুহূর্তে পিছু ফিরি—ছুটতে-ছুটতে ফিরে আসি মোটেলে।

তারপর ভেবে দেখেছি: প্রকৃতি সুন্দর, কিন্তু মানুষহীন প্রকৃতি সর্ব-অর্থে অমানবিক, হৃদয়হীন, নির্মম। অন্তত মানুষহীন প্রকৃতি আমার জন্যে নয়।

এপ্রিল ১৯৮৭

www.pathagar.com

খাপ-খোলা তলোয়ার

'বুঝলে মান্নান, এই রোজার মধ্যে সেদিন আবেগের চোটে এমন লাফ দিলাম যে, ঘুরে পড়ে গেলাম হঠাৎ।' বছর কয়েক আগে এরকমই এক রোজার দিনে তাঁর বাড়িতে ব'সে কথা হচ্ছিলো। তাঁর বয়স তখন আশির উপরে। তখনো তাঁর মধ্যে সমুদ্রসমান আবেগ। এমন উদ্দাম উত্তাল আবেগ আমি কোনো তরুণ যুবকের মধ্যেও দেখিনি।

তিনি সুফী জুলফিকার হায়দার।

তাঁর কণ্ঠস্বর ছিলো উচ্চতম গ্রামে বাঁধা, কিন্তু উগ্র বা কর্কশ তো নয়ই, আমি বলবো সুমধুর। সেই কণ্ঠস্বরই যেন ছিলো তাঁর হৃদয়ের দর্পণ। সেখানে কোনো অনচ্ছতা ছিলো না। প্রতিটি শব্দ ও বাক্য স্পষ্ট, স্বচ্ছ, নিষ্কলুষ, জড়তাহীন। আবেগের আন্দোলনে আন্দোলিত। আর সব সময় থাকতেন তিনি সুসজ্জিত। বাড়িতে যে কয়েকবার গিয়েছি, তার ব্যতিক্রম দেখিনি। আর বাইরে তাঁকে দেখেছি আপাদমস্তক উজ্জ্বল রঙিন সুসজ্জিত লেবাসে, পাদুকা থেকে পাগড়ি পর্যন্ত সযত্নে রচিত। আর ঐ বর্ণালি পরিচ্ছদ যে কেবল তাঁর বহিরাবরণ ছিলো না, ছিলো তাঁর উষ্ণ উজ্জ্বল অন্তরেরই পরিচায়ক—আশা করি—তার সাক্ষ্যদাতার অভাব ঘটবে না। বৃদ্ধ হয়েছিলেন—শরীর নিশ্চয় কোথাও-না-কোথাও অপ্রতিরোধ্য জরার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলো, কিন্তু তাঁকে দেখে বা তাঁর কথা শুনে কখনো মনে হতো না বার্ধক্য তাঁকে আক্রমণ করেছে। তাঁর দৃষ্টি সব সময় ছিলো সম্মুখবর্তী—পঞ্চাশ পেরোতে-না-পেরোতে স্মৃতিচারণা যাঁদের অভ্যাসে পরিণত, তাঁদের থেকে তিনি ছিলেন সুদূরে। তিনি ছিলেন আশি বছরের কিংবা আশি-ঊর্ধ্ব তরুণ যুবক। ছিলেন তিনি সার্থকনামা পুরুষ—প্রোজ্জ্বল জুলফিকার—এক খাপ-খোলা তলোয়ার।

কবি নজরুল ইসলামের কোনো-কোনো সহচরকে আমি দেখেছি। আবুল কালাম শামসুদ্দীন ছিলেন সতত সংযত; কবি মঈনুদ্দীন নজরুলের মতো লম্বা চুল রেখেছিলেন সত্যি, কিন্তু আমি তাঁকে দেখেছি শান্ত ও কোমল; সুফী জুলফিকার হায়দারের মধ্যে নজরুলী আবেগের উদ্দামতা শেষ

www.pathagar.com

পর্যন্তই খেলতো। সুদূর ১৯৪৪ শালে নজরুল-সহচর অমলেন্দু দাশগুপ্ত সুফী সাহেবকে লিখেছিলেন, 'প্রাণের বেগ ও প্রাচুর্যে আপনি বিশিষ্ট।' আর আমরা যখন তাঁকে দেখেছি, তখনো তাঁর প্রাণপ্রাচুর্যের প্রবলতা মুহূর্তে আর-দশজন মানুষের সঙ্গে তাঁর পৃথকতা ঘোষণা করতো। ব্যক্তি-গতভাবে আমি আবেগকে অসম্ভব মূল্যবান মনে করি। আমি বিশ্বাস করি, আবেগবাহিত হয়ে জীবন ও জগতের শিল্পের ও উপলব্ধির এমন স্তরে-উপস্তরে প্রবেশ করা সম্ভব, চিন্তা বা মনন বা প্রজ্ঞা যেখানে পৌঁছোতে পারে না। আবেগের উত্তাল হিল্লোল থেকেই বোঝা যেতো, সুফী জুলফিকার হায়দার একজন সৃষ্টিশীল মানুষ।

আজ মনে হচ্ছে, নজরুল ইসলামকে কেন্দ্রে রেখে বাংলার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক আকাশে একটি বিশাল নক্ষত্রমণ্ডলী জেগে উঠেছিলো। রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিপুল বিকাশ ঘটিয়েছিলেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এতো বড়ো ছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে তাঁর পার্শ্ববর্তীদের ব্যবধান ছিলো স্পষ্ট ও প্রকট, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালীনদের সঙ্গে অজস্র যোগসূত্র সত্ত্বেও কোথাও একটি অচ্ছেদ্য দূরত্বও রচনা করেছিলেন—হয়তো তা তাঁর মতো মহাপ্রতিভাবানের পক্ষে ছিল আবশ্যিক, এমনকি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও হয়তো। কিন্তু নজরুলের সঙ্গে তাঁর সমসাময়িকদের অমন কোনো ব্যবধি প্রণীত হয়নি, তিনি ছিলেন পুরোটাই উন্মোচিত। (এই সম্পূর্ণ উন্মোচনের মূল্য নজরুলকে দিতে হয়েছে তাঁর জীবন দিয়েই—কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ।) এ যেন অনেকটা এই দুই মহাকবির সংগীতচর্চায় প্রতীকায়িত—রবীন্দ্রসংগীতে গায়কের স্বাধীনতা সীমাশাসিত, কিন্তু নজরুলসংগীতের গায়ক সুরবিহারের অনেকখানি আজাদী ভোগ করেন। ফলত নজরুলকে কেন্দ্রে রেখে যে-বিশাল নক্ষত্রমণ্ডলীর উজ্জীবন ঘটেছিলো, নজরুলের প্রতিভার বিচ্ছুরণ সত্ত্বেও তাঁরা অনেকেই আত্মচারিত্রে অধিষ্ঠিত। আত্মচারিত্রবান—কিন্তু নজরুলী বিচ্ছুরণের আভাও সেখানে লেগে আছে। সুফী জুলফিকার হায়-দারের মধ্যে নজরুলী আভার দ্বৈত রূপ: একদিকে আবেগী উত্তালতা, অন্য দিকে অধ্যাত্ম অন্বেষণ। শেষ-পর্যন্ত এ দুই আলাদা হয়তো নয়—হয়তো আবেগতরঙ্গই অন্বেষী হয়ে পৌঁছেছে আধ্যাত্মিক আকাশে। লক্ষণীয়: নজরুলের শেষ পর্যায়ের অনেক বন্ধু ও সহচরই (হিন্দু মুসলিম উভয়েই) অধ্যাত্মঅন্বেষী। একজন স্মৃতিচারক সুন্দর বলেছেন: নজরুলের প্রতিই কেবল নারী-পুরুষ আকৃষ্ট হতেন না, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নজরুল

www.pathagar.com

নিজেও আকৃষ্ট হতেন। এ সবই বস্তুত নজরুলের অবিরল ও আতীব্র অন্তঃসন্ধানের বহিঃপ্রকাশ। অসম্পূর্ণ এক-জীবনেই নজরুল জীবনের সমস্তকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করতে চেয়েছিলেন। হয়তো এই দ্রুতধাবী আত্মসন্ধানই তাঁর করুণ পরিণাম ডেকে এনেছিলো।

মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি এবার।

সুফী জুলফিকার হায়দারের উত্থান ও মূল্যবোধ ছিলো অনেকখানি নজরুলকেন্দ্রিত। কবিতা তিনি লিখেছেন, তাও তাঁর স্বভাবী আবেগে চিহ্নিত—এবং না-মেনে উপায় নেই, তা তাঁর নজরুলকেন্দ্রী রচনার তুল্যমূল্য নয় কিছুতেই।

তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "নজরুল-জীবনের শেষ অধ্যায়" এবং তাঁরই ভাষায় তাঁর 'অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি' "নজরুল-প্রতিভা-পরিচয়" নামের সুবিশাল গ্রন্থ সম্পাদনা। মনে আছে, এক আত্মপীড়িত সন্ধ্যায় এক-বসায় পড়ে শেষ করেছিলাম "নজরুল-জীবনের শেষ অধ্যায়" বইটি। অপরূপ সেই গ্রন্থ। অসাধারণ এক কবির দিনানুদৈনিকের মধ্যে চিন্ময়ের সঙ্গে মৃন্ময়ের সংঘর্ষ প্রতি পৃষ্ঠায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আরম্ভ ১৯৩২ শালে; ১৯৪২ শালে নজরুলের রোগাক্রমণ ঘটেছিলো। তার পরেও কিছুদূর পর্যন্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আরম্ভ এক ক্ষণকালীন সুখী নজরুলে: 'তখন কবির বাড়ীতে নেপালী দারোয়ান, গ্যারেজে দামী মোটর। বেশ শানশওকতের সঙ্গেই তিনি ছিলেন।' আর শেষ নজরুলের স্থায়ী নিস্তব্ধতায়। সমস্ত তর্কের পরেও যেটা সত্য তা এই যে, নজরুলের অন্তজীবনের এরকম কোনো দরদী, গভীর, সৎ, আন্তরিক চিত্র আর-কেউ রচনা করতে পারেননি। তার একটিই কারণ, আর কেউ ঐ অভিজ্ঞতার শরিক ছিলেন না। এই উক্তি আমরা অসংশয়ে করতে পারি, "নজরুল-জীবনের শেষ অধ্যায়" সুফী জুলফিকার হায়দারকে স্মরণীয় করে রাখবে। নজরুল যত দিন থাকবেন, এই বইয়ের মূল্য ততোদিন থাকবে। ১৭ই জুলাই ১৯৪২ শালে হায়দার শাহেবকে লেখা হাহাকারময় পত্রে নজরুল তাঁকে সম্বোধন করেছেন 'বন্ধু' বলে। কী কাতর আর মর্মস্পর্শী সেই অনুরোধ: 'এ কবার শেষ দেখা দিয়ে যাবে বন্ধু?' এরই পাশে উদ্ধৃত করছি নজরুলের স্তব্ধতার পরে কাজী অনিরুদ্ধের স্মৃতিভারাতুর পত্রাংশ: 'ঈদের দিনে আপনার বাড়ীতে চাচীমার রান্না করা বিরিয়ানীর কথা আজও মনে পড়ে। বাবাও সাথে যেতেন। আমরা আপনার বাইনাকুলার দিয়ে আশে-

www.pathagar.com

পাশের সব দেখতাম। সেসব দিন কোথায় হারিয়ে গেল?' কবি এবং কবির স্ত্রী, শাশুড়ি, পুত্রদ্বয়, ভ্রাতা, ভ্রাতার পুত্র, মাতুল ভ্রাতা, বন্ধু প্রমুখের চিঠি থেকে পরিষ্কার, সুফী জুলফিকার হায়দার নজরুলের কতোখানি ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

সবশেষে একটি কথা।

সুফী জুলফিকার হায়দারের প্রথম জীবন নাকি ছিলো অন্য রকম। কিন্তু তাতে কি শেষ-পর্যন্ত কোনো কিছু এসে যায়! একটি মানুষের জীবনবৃত্ত তো তার সমগ্র জীবনের কর্ম ও আচরণেই সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। আর, মানুষ হিশাবে তাঁকেই আমরা স্মরণীয় মনে করি, যাঁর মধ্যে কোনো-না-কোনো ভাবে ভালোত্বের বিকাশ ঘটেছে। বাঙালি-মুসলমান সমাজে চরিত্র হননের নেশা প্রবল। জীবনে খারাপ আছে, স্মরণীয় ব্যক্তিদেরও আছে, কিন্তু ভালোটাই যেহেতু শেষ-পর্যন্ত টিকে থাকে সেটাই আমাদের আলোচ্য হওয়া উচিত। নজরুলের অন্তজীবনের নিঃসঙ্গ সঙ্গী হিশাবে আর তুমুল জরা-জয়ী আবেগশক্তিতে সুফী জুলফিকার হায়দারকে আমার তো মনে হয়েছে অসামান্য একজন মানুষ।

মে ১৯৮৭

www.pathagar.com

পুরোনো পত্রিকা

প্রতি মুহূর্তে বর্তমান অতীতে অবসিত হচ্ছে। দেখতে-দেখতে উবে যাচ্ছে দিনের পর দিন। কিন্তু অক্ষরনির্ভর সভ্যতা কোথাও-না-কোথাও ধরে রাখছে আমাদের। আমরা যারা সাহিত্যে মনঃপ্রাণ সঁপেছি, অতি দ্রুত পুরাতনে লীন হ'য়ে পঞ্চাশ কি একশো বছর পরে শব্দের সমুদ্রে কেবল কয়েকটি শব্দঘন দ্বীপে পরিণত হবো। কিন্তু তার মধ্যেই লিপ্ত থাকবে আমাদের দৈনন্দিন, আমাদের ভালোবাসা ও ঘৃণা, ক্রোধ ও আকাঙ্খা। এজন্যই মজা লাগে পুরোনো পত্রিকা ঘাঁটতে—যেখানে রয়েছে এইসবের স্বাক্ষর।

হ্যাঁ, পুরোনো পত্রিকা ঘাঁটা আমার একটি বাসন। কখনো নেহাৎ অকারণে—কোনো অবকাশে কিংবা কখনো কোনো গবেষণা ব্যপদেশে। কিন্তু—কারণ যা-ই হোক—ঘাঁটাঘাঁটির ফলে পেয়ে যাই লুপ্ত বা লুক্কায়িত হিরে-জহরত।

কিছু দিন থেকে একটি কাজে পুরোনো পত্রিকা ঘাঁটতে হচ্ছে আমাকে। তিরিশ বছর আগেকার পত্রিকা থেকে সত্তর-আশি বছর আগেকার পত্রিকা পর্যন্ত। লাইব্রেরিতে এবং বাড়িতেও। এইসব পত্রিকা আমার কাছে অল্পই আছে। মরহুম সাহিত্যিক জহিরউদ্দিন কুদ্দুসের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে তাঁর নাতি আমাকে বেশ কিছু পত্রিকা দিয়েছেন ব্যবহার করবার জন্যে। এরকম সংগ্রহ স্বভাবত সাহিত্যিকদের কাছেই বেশি থাকে। আর থাকে সাহিত্যপাগল কিছু সংগ্রাহকের কাছে। এরকম সংগ্রাহকরা সাধারণত বিখ্যাত নন—সুতরাং সবাই তাদের চেনে না—কিন্তু হঠাৎ কখনো তাঁরা প্রোজ্জ্বল ও প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠেন, শেষ বয়সে কিংবা মৃত্যুর পরে। এ রকম একজন সংগ্রাহক সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের পিতা, সম্ভবত মুর্শিদাবাদের কোনো গ্রামে থাকেন তিনি, মুসলমান-সম্পাদিত পত্রিকার বিরল সংগ্রহ আছে তাঁর কাছে। সবচেয়ে মুশকিল হয়, এই সব সংগ্রাহকদের মৃত্যুর পরে, তাঁদের বহু যত্নে পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে সংগৃহীত গ্রন্থ ও পত্রিকা ছত্রখান হয়ে যায়। সেদিক থেকে আমাদের মতো দেশে অধিকাংশ

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত লাইব্রেরির অবস্থা করুণ এবং ফলত অধিকাংশ পত্রিকা নষ্ট হ'য়ে যায়। আর, পুরোনো বই পাওয়া যতো সহজ, পত্রিকা পাওয়া ততোই কঠিন। শুনেছি, মওলানা আকরম খাঁ-র ব্যক্তিগত বিশাল লাইব্রেরি তছ-নছ হ'য়ে গেছে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মহার্ঘ গ্রন্থসংগ্রহও নষ্ট হয়েছে ও হচ্ছে বলেই জানি। কবি আবদুল কাদিরের ব্যক্তিগত গ্রন্থ ও পত্রিকা সংগ্রহ বিপুল। এসবের কি অবস্থা? সংগ্রাহকদের উত্তরাধিকারী-দের মধ্যে পিতৃনাম যতোটা গৌরবজনক, বহু যত্নে কষ্টে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত তাঁর গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ততোটাই অবহেলা পায়। না-মেনে উপায় নেই : প্রতিভা বংশানুক্রমিক নয়, এমনকি সংস্কৃতিও বংশানুক্রমিক নয়, ব্যক্তিগতভাবে উপার্জনযোগ্য। এসব কারণেই মনে হয় : সংগ্রাহকদের উচিত জাতীয়ভিত্তিক গ্রন্থাগার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এগুলো দান বা বিক্রি করে যাওয়া। তাতে দুর্লভ বই ও পত্রিকা অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচে, পরবর্তী প্রজন্মের কাজে লাগে।

বিশেষ করে মুসলিম-সম্পাদিত পত্রিকাগুলোর কথাই বলতে চাই আজ।

প্রথম কথাই যেটা মনে হয়, তা হচ্ছে এই যে ডক্টর আনিসুজ্জামানের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটি বাদ দিয়ে মুসলিম-সম্পাদিত সাময়িক-পত্রের ধারাবাহিক ইতিহাস নির্ণায়ক কোনো গ্রন্থের অনুপস্থিতি। অবিলম্বে এটা হওয়া দরকার। কেননা সাময়িকপত্র দ্রুতলীয়মান। এইসব প্রণয়নের জন্যে প্রেমিক ও গবেষকের যুগ্ম লেখনী প্রয়োজন।

হ্যাঁ, যেসব পত্রিকা ঘাঁটলাম, তার দু'একটি সম্পর্কে দু'একটি কথা বলি। —মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ছিলেন পত্রিকা-প্রাণ মানুষ। মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকার ইতিহাসে তাঁর নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। তাঁর সম্পাদিত 'আজাদ' ও 'মোহাম্মদী' পত্রিকার কথা জানেন সবাই, কিন্তু তিনি আরো পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন—যেমন, 'আল এসলাম'। 'আল-এসলাম' বেরিয়েছিলো সুদূর ১৩২২ শালে। মূলত পত্রিকাটি ছিলো ধর্ম বিষয়ক—মুসলিম ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে জাগ্রত। কিন্তু পত্রিকাটি একেবারে সাহিত্যবর্জিত ছিলো না। মোহাম্মদ আকরম খাঁর মানস ছিলো যুক্তিবাদীর এবং সে যুক্তির ধারা তাঁর পত্রিকায় প্রতিফলিত হয়েছিলো। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সম্পাদিত 'সওগাত' পত্রিকার কথা তো না-বললেও চলে। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন এমন একজন সম্পাদক, যাঁকে জাত সম্পাদক বললে একটুও অত্যুক্তি করা হয় না। প্রকৃত সম্পাদকের মতোই আত্ম-

www.pathagar.com

বিলোপকারী তিনি—নিজেকে আড়ালে রেখে জেনারেশনের পর জেনারেশনের নতুন লেখকদের তিনি যেভাবে সম্মুখবর্তী করেছেন, প্রকৃত লেখকদের যেভাবে আবিষ্কার করেছেন, ঐতিহ্যবাহী অথচ খোলা চোখের যে-দৃষ্টান্ত তিনি উপস্থাপন করেছেন, বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসেই তার কোনো দ্বিতীয় উদাহরণ নেই। এইসব সম্পাদকের পাশেই উল্লিখিত হওয়া দরকার সম্পাদক হয়েও মূলত যাঁরা লেখক, যাঁদের লেখক চরিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তাঁদের সম্পাদক-সত্তায়। ইসমাইল হোসেন সিরাজী-সম্পাদিত 'নূর' বা মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী-সম্পাদিত 'সাম্যবাদী' পত্রিকা হিশাবে ছিলো স্বল্পায়ু, কিন্তু যে-ক'টি সংখ্যা বেরিয়েছে তা ছিলো সেইসব লেখক সম্পাদকের চারিত্র-চিহ্নিত। অধুনা উপেক্ষিত অথচ অসামান্য ভালো দুটি পত্রিকার উল্লেখ করবো : সৈয়দ এমদাদ আলীর 'নবনূর'—যা বেরিয়েছিলো এই শতাব্দীর প্রথমদিকে, আর তিরিশের দশকে প্রকাশিত হাবীবুল্লাহ্ বাহার ও শামসুন্নাহার মাহমুদ-সম্পাদিত 'বুলবুল'। আরো অনেকের মতো সৈয়দ এমদাদ আলীর অবদান আমরা ভুলেছি, তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার কথাও, যে-পত্রিকা থেকে বেগম রোকেয়ার মতো তীক্ষ্ণধার লেখিকা জন্ম নিয়েছিলেন। মুসলিম-সম্পাদিত সাময়িকীর মধ্যে 'বুলবুলে'র একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। চতুর্মাসিক ও ত্রৈমাসিক এই পত্রিকা সম্পাদনা করতেন সাংস্কৃতিক দুই ভাই-বোন, নজরুলের উচ্চারণে 'বাহার-নাহার'। এরকম রুচিবান, চমৎকার, আধুনিক পত্রিকা খুব বেশি বেরোয়নি মুসলমানদের হাতে। নজরুল ছিলেন এই পত্রিকার প্রধান লেখক, নিয়মিত লিখতেন মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আর এই পত্রিকা ছিলো রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-প্রমথ চৌধুরীর আশীর্বাদ-ধন্য। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে একটি সুদীর্ঘ তর্ক-বিতর্কের ধারা প্রবাহিত হয়েছিলো এই পত্রিকায়। এই তর্কের সূচনা করেছিলেন মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী; আর অংশ নিয়েছিলেন অন্নদাশংকর রায়, কাজী আবদুল ওদুদ, সৈয়দ এমদাদ আলী প্রমুখ জিজ্ঞাসুর দল।

মুসলিম-সম্পাদিত এইসব পত্রিকা বেরিয়েছিলো তখনকার সাহিত্য-রাজধানী কলকাতা থেকে।

দেশবিভাগের পর ঢাকা থেকেও উচ্চ পর্যায়ের পত্রিকা বেরোতে থাকে। তারই বা বিস্তারিত ইতিহাস কোথায়!

শুধু ইতিহাস নয়, অনেক সময় পুরো পত্রিকা নতুন প্রজন্মের জন্যে পুনঃপ্রকাশ করতে হয়। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বঙ্গ-

www.pathagar.com

দর্শন' সম্পূর্ণভাবে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে কিংবা বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা। এমনকি কোনো-কোনো পত্রিকার ফ্যাকসিমিলি এডিশনও প্রকাশ করা দরকার।

সুচেতন সম্পাদক সিকান্দার আবু জাফর আমাকে মাঝে-মাঝে বলেছেন, 'সমকাল' থেকে গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধের তিনটি সুনির্বাচিত সংগ্রহ প্রকাশের ইচ্ছা আছে তাঁর। (সাপ্তাহিক 'দেশ' এই কাজটিই সম্প্রতি করেছে।) অধুনালুপ্ত 'কণ্ঠস্বর'এর একটি নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ রচনা সংগ্রহ প্রকাশ করার জন্যে এক সময় অনুরোধ করেছিলাম সম্পাদক আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদকে। (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা থেকে নির্বাচিত কবিতা ও গদ্যরচনা দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।) মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন এই কাজটিই করছেন বেশ কিছুকাল ধরে। 'সওগাত' পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত রচনাসম্ভার বিভিন্ন উপলক্ষে তিনি 'সওগাতে' একত্র ক'রে পুনপ্রকাশ করেছেন তাঁর ভূমিকা সমেত।

'সওগাত', 'মোহাম্মদী', 'বুলবুল', 'সমকাল', 'কণ্ঠস্বর' প্রভৃতি পত্রিকার নির্বাচিত চয়নিকা প্রকাশ করা এই মুহূর্তে দরকার। পরবর্তী ও পূর্ববর্তী প্রজন্মের মধ্যে এইসবই রচনা করতে পারে নিরুপম সাঁকো। পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধা এম্নি আসে না। তরুণরা প্রাক্তন ঐতিহ্য সম্পর্কে অজ্ঞ—এরকম ঢালাও অভিযোগের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি আমাদের পুরোনো সমৃদ্ধিকে তাদের সামনে এনে দেওয়া।

মে ১৯৮৭

www.pathagar.com

আচ্ছাদিত বারান্দা

বাংলা ছন্দে নজরুল ইসলামের নিজস্ব কোনো দান আছে কী? এ কালের অন্তত একজন বিখ্যাত কবি-সমালোচক-ছান্দসিক শঙ্খ ঘোষের চমৎকার ছন্দোদর্শী বই "ছন্দের বারান্দা" (দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৩৮২) প'ড়ে তা মনে হয় না। 'কবির ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর ব্যবহৃত ছন্দের যোগ কোথায়, কীভাবে কোনো কবি অল্পে অল্পে খুঁজে নেন তাঁর নিজের ছন্দ অথবা কীভাবে কোনো ছন্দ যেন খুলে যায় এক মুক্তির দিকে'---এই নিয়ে শঙ্খ ঘোষ মাইকেল মধুসূদন দত্ত থেকে বিষ্ণু দে পর্যন্ত কয়েকজন কবির ছন্দ ব্যবহার পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন। এমনকি তাঁর আলোচ্য হয়ে ওঠেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও, যিনি ঠিক কবি বলে পরিচিত নন, কিন্তু বইয়ের ভিতরে বা ভূমিকায় নজরুলের নাম পর্যন্ত অনুল্লিখিত থেকে যায়। তাহলে কি বাংলা কবিতায় নজরুল ইসলামের নিজস্ব কোনো দান নেই? নাকি তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর ব্যবহৃত ছন্দের যথাযথ যোগাযোগ ঘটেনি? কিংবা তিনি খুঁজে নিতে পারেননি তাঁর ছন্দ অথবা ছন্দোমুক্তি? শঙ্খ ঘোষ অবশ্য বলেছেন যে, তিনি কোনো ইতিহাস-বই লিখছেন না। তবু অন্তত শঙ্খ ঘোষের মতো প্রতিভাপ্রদীপ্ত একালের ছন্দ-আলোচকের অনুল্লেখের একটি প্রভাব একালের পাঠক-মনে থেকেই যায়।

হ্যাঁ, যে-প্রশ্ন তুললাম, নজরুল তাঁর কবিতায় আত্মার সঙ্গে তাঁর উচ্চারণকে মিলিয়েছিলেন; আর যেভাবে মিলিয়েছিলেন তাতেই বাংলা কবিতার ছন্দে তাঁর নিজস্ব উপহার দেওয়া হ'য়ে গিয়েছিলো। কোন্ পথে সে মুক্তি লেখা হয়েছিলো?—মুক্তক মাত্রাবৃত্তে। মুক্তক মাত্রাবৃত্ত বাংলা ছন্দে নজরুল ইসলামের একান্ত নিজস্ব দান এবং তা তাঁর ব্যক্তিস্বরূপে স্বাক্ষরিত।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাংলা কাব্যেতিহাসে যতো বড়ো বিপ্লব ঘটিয়েছিলো, ঠিক ততো বড়ো না-হলেও তারই সঙ্গে তুলনীয় "বলাকা" কবিতাগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে মুক্তক আবিষ্কার। আমাদের বিশ শতাব্দীতে বাংলা ছন্দের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো ঘটনা এই মুক্তক ছন্দোবন্ধের আবিষ্কার---আমাদের শতাব্দীতে মুক্তকে যতো কবিতা

www.pathagar.com

লেখা হয়েছে আর-কিছুতে ততো নয়, তিরিশের বিখ্যাত পাঁচজন কবি তাঁদের সর্বাধিক কবিতা লিখেছেন মুক্তকে। গৈরিশ ছন্দে এর সূচনা হলেও "বলাকা" কবিতাগ্রন্থেই মুক্তক তার যথার্থ সুর ও স্বর খুঁজে পায়। "বলাকা" (১৯১৬) কবিতাগ্রন্থে মূলত মুক্তক অক্ষরবৃত্তেই কবিতা লেখা হয়েছিলো, এবং আধুনিকদেরও মুখ্য মাধ্যম এই মুক্তক অক্ষরবৃত্ত। স্বরবৃত্ত মুক্তকেরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে "বলাকা" কবিতাগ্রন্থে। কিন্তু এই বইয়ে মাত্রাবৃত্ত মুক্তকের কোনো নজির নেই। "বলাকা" কবিতাগ্রন্থের মুক্তক অক্ষরবৃত্ত ও মুক্তক স্বরবৃত্তের প্রায় পাঁচ বছর পরে নিষ্ক্রান্ত হলো প্রথম বাংলা মুক্তক মাত্রাবৃত্ত। আর এমন-একটি কবিতায়, যা কারো চোখ এড়িয়ে যাবার মতো নয়। নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাই বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম মুক্তক মাত্রাবৃত্ত। 'বিদ্রোহী' লেখা হয়েছিলো ১৯২১ শালের ডিসেম্বর মাসে। প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৯২২ শালের জানুয়ারি মাসে ('মোসলেম ভারত', মাঘ ১৩২৮), ঐ ১৯২২ শালেই কবির প্রথম কবিতা-গ্রন্থ "অগ্নি-বীণা"-র দ্বিতীয় কবিতা হিশেবে গ্রন্থিত হয়। সেদিন এই একটি প্রবহমান ছোটো-বড়ো পঙক্তির মধ্য দিয়ে জন্ম হয়েছিলো যে-কবির, তিনি বাংলা কবিতার একটি ছন্দের এক নতুন ঢঙও তৈরি ক'রে নিয়েছিলেন :

বল বীর
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি' আমারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির!
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাতৃর!
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটিকা দীপ্ত জয়শ্রীর!
বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির!

রবীন্দ্রনাথ কি মাত্রাবৃত্ত মুক্তকে কবিতাই লেখেননি? লিখেছিলেন, 'বিদ্রোহী' কবিতার অনেক পরে। মাত্রাবৃত্ত মুক্তকে লেখা তাঁর যে-দু'টি কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়, সে দু'টিই লেখা ১৩৪৩ শালে, "শ্যামলী"-র

www.pathagar.com

'উৎসর্গ': রচনাকাল (ভাদ্র ১৩৪৩) এবং "সেঁজুতি"-র 'যাবার মুখে' (রচনাকাল : মাঘ ১৩৪৩)। দু'টি কবিতার প্রথম কয়েক লাইন উদ্ধৃত করি :

১, ইটকাঠে গড়া নীরস খাঁচার থেকে
আকাশবিলাসী চিত্তেরে মোর এনেছিলে তুমি ডেকে
শ্যামল শুশ্রূষায়,
নারিকেলবন-পবন-বীজিত নিকুঞ্জ-আঙিনায়।
শরৎলক্ষ্মী কনকমাল্যে জড়ায় মেঘের বেণী,
নীলাম্বরের পটে আঁকে ছবি সুপারি গাছের শ্রেণী।
[উৎসর্গ, শ্যামলী]

২, যাক এ জীবন
যাক নিয়ে যাহা টুটে যায়, যাহা
ছুটে যায়, যাহা
ধূলি হ'য়ে লোটে ধূলি-'পরে, চোরা
মৃত্যুই যার অন্তরে, যাহা
রেখে যায় শুধু ফাঁক।
যাক এ জীবন পুঞ্জিত তার জঞ্জাল নিয়ে যাক।
টুকরো যা থাকে ভাঙা পেয়ালার,
ফুটো সেতারের সুরহারা তার,
শিখা-নিবে-যাওয়া বাতি,
স্বপ্নশেষের ক্লান্তি-বোঝাই রাতি—
নিয়ে যাক যত দিনে-দিনে জমা-করা
প্রবঞ্চনায়-ভরা
নিষ্ফলতার সযত্ন সঞ্চয়।
কুড়ায়ে ঝাঁটায়ে মুছে নিয়ে যাক, নিয়ে যাক শেষ করি
ভাঁটার স্রোতের শেষ-খেয়া-দেওয়া তরী।
[যাবার মুখে, সেঁজুতি]

কেন রবীন্দ্রনাথ মুক্তক অক্ষরবৃত্ত ও মুক্তক স্বরবৃত্তে লিখলেও মুক্তক মাত্রাবৃত্তে দীর্ঘকাল বা এমনকি পরেও পূর্ণ মনস্কতায় লেখেননি, তা যেমন তাঁর কবিস্বভাবে পাওয়া যাবে, তেম্নি মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ সম্পর্কে ধারণার

www.pathagar.com

মধ্যেও নিহিত। ১৩২৪ শালে লেখা 'ছন্দের অর্থ' ("ছন্দ") প্রবন্ধে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ : 'পয়ার ছন্দের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, তাকে প্রায় গাঁঠে গাঁঠে ভাগ করা চলে এবং প্রত্যেক ভাগেই মূল ছন্দের একটা আংশিক রূপ দেখা যায়।.....কিন্তু তিনের ছন্দকে তার ভাগে ভাগে পাওয়া যায় না, এইজন্যে তিনের ছন্দে ইচ্ছামতো থামা চলে না।.....তিনের ছন্দে গতির প্রাবল্যই বেশি স্থিতি কম। সুতরাং তিনের ছন্দ চাঞ্চল্য প্রকাশের পক্ষে ভালো কিন্তু তাতে গাম্ভীর্য এবং প্রসারতা অল্প। তিনের মাত্রার ছন্দে অমিত্রাক্ষর রচনা করতে গেলে বিপদে পড়তে হয়---সে যেন চাকা নিয়ে লাঠি খেলবার চেষ্টা।' রবীন্দ্রনাথ মাত্রাবৃত্তকে বলতেন 'তিনের ছন্দ' আর অমিত্রাক্ষর বলতে এখানে বুঝিয়েছেন তিনি প্রবহমানতা। এই ধারণার জন্যেই কি এই রচনার দীর্ঘ বিশ বছর বাদে হঠাৎ দুটি কবিতা লিখেছিলেন মুক্তক মাত্রাবৃত্তে?

১৩৩৯ শালের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রবোধচন্দ্র সেনের 'ছন্দ-বিচার' নামে একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়, এটি পরে লেখকের "ছন্দ-জিজ্ঞাসা" (১৯৭৪) গ্রন্থে স্থান পায়। প্রবন্ধটি আসলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লেখকের ছন্দবিষয়ক আলোচনা। এই প্রবন্ধের একটি প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি :

> কবি---মাত্রাবৃত্ত ছন্দেও মুক্তক রচনা করা যায় কিনা আমি তাই ভাবছি কিন্তু তাতে মুশকিল আছে। এ ছন্দ গড়িয়ে চলে কিনা। যেখানে সেখানে থামানো যায় না।
>
> আমি---কিন্তু পাঁচ মাত্রার ছন্দে তো কতকটা মুক্তক আপনি রচনা করেছেন। "মহুয়া"-র 'সাগরিকা' কবিতাটি কতকটা মুক্তক ছন্দে রচিত।
>
> কবি---আজকাল ছ' মাত্রার মুক্তক রচনার চেষ্টা আমি করছি।
>
> তারপর তিনি তাঁর কবিতার খাতা থেকে কয়েকটি নব-রচিত কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনালেন। ছ'মাত্রার ছন্দ, পংক্তিতে পংক্তিতে মিল আছে, কিন্তু পংক্তিদৈর্ঘ্যের কিছু স্থিরতা নেই, অথচ কবিতার ভাব বহু পংক্তিতে প্রবাহিত হয়ে গেছে। তাঁর এই ছ'মাত্রার মুক্তক ছন্দের সন্ধান পেয়ে বিস্মিত হলুম। আজও তাঁর নব-নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার অসাধারণ সৃষ্টিকার্যে কিছুমাত্র বিরাম ঘটেনি। আজও তিনি নতুন ছন্দ রচনায় সমানভাবে নিরত রয়েছেন।

www.pathagar.com

এই নিবন্ধ বা রবীন্দ্র-প্রবোধ কথোপকথনের সময়কাল : ১৩৩৯। (আবার কি স্মরণ করিয়ে দেবো 'বিদ্রোহী'র রচনাকাল ১৩২৮---এই আলোচনার দশ বছরেরও আগে?) প্রবোধচন্দ্র উল্লিখিত "মহুয়া"-র 'সাগরিকা' কবিতাটি ছ'মাত্রার না-হলেও পাঁচ মাত্রার মুক্তকই—মুক্তক মাত্রাবৃত্ত। কিন্তু এটিরও রচনাকাল ১৯২৭---'বিদ্রোহী' কবিতা লেখার বছর ছয়েক পরে। 'সাগরিকা' কবিতাটির কয়েক লাইন উদ্ধৃত করি।

সাগরজলে সিনান করি সজল এলোচুলে
বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে।
শিথিল পীতবাস
মাটির পরে কুটিলরেখা লুটিল চারি পাশ।
নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে
চিকন সোনা---লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।
মকরচূড় মুকুটখানি পরি ললাট 'পরে
ধনুকবাণ ধরি দখিন করে,
দাঁড়ানু রাজবেশী---
কহিনু, 'আমি এসেছি পরদেশী।'

মুক্তক মাত্রাবৃত্ত সম্পর্কে ১৩২৪ শালে ও ১৩৩৯ শালে, প্রায় পনেরো বছরের পরিসরে রবীন্দ্রনাথের মতামতও প্রায় অভিন্ন---রেখাঙ্কিত বাক্য-গুলো বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

প্রবোধচন্দ্র সেন বাংলা কবিতায় মুক্তক মাত্রাবৃত্তের একটিমাত্র উদা-হরণ দিয়েছেন ("ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ" বইএ) : রবীন্দ্রনাথের "সেঁজুতি" -র 'যাবার মুখে' কবিতাটি। এখন, বলা বাহুল্য যে, এই কবিতার পনেরো বছর আগে নজরুল মুক্তক মাত্রাবৃত্ত লিখেছিলেন। আবার প্রবোধচন্দ্র সেনের ভুল ধরে বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'বাংলা ছন্দ' ("সাহিত্যচর্চা") প্রবন্ধে লেখেন, মুক্তক পয়ার মুক্তক স্বরবৃত্ত রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরবর্তী কবিরা অজস্র লিখেছেন, কিন্তু মাত্রাবৃত্ত মুক্তক বিরল। এবং সেই বিরলতার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি—তিনিও!—নজরুলকে ভুলে গিয়ে বিষ্ণু দে'র 'মন দেওয়া-নেওয়া' ("চোরাবালি") এবং তাঁর নিজের 'কঙ্কাবতী' কবিতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। কিন্তু বিষ্ণু দে-র 'মন দেওয়া-নেওয়া' লেখা হয়েছে ১৯২৬ শালে আর

www.pathagar.com

বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী' ১৯২৯ শালে---যথাক্রমে 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পাঁচ ও আট বছর পরে।

২

এখন দেখা যাক এই মুক্তক মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে নজরুলের কবিতার সারাৎ-সারের যোগ কতোখানি। একটু আগেই মুক্তক মাত্রাবৃত্ত সম্পর্কে রবীন্দ্র-নাথের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছি। এখন বাংলা ভাষার একজন মহান কবি জীবনানন্দ দাশ এই ছন্দ সম্পর্কে কি বলেছেন, দেখা যাক। জীবনা-নন্দ লিখছেন, 'মাত্রাবৃত্ত মুক্তকের উদাহরণ বাংলা কবিতায় বেশি নেই;---এ যুগের অবাধ উচ্ছৃংখলতা দমন করবার জন্যে সর্বব্যাপী নিপীড়নের যে পরিচয় পাওয়া যায় রাষ্ট্রে ও সমাজে---সেইটে কাব্যের ছন্দালোকে নিঃসংশয়রূপে প্রতিফলিত হলে মাত্রাবৃত্ত মুক্তকের জন্ম হয় কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। যদি হয় এবং কবিতার ছন্দ যদি যুগের নাড়ীমূলের নির্দেশ দান করে, তাহলে এরকম মুক্তকে প্রচুর কবিতা আশা করা যায়। কিন্তু কোথায় তা?' ('কবিতার আত্মা ও শরীর,' "কবিতার কথা") রবীন্দ্রনাথ-প্রোক্ত 'গতির প্রাবল্য' ও 'চাঞ্চল্য' নজরুল ব্যবহৃত মুক্তকে আছে, তেম্নি আছে 'বিদ্রোহী' কবিতার নাড়িতেই। হয়তো 'গাম্ভীর্য' ও 'প্রসারতা'র অভাব আছে, কিন্তু তা নজরুলেরই কবিস্বভাবী। আরো: জীবনানন্দ-কথিত যুগরূপের প্রতিফলনও তা ধরে রেখেছে।

তা নাহলে নজরুল উদ্বোধিত মুক্তক মাত্রাবৃত্তে উত্তরকালে কী করে লেখা হতে পারলো অনেকগুলো অসামান্য কবিতা? লেখা হলো বিষ্ণু দে'র 'ঘোড়সাওয়ার', বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী,' জীবনানন্দ দাশের 'লোকেন বোসের জর্নাল,' ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি', শামসুর রাহমানের 'রূপালি স্নান' প্রভৃতি। মুক্তক মাত্রাবৃত্তে মূল্যবান কাজ করেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। যেমন কিছুকাল আগে চল্লিশের কবিদের গদ্যকবি-তার বিশাল চর্চার পটভূমিতে মুক্তক মাত্রাবৃত্তে সবচেয়ে সচল ও আন্তরিক ও অনায়াস ছিলেন ফররুখ আহমদ, তেম্নি আধুনিকদের মধ্যে অলোক-রঞ্জন দাশগুপ্ত মাত্রাবৃত্তে এবং মুক্তক মাত্রাবৃত্তে, অন্তমিলে ও জ্যামিতি-বাহারে সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ এবং পরীক্ষা-পরায়ণ।

www.pathagar.com

৩

নজরুল ইসলামের ছন্দকৃতিত্বের আরো কতোগুলো দিক এই সূত্রে আলোচনা করা যেতে পারে।

মাত্রাবৃত্তের মতো বাঁধা-ধরা ছন্দের ভিতর নজরুল অনেকখানি স্বাধীনতার ব্যবস্থা করেছিলেন শুধু মুক্তক করেই নয়, পূর্ণ পর্বের ভিতরেই হঠাৎ-হঠাৎ অতিপর্ব ও অপূর্ণ পর্বের উপর্যুপরি প্রয়োগে। এতে সুরের একঘেয়েমি কেটে গিয়ে একটা নতুন ধরনের ছন্দস্পন্দ জেগে উঠেছিলো। মুক্তক মাত্রাবৃত্তের প্রথম দৃষ্টান্ত 'বিদ্রোহী'তেই তিনি এই কুশলতা চারিয়ে দিয়েছিলেন : অতিপর্ব, পূর্ণ পর্ব আর অপূর্ণ পর্বকে এমন চাতুর্যে মিশিয়ে যাকে বলতে হয় প্রতিভাবানেরই tour de force :

আমি হোমশিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি

এই দুটি চাক্ষুষ পঙক্তিকে তিনি আসলে পরিণত করেন এরকম শ্রাব্য পঙক্তিতে :

আমি । হোমশিখা,
আমি । সাগ্নিক জম। দগ্নি ,
আমি । যজ্ঞ,
আমি । পুরোহিত,
আমি । অগ্নি

কিন্তু প্রবহমানতা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় না। ছয় মাত্রার পূর্ণ পর্বের মধ্যে এরকম অতিপর্ব আর অপূর্ণ পর্বের স্বেচ্ছাবিহার 'বিদ্রোহী' কবিতায় তো আরো আছেই, উপরন্তু আছে 'ধূমকেতু', 'আগমনী' প্রভৃতি কবিতায়ও।

অতিপর্বের ব্যবহার বাংলা কবিতায় ও গানে দীর্ঘকাল আবহমান। অতিপর্বের শেষ সুব্যবহার ঘটেছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'অর্কেস্ট্রা' ("অর্কেস্ট্রা") নামে দীর্ঘকবিতায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও অতিপর্বের অজস্র উজ্জ্বল প্রয়োগ আছে। তবু নজরুলের কবিতায় এমন উজ্জ্বল প্রচুরভাবে অতিপর্বের যে-ব্যবহার, তার কোনো একক তুলনা বাংলা কবিতায় পাওয়া যাবে না। নজরুলের সবচেয়ে বিশিষ্ট প্রথম কাব্যগ্রন্থটিতে তাঁর কাব্য-চরিত্রের অনেকগুলি দিক প্রকাশিত হয়েছে—"অগ্নি-বীণা"র তুলনীয় কোনো একক কাব্যগ্রন্থের নাম করা যাবে না, যাতে অতিপর্বের এতো দীপ্ত-

www.pathagar.com

উদ্দীপ্ত অজস্র প্রয়োগ আছে। মূলত বাংলা গানের এই প্রকরণটি যে এতো বেশি ব্যবহার করলেন নজরুল, তার কারণ সুরঝংকার ছিলো তাঁর হৃৎ-স্পন্দনেই এবং তাঁর অতিপর্ব ব্যবহারের বিশিষ্টতাও এখানে যে, অন্যান্য কবিরা যেখানে তাকে প্রয়োগ করেছেন নিয়মিত একটি নকশায়, নজরুল সেখানে চারিয়ে দিয়েছেন চরম এলোমেলোমিতে।

নজরুলের অনেক গান কবিতার ছন্দে রচিত এবং তার অনেকগুলো কবিতা হিশেবে স্বীকার করতে কোনো বাধা থাকে না। একথা তো সত্যি রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধেও। গান রচনা করতে গিয়ে নজরুলের ছন্দের দু'টি কৌশলের আবিষ্কার ও ব্যবহার চোখে না পড়ে পারে না। —একটি প্রয়োগ উপর্যুপরি। স্বররত্ত ছন্দে, আমরা জানি, প্রতি পর্বে চার সিলেবল থাকে; তবে হঠাৎ-হঠাৎ তিন বা পাঁচ এমন কি দুই বা ছয় সিলেবলেও একটি পর্ব তৈরি হ'তে পারে। নজরুল এরই মধ্যে আলাদা একটি দোল-দ্যোতনা আনলেন প্রতি চরণের প্রথম পঙক্তিটি সুনির্দিষ্ট তিনটি সিলেবলে নির্মাণ ক'রে; কবির প্রথম গীতিগ্রন্থ "বুলবুল"-এ এটি ঘটেছে উপর্যুপরি। "বুলবুল"-এর ১, ২, ১২, ২৭ ও ৪১-সংখ্যক গানগুলি লক্ষ্য করুন। দু'একটি গান উদ্ধৃত করি:

১. বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে
দিসনে আজি দোল।
আজো তা'র ফুলকলিদের ঘুম টুটেনি
তন্দ্রাতে বিলোল।

[১, বুলবুল]

২. চেয়ো না সুনয়না
আর চেয়ো না এ নয়ন পানে।
জানিতে নাইক বাকী
সই ও আঁখি কী যাদু জানে।

[১২, বুলবুল]

আবার, অন্য একটি গানে (বুলবুল) সৃষ্টি করলেন ৩+৫+৩+৫-এর সিলেবলের আশ্চর্য বৈচিত্র্য। আবার, "দীওয়ান-ই-হাফিজ"-এ ৪+৩+৪+৩ এর বৈচিত্র্য। এইভাবে স্বররত্তের চার সিলেবলের পর্ব আর হঠাৎ এক-আধটা ব্যতিক্রমের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে যে-ছন্দ চলে আসছিলো, তাতে

www.pathagar.com

সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়মিত ৩ ও ৫ সিলেবলের পর্ব তৈরি করে নজরুল রাখলেন অসামান্য শ্রুতিসিদ্ধতার পরিচয়। স্বরবৃত্তে হঠাৎ-হঠাৎ যে-ব্যতিক্রমী পর্ব সৃষ্টি হতো, তাকে একটি নিয়মে বেঁধে দিয়ে নজরুল তার থেকে বের করে এনেছেন সুখদ সুরঝঙ্কার।

অন্য একটি গানে আছে ছন্দের এক আশ্চর্য পরীক্ষা। একে হয়তো 'ফ্রি ভার্স' বা 'ভার্স লিবার' ঠিক বলা চলবে না; কেননা যেখানে মিশ্রছন্দে ছন্দব্যবহার অনিয়মিত, অনির্দিষ্ট ও স্বাধীন, আর এখানে প্রত্যেকটি স্তবকে নিয়মিত নির্দিষ্ট দু'টি ছন্দ মিশে গেছে। কিন্তু এ এক-হিশাবে নজরুলী ফ্রি ভার্স বা মিশ্র ছন্দ। —তাছাড়া অন্য কোন নামে একে শনাক্ত করবো? "বুলবুল"-এর ৪-সংখ্যক গানে এই আশ্চর্য সংগম সম্পন্ন হয়েছিলো: মাত্রা-বৃত্ত ও স্বরবৃত্তের মিশোল---প্রতি স্তবকের প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ ছত্রে (পাঁচ মাত্রার) মাত্রাবৃত্ত আর তৃতীয় ছত্রে স্বরবৃত্ত (প্রথম পর্বে আবার যথারীতি তিন সিলেবলের নজরুলী পর্ব)। কেবল একটি স্তবক উদ্ধৃত করছি:

ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা সনে রহিল আঁকা।
আজো সজনী দিন-রজনী সে বিনে গনি তেমনি ফাঁকা।
আগে মন করলে চুরি মর্মে শেষে হানলে ছুরি,
এত শঠতা এত যে ব্যথা তবু যেন তা' মধুতে মাখা॥

বাংলা ছন্দের এই সম্ভাবনাটি আজো অব্যবহৃত রয়ে গেলো। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়; 'একবার যা ঘটেছে, তার বারবার ঘটায় বাধা কিসের?' এই অনয় সংগম সম্পন্ন হয়েছিলো নজরুলের হাতে তার কি কারণ এই যে, তিনি অক্ষরবৃত্তকে সরিয়ে মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্ত নিয়ে ক্রমাগত খেলছিলেন?

—এই সবই হচ্ছে বাংলা ছন্দে নজরুল ইসলামের নিজস্ব দান। আর এগুলি নজরুলের কবিতার অন্তরাত্মার সঙ্গে জড়িত-মিশ্রিত। মুক্তক মাত্রা-বৃত্ত, ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্তের ভিতরে-ভিতরে পাঁচ মাত্রার চাল, অতিপর্ব, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের মিশোল—এই সবেরই উৎস এক প্রবল ধ্বনিময় চিত্ত, এক উল্লাস, যা নজরুলের কবিতার সঙ্গে ওতপ্রোত শ্লিষ্ট। যে-কবি কবিতা লিখতে গিয়ে বাংলা ছন্দের মূল প্রবাহকেই বর্জন করলেন, বর্জন করলেন তার গীতল ঝংকৃত ধ্বনিময় সুরময় চিত্তের জন্যে, তিনি যে সেই সুর-ধ্বনির মধ্যে দু'একটি নতুন সুর ও স্বর যোজনা করবেন—

www.pathagar.com

এটাই তো স্বাভাবিক। বাংলা ছন্দের অনুসূক্ষ্ম আলোচনায় একে কি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব, না সংগত? তথ্য, নিরঞ্জন তথ্য কবিতা লেখার কাজে কতোটুকু আসে, সে আলাদা প্রশ্ন; কিন্তু কবিতাবিচারে কোনো-কোনো পর্যায়ে তার ভূমিকা বিরাট। নজরুলের কবিতার বিষয়-মহিমায় সাধারণ পাঠক প্লুত; বিশেষজ্ঞ পাঠকরা অনেকে এই একই কারণে তাকে খারিজ করে-ছেন। সেজন্যেই বোধহয় তার বিচারে আরো শান্ত স্থির অধ্যয়নশীল মনীষা দরকার।

এবং সেই আরব্ধ তথ্যানুসন্ধানে নেমে নজরুলের সীমা-সরহদ্দও জেনে নেওয়া দরকার আমাদের।

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ঠিকই লিখেছিলেন, 'বিদেশী ছন্দের অনুকরণ করিতে গেলে আমাদের মাত্রাবৃত্ত ভিন্ন উপায় নাই, কারণ অক্ষর পরম্পরার মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য সংস্কৃত, ইংরেজী, আরবী প্রভৃতি ছন্দের ভিত্তি, তাহার কতকটা অনুকরণ এক মাত্রাবৃত্তেই সম্ভব। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নজরুল ইসলাম প্রমুখ কবিরা তাহাই করিয়াছেন।' (পৃ. ১০২-৩, "বাংলা ছন্দের মূলসূত্র," ১৯৪৬) নজরুল এবং সত্যেন্দ্রনাথ যে-সব সংস্কৃত ও আরবি ছন্দের অনুকরণে বাংলা কবিতা লেখেন, সেগুলি মাত্রাবৃত্তেই সিদ্ধ। বিদেশি-বিভাষী ছন্দে নজরুলোত্তর যে-সৃষ্টি, তা-ও মাত্রাবৃত্তেই; সে-হিশেবে শেষ-পর্যন্ত বিদেশি-বিভাষী ছন্দ থাকেই না আর; বলা চলে, বাংলা ছন্দেই পর্য-বসিত হয়।

দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের পরে জন্মালেও নজরুল গদ্যকবিতাকে স্বীকার করে নিতে পারেননি। ছন্দ ও মিল তাঁর এতোটাই রক্তে ছিলো যে, ছন্দবর্জিত মিলবর্জিত কবিতাকে তিনি কবিতা বলেই মনে করেননি। তাই গদ্যকবিতার ছন্দ ও মিলহীনতাকে আক্রমণ করেছিলেন তাঁর একমাত্র গদ্যকবিতাটিতে, যা আসলে গদ্যকবিতার উদ্দেশে একটি ব্যঙ্গকবিতা।

নজরুলের ছন্দালোচনায় তাঁর সময়কালও ভুলে গেলে চলবে না। নির্বীর্য নিরর্থ ছন্দকে তিনি-যে একদিন অর্থে-বিদ্যুতে-তাৎপর্যে ভরে দিয়েছিলেন, এ তো অত্যন্ত সত্য। রবীন্দ্র-প্রবর্তিত ছন্দ যখন অনুগামীদের হাতে ক্রমাগত অর্থহীন অনুভবহীন উপলব্ধিহীন ব্যবহৃত হচ্ছিলো, তখনই নজরুলের হাতে ছন্দ হয়ে উঠলো কোনো জামাকাপড়ের মতো আলাদা নয়, ছন্দ হয়ে উঠলো কবিতার আত্মা। সেই ১৩২৭ শালে —নজরুলের

www.pathagar.com

আবির্ভাব-মুহূর্তে—মোহিতলাল মজুমদার যা লিখেছিলেন, আজ আবার তা নতুন করে স্মরণ করা যেতে পারে :

> কাজী সাহেবের কবিতায় কি দেখিলাম বলিব? বাঙলা কাব্যের যে অধুনাতন ছন্দঝঙ্কার ও ধ্বনি-বৈচিত্র্যে এককালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া যে সুন্দরী মিথ্যারূপিণীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দ-ঝংকারে আবার আস্থা হইয়াছে। যে ছন্দ কবিতায় শব্দার্থময়ী কণ্ঠভারতীর ভূষণ না হইয়া, প্রাণের আকুতি ও হৃদয়স্পন্দনের সহচর না হইয়া ইদানীং কেবলমাত্র শ্রবণপ্রীতিকর প্রাণহীন চারু চাতুরীতে পর্যবসিত হইয়াছে, সেই ছন্দ এই নবীন কবির কবিতায় তাঁহার হৃদয়নিহিত ভাবের সহিত সুর মিলাইয়া মানবকণ্ঠের স্বরসপ্তকের সেবক হইয়াছে। কাজী সাহেবের ছন্দ তাঁহার স্বতঃউৎসারিত ভাব-কল্লোলিনীর অবশ্যম্ভাবী গতিভঙ্গী।

১৯৭৯

আলোচনা

আবদুল কাদির

গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬ তারিখের রবিবাসরীর 'ইত্তেফাক' পত্রিকায় অধ্যাপক আবদুল মান্নান সৈয়দ 'আচ্ছাদিত বারান্দা' শিরোনামে একটি তথ্যগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছেন। তার সূচনায় আছে এই প্রশ্নটি: 'বাংলা ছন্দে নজরুল ইসলামের নিজস্ব কোনো দান আছে কী?' এর উত্তরে আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেছেন : 'মুক্তক মাত্রাবৃত্ত বাংলা ছন্দে নজরুল ইসলামের একান্ত নিজস্ব দান। নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাই বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম মুক্তক মাত্রাবৃত্ত।'

কিন্তু অধ্যাপক শ্রীশশুখ ঘোষ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, কবি বুদ্ধদেব বসু, কবি জীবনানন্দ দাশ মুক্তক মাত্রাবৃত্ত প্রসঙ্গে তাঁদের ছন্দালোচনায় নজরুল ইসলামের সুবিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতার নূতন ছন্দরীতির কোনও উল্লেখ করেননি; এমনকি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছন্দালোচনাকালে স্বনামধন্য ছান্দসিক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনও তার উল্লেখ করেননি; এই ব্যাপারটি আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর প্রবন্ধে সবিস্তারে বর্ণনা করতে গিয়ে 'বিদ্রোহী' কবিতার ছন্দে নজরুলের 'ব্যক্তিস্বরূপের স্বাক্ষর' সংস্কাররূপে উদঘাটন করেছেন। কিন্তু

www.pathagar.com

তাঁর আলোচনা প'ড়ে সাধারণ পাঠকের ধারণা হ'তে পারে যে, বিদ্রোহী যে বাঙলা ভাষায় সমিল মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রথম কবিতা, এই বিষয়টি বোধ হয় এর আগে আর কেউই লক্ষ্য করেননি। তাই আমি এ প্রসঙ্গে দু'টি লেখার অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করছি।

১৩৩০ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন তার 'ছন্দের শ্রেণীবিভাগ : মাত্রাবৃত্ত ছন্দ' শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধের এক স্থানে বলেন—

> কিন্তু মাত্রাবৃত্ত ছন্দেও মুক্তবন্ধ কবিতা রচনা করা যায়, তাতে সন্দেহ নেই। বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে মুক্তবন্ধ কবিতার অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাংলার উদীয়মান কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' নামক কবিতাই উল্লেখযোগ্য। [ছন্দ-জিজ্ঞাসা, ৫৬-৫৭ পৃ.]

১৩৫৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'সওগাত' পত্রিকায় আবদুল কাদির তাঁর 'নজরুলের জীবন ও সাহিত্য' শীর্ষক এক প্রবন্ধে (কলিকাতা বেতার মারফত প্রচারিত) বলেন :

> বাল্য থেকেই নজরুলের ছন্দ ও সুরের কান প্রখর ছিল। তিনিই প্রথম রবীন্দ্রনাথের নবাবিষ্কৃত মুক্তক স্বরবৃত্ত ছন্দে কবিতা লেখেন : এই ছন্দে যে ওজন সৃষ্টি চলে তা 'কামাল পাশা' লিখে প্রমাণ করলেন। তাঁর 'বিদ্রোহী' সমিল মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত, বাঙলা ভাষায় তিনি এই নব ছন্দের প্রবর্তক।
>
> [নজরুল-রচনা-সম্ভার, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৪২৬ পৃ.]

উপসংহারে আমার নিবেদন এই যে, বাংলা ছন্দে কাজী নজরুল ইসলামের বিরাট ও বিচিত্র অবদান সম্বন্ধে যাঁরা জানতে আগ্রহী তাঁরা অবসর সময়ে আমার লেখা : 'নজরুলের কবিতার ছন্দ-পরিচয়' (মাসিক মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২), 'বাংলা ছন্দ ও নজরুল ইসলাম' (নজরুল পরিচিতি, ১৩৬৬), 'নজরুল কাব্যের আঙ্গিক-বিচার' (বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৯), 'নজরুল ইসলামের ছন্দ' (উত্তরাধিকার, মে-জুলাই, ১৯৭৭) প্রভৃতি প্রবন্ধ পড়তে পারেন।

ঢাকা ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬
৩রা জুন ১৯৭৯ দৈনিক ইত্তেফাক

www.pathagar.com

মুজিবুল হক কবীর

কবি আবদুল মান্নান সৈয়দের 'আচ্ছাদিত বারান্দা'য় নজরুলের কাব্য ছন্দের যে প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের বিশেষ দিকটি উন্মোচিত হয়েছে তা যে কোন মননশীল পাঠকের চিত্তকে নতুনভাবে আলোড়িত করবে। একালের বিশিষ্ট কবি-সমালোচক শ্রী শঙ্খ ঘোষের "ছন্দের বারান্দা"য় যে সংগুপ্ত অপূর্ণতা— তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে সঙ্গত চিন্তনের শতজলঝর্ণা থেকে নজরুল কাব্য-ছন্দের গড়ন ও সৌন্দর্য পরীক্ষা করেছেন মান্নান সৈয়দ। তিনি শ্রী শঙ্খ ঘোষকে সরাসরি নিরলঙ্কার ভঙ্গিতে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন এ কারণে যে, তাঁর ছন্দোগ্রন্থে মাইকেল থেকে রবীন্দ্রনাথ, শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ, সুধীন দত্ত (প্রসঙ্গক্রমে শক্তি-সুনীল) আলোচিত হতে পারেন অথচ ছান্দসিক নজরুলের নামোল্লেখ পর্যন্ত কেন অনুল্লিখিত থেকে যায়।

মান্নান সৈয়দের এই নজরুল ছন্দালোচনা নতুন আলোকে দীপ্ত হলেও কিছু প্রতর্ক উত্থাপিত হতে পারে। তাঁর মতে মুক্তক মাত্রাবৃত্ত বাংলা ছন্দে নজরুল ইসলামের একান্ত নিজস্ব দান। —'নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাই বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম মুক্তক মাত্রাবৃত্ত।'

মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সাধারণত দেখা যায় পংক্তির অসমতা, প্রবহমানতা, অপূর্ণ পর্বের বৈচিত্র্য ও অতিপর্বের চাতুর্যময় ব্যবহার।

মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের এই বৈশিষ্ট্য স্মরণ রেখে আলোচনায় অগ্রসর হলে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাকে 'বাংলা ভাষায় প্রথম মুক্তক মাত্রাবৃত্ত' সম্ভবত বলা যায় না। এর আগেই রবীন্দ্রনাথের "প্রভাত-সঙ্গীতে"র (১২৮৮-১২৮৯) 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় মুক্তক মাত্রাবৃত্তের আভাস ফুটে উঠেছিল।

'বাহিরিতে চায়/দেখিতে না পায় কোথায় কারার দ্বার/কেন রে বিধাতা/ পাষাণ হেন চারদিকে তার বাঁধন কেন ভাঙরে হৃদয়/ভাঙরে বাঁধন সাধরে আজিকে/প্রাণের সাধন।' 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটিতে পর্ব থেকে পর্বান্তরে রয়েছে ধ্বনিব্যঞ্জনা। পংক্তির হ্রাস-দীর্ঘতা, প্রবহমানতা, গীতল ভঙ্গিও অনুসৃত হয়েছে। প্রথম উদ্ধৃতির প্রথম পংক্তি বিশ মাত্র। বিশিষ্ট ছয়+ ছয়+ছয়+দুই, দ্বিতীয় পংক্তি ছয়+পাঁচ (একাবলীর সঙ্গে তুলনীয়), তৃতীয় পংক্তি ছয়+পাঁচ, চতুর্থ পংক্তি ছয়+ছয়, পঞ্চম পংক্তি ছয়। ছয় মাত্রিক দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তিতে রয়েছে পাঁচমাত্রা বিশিষ্ট অপূর্ণ পর্ব, যা কিনা পরস্পরের মধ্যে এনেছে সমতা।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে লক্ষণীয় অতিপর্ব এবং অপূর্ণ পর্বের ব্যবহার, চৌদ্দ মাত্রা বিশিষ্ট (দুই+ছয়+ছয়) দীর্ঘ তৃতীয় পংক্তি।

তাঁর "মানসী" (১২৯৪-১২৯৭) কাব্যগ্রন্থের 'ভালো করে বলে যাও' কবিতায়ও মুক্তক মাত্রাবৃত্তের চেতনা সঞ্চারক হয়েছে—

'আমি কুন্তল/দিব খুলে। অঞ্চল মাঝে/ডাকিব তোমায়/নিশীথ নিবিড় দুটি/বাহুপাশে বাঁধি/নত মুখখানি/বক্ষে লইব/তুলে।' এখানে প্রথম পংক্তিতে রয়েছে পূর্ণ পর্ব ছয়, অপূর্ণ চার। দীর্ঘতম তৃতীয় পংক্তিতে অতি পর্বও লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের প্রাগুক্ত কবিতাদ্বয়ের ছন্দোবিশ্লেষণ এভাবে সম্ভব হলে মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে প্রথম কবিতা লেখার কৃতিত্ব নজরুলের প্রাপ্য নয়। এবং 'মুক্তক মাত্রাবৃত্ত বাংলা ছন্দে নজরুল ইসলামের একান্ত নিজস্ব দান' এমন মন্তব্য করা চলে না। তবে তা যে নজরুলের 'ব্যক্তি-স্বরূপে স্বাক্ষরিত', তিনি যে এ ছন্দের সফল কবি, তাতে সন্দেহ-অবকাশ নেই। এই ছন্দে রবীন্দ্রনাথ খুব বেশী অভিজ্ঞানচিহ্ন রেখে যাননি। আবদুল মান্নান সৈয়দ অবশ্য তাঁর দুটি মাত্র কবিতার সন্ধান পেয়েছেন, এছাড়াও স্মরণীয় "নবজাতকে"র 'শেষ বেলা'। গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে আরো কিছু কবিতা বেরিয়ে যেতে পারে।

মুক্তক অক্ষরবৃত্তের সূচনা প্রসঙ্গে তিনি যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তাতেও সামান্য ফাঁক রয়েছে। তাঁর স্বগত ছন্দোচিন্তা দ্যোতিত হয়েছে এভাবে যে গৈরিশছন্দেই এর সূচনা।

প্রকৃতপক্ষে বাঙলা ভাষায় অমিল মুক্তক অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রত্নরূপ দৃষ্ট হয় রামাই পণ্ডিতের রচনায়।

শ্রী ধর্মের দূত নগরে বেরিএ গেল।
নিশ্চয় পড়িল পরমাদ।
কাঙ মাঙ কার যম দাতে কার খড়। [শূন্যপুরাণ]

ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধে একে হিরুবৃত্তগন্ধী রচনা বলে চিহ্নিত করেছেন, আর কবি-সমালোচক আবদুল কাদির একে মুক্তবন্ধ কবিতার আদিরূপ বলেছেন। (১৯৬০, 'সমকাল', ফেব্রুয়ারি ৩১ পৃ.)

এর সুদীর্ঘকাল পর বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে এলেন দীপ্র ঝড় অতিক্রমী কবি মধুসূদন দত্ত। বাংলা কবিতায় তিনি একেবারে সম্পূর্ণ নতুন ছন্দ

www.pathagar.com

চেতনা (অমিত্রাক্ষর) সঞ্চারিত করে দিলেন। গিরিশচন্দ্রের অনেক আগেই মাইকেল মুক্তক অক্ষরবৃত্তের বীজ তাঁর কাব্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন :

ভেবেছিনু গিরিবর। রমার প্রসাদে তার দয়াবলে ভাঙ্গা গড় গড়াইব, জল পূর্ণ করি, জলশূন্য পরিখায়।

ধনুর্বাণ ধরি দ্বারিগণ আবার রক্ষিবে দ্বার অতি কুতূহলে।

[পঞ্চকোট গিরি বিদায় সঙ্গীত] প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম পংক্তি চৌদ্দ অক্ষরের পয়ার। দ্বিতীয় ছত্র গড়াক্ষয়ী চতুর্থ পংক্তি আঠারো অক্ষরের দীর্ঘ পয়ার এখানে মিলবন্ধন দূরপ্রসারী।

এমনকি মধুসূদন তাঁর "পদ্মাবতী" নাটকেও মুক্তকাভাসিত রীতিতে সংলাপ নির্মাণ করেছেন। বাংলা কবিতায় তিনিই প্রথম এই ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন বলে আমাদের মনে হয়। গৈরিশ ছন্দে মুক্তকের সূচনা হয়নি, মাইকেল ছন্দ থেকেই এসেছে প্রবহমানতা, অমিত্রতা, মুক্তকরীতি। পরবর্তী সময়ে এই ছন্দই রবীন্দ্রনাথের হাতে আরো পরিপক্ক, শিল্পিত, শোভনসুন্দর হয়ে ওঠে।

মান্নান সৈয়দের ছন্দবিশ্লেষণ ক্ষমতা অসাধারণ, তাঁর তীক্ষ্ণোজ্জ্বল দৃষ্টির সীমানা থেকে কিছুই যেন বাদ পড়ে না। শঙ্খ ঘোষের ওপর কি তাঁর চাপ একালের বিতর্কিত কবি, সমালোচক শঙ্খ ঘোষ কি নজরুলের ব্যবহৃত ছন্দ সম্পর্কে একেবারে অনবহিত? নজরুলের ছন্দকে তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন সত্যি, কিন্তু তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে নজরুলের ছন্দের যথাযথ যোগাযোগ ঘটেনি একথা সহজে যুক্তিপ্রমাণ ব্যতিরেকে কেউ মেনে নেবেন না।
২৪ শে জুন ১৯৭৯

আবদুল মান্নান সৈয়দ

কিছুকাল থেকে একটু বিশদ-গভীরভাবে ছন্দ বিষয়ে পড়াশোনা ও লেখার চেষ্টা আমি করছি। ছন্দচর্চায় নেমে দেখলাম, আমাদের দেশে ছন্দচর্চার কোনো ধারা তৈরি হয়নি। বিচ্ছিন্নভাবে লিখেছেন আবদুল কাদির, সৈয়দ আলী আহসান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং আর কেউ-কেউ। ছন্দ এদেশে কবিতা-বিবেচনার একটি অংশ হিশেবেই আলোচিত হয়ে আসছে; আলাদাভাবে ছন্দবিবেচনার ধারা সৃষ্টি হয়নি। আমি মনে করি, আরো অনেক কিছুর মতো এ দেশে বাংলা ছন্দের আলোচনা-প্রত্যালোচনার স্রোত প্রবাহিত হওয়া দরকার। তাতে ছন্দ-বিষয়ে অনেক নতুন বিবেচনা

www.pathagar.com

ও পুনর্বিবেচনা হতে থাকবে এবং ছন্দ-বিষয়ক সত্যের দিকে আমরা ক্রমশ অগ্রসর হয়ে যাবো।

খানিকটা এই চিন্তা থেকেই 'ইত্তেফাকে'র মতো বহুপঠিত কাগজে নজরুল ইসলামের কবিতার ছন্দ-বিষয়ক আমার একটি প্রবন্ধ ছাপতে দিই। 'আচ্ছাদিত বারান্দা' নামে 'রবিবাসরীয় ইত্তেফাকে' প্রবন্ধটি ছাপা হয় গত ২৭শে মে, ১৯৭৯ তারিখে। আমার প্রবন্ধটি প্রকাশের পর ৩রা জুন তারিখে কবি আবদুল কাদির ঐ প্রবন্ধ প্রাসঙ্গিক একটি আলোচনা পাঠান; ইত্তেফাকে সেটি 'নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার ছন্দ' নামে মুদ্রিত হয়েছে। ২৪শে জুন মুজীবুল হক কবীরের লেখা আর-একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে 'আবদুল মান্নান সৈয়দের আচ্ছাদিত বারান্দা নতুন বিতর্ক' শিরোনামে।

যে-দেশে যে-কোনো আলোচনার ফলাফল নীরবতা, সেখানে আমার রচনাটি নিয়ে আমাদের সাহিত্য-পৃথিবীর দুই প্রান্ত থেকে দুজন প্রবীণ ও তরুণ লেখকের এই প্রত্যালোচনা নিশ্চিতভাবেই সুখকর। শ্রদ্ধেয় আবদুল কাদির ও স্নেহাস্পদ মুজীবুল হক কবীরকে আমার ধন্যবাদ দিই। এই সুযোগে সেই সব ব্যক্তিকেও ধন্যবাদ জানাই, যাঁরা লেখাটি পড়ে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। ধন্যবাদ অচেনা পাঠকদেরও, যাঁরা ঐ লেখাটি পড়েছিলেন, এবং যে-কোনোভাবে প্রতিক্রিয়ায় স্নাত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, আমার পাঠকদের একথাও জানাই যে, গত ১১ই জ্যৈষ্ঠের নজরুল জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত দুটি অনুষ্ঠানে---বাংলা একাডেমীতে এবং বাংলাদেশ পরিষদে ---আমার বক্তৃতার মূল বক্তব্য ছিলো এই প্রবন্ধেরই সারাৎসার।

কবি আবদুল কাদিরই প্রথম বলেছেন যে, নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' সমিল মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত, 'বাঙলা ভাষায় তিনি এই নব ছন্দের প্রবর্তক।' এই তথ্যটি প্রথম তিনিই বলেছেন। কিন্তু 'আচ্ছাদিত বারান্দা'র পাঠক নিশ্চিতভাবেই লক্ষ্য করবেন যে, আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য শুধু তা-ই ছিলো না, তাহলে আর ঐ প্রবন্ধ লিখবার দরকারই হতো না। লক্ষ্য ছিলো এটাও দেখিয়ে দেওয়া যে, প্রায় পঞ্চাশ বছরব্যাপী বাংলা ছন্দ-আলোচনায়—প্রবোধচন্দ্র সেন, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ থেকে শঙ্খ ঘোষ অব্দি—এই তথ্যটি অনুচ্চারিত রয়ে গেছে। আমি এই প্রশ্নই তুলতে চেয়ে ছিলাম, ঐ একটি দীর্ঘ সময়ে বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ কয়েকজন ছন্দোবিদ

www.pathagar.com

লেখকের রচনায় একটি তথ্য কেন অনুচ্চারিত থেকে যাবে? এটাই আমি প্রয়োজনীয় বিস্তারিত সাক্ষ্য-প্রমাণ সহযোগে উপস্থিত করেছি। কাদির শাহেব বাংলাদেশ পরিষদে গত ১১ই জ্যৈষ্ঠে তাঁর সভাপতির অভিভাষণে এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, নজরুল ইসলামের এই নতুন ছন্দ প্রবর্তন প্রসঙ্গে তিনি প্রবোধচন্দ্র সেনকে অনেকবারই চিঠি লিখেছেন, কিন্তু প্রবোধচন্দ্র সেন এ ব্যাপারে কেন-যেন সব সময়ই নীরব থেকেছেন। আমার মতে, তথ্যটি গুরুত্বহীন নয়। কাদির শাহেব তাঁর পত্রে এ কথার উল্লেখ করলে ভালো হতো। "ছন্দ-জিজ্ঞাসা" থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন প্রবোধ-বাবু 'বিদ্রোহী'র ছন্দকে 'মাত্রাবৃত্ত ছন্দে মুক্তবন্ধ কবিতার অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত' বলেছেন। প্রবোধবাবু নজরুল ইসলামের প্রসঙ্গ ছন্দের আলো-চনায় আরো অনেকবারই নিয়ে এসেছেন (আমি 'নজরুল ইসলামের ছন্দ-সমালোচনার ধারা' নামে একটি প্রবন্ধ লিখছি, তাতে এর বিস্তারিত পর্যা-লোচনা থাকছে); কিন্তু আমার মূল বক্তব্য তো ছিলো এটাই যে, প্রবোধবাবু 'বিদ্রোহী' মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রথম উদাহরণ, একথা বলেননি। 'অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত' এবং 'প্রথম দৃষ্টাও' এই কথা দুটির মধ্যে ব্যবধান অনেক।

মুজীবুল হক কবীর তাঁর আলোচনায় এমন কিছু কথা বলেছেন যা সত্যি হ'লে যুগান্তকারী বলেই বিবেচিত হতো। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, তার একেবারে গোড়াতেই গলদ রয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ' মুক্তক বটে কিন্তু মাত্রাবৃত্তই নয়—অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লেখা। সেই প্রথম পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ যুক্তবর্ণের মাত্রাবিতরণ নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। যুক্তবর্ণ বর্জিত হওয়ায় এবং অনেকখানি ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্তে পড়া যায় বলে, হঠাৎ মনে হতে পারে এ কবিতা ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত। কিন্তু একটি কবিতার সমস্তটা ভালো করে না-পড়ে বিচার করাতেই এতো বড়ো বিভ্রান্তি। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' থেকে দু-একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করি। এই অংশগুলি কোন্ ছন্দ?—

দূর দূর হতে ভেদিয়া আঁধার কারা
মাঝে মাঝে দেখা দেয় একটি সন্ধ্যার তারা।

কিংবা

প্রভাতেরে যেন লইতে কাড়িয়া
আকাশেরে যেন ফেলিতে ছিঁড়িয়া,

www.pathagar.com

উঠে শূন্য পানে—পড়ে আছাড়িয়া
করে শেষে হাহাকার
প্রাণের উল্লাসে ছুটিতে চায়
ভূধরের হিয়া টুটিতে চায়
আলিঙ্গন তরে উর্ধ্বে বাহু তুলি
আকাশের পানে উঠিতে চায়।

এই অংশগুলিই (বিশেষ করে যুক্তবর্ণসমেত শব্দগুলি—'সন্ধ্যায়,' 'শূন্যপানে', 'উল্লাসে', 'আলিঙ্গন', 'উর্ধ্বে') চিনিয়ে দ্যায় 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' মোটেই মুক্তক মাত্রাবৃত্তে নয়—বরং পরিষ্কার মুক্তক অক্ষরবৃত্তে লেখা।

দ্বিতীয় যে-কবিতাটির কথা বলেছেন কবীর, "মানসী"র 'ভালো করে বলে যাও', সেটা মাত্রাবৃত্তে লেখা বটে কিন্তু মুক্তক নয়। মুক্তক মানে আর যাই হোক ছাঁচে-ঢালা নয়, 'পঙক্তির অসমতা' এবং 'প্রবহমানতা'র কথা তো কবীরই বলেছেন। কিন্তু ভুল করেছেন সেখানেই, যখন তিনি দেখলেন না স্তবকগুলির চেহারা। সেগুলি একটি আর-একটির একেবারে অনুরূপ। মুক্তক মানে পঙক্তির অসমতা নয় শুধু, স্তবকেরও স্বাধীন বিন্যাস। এই কবিতার প্রথম স্তবকটি এরকম—

ওগো ভালো করে বলে যাও।
বাঁশরি বাজায়ে যে-কথা জানাতে
সে কথা বুঝায়ে দাও।
যদি না বলিবে কিছু, তবে কেন এসে
মুখপানে শুধু চাও।

পরের ছ'টি স্তবক পর্বে, অতিপর্বে, পঙক্তিসংখ্যায় এর একেবারে অনুরূপ। পঙক্তিশেষে সুনির্দিষ্ট যতি (এবং তা প্রতি স্তবকে) একে প্রবহমান হতে দ্যায়নি, যে-প্রবহমানতা মুক্তকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই কবিতার সাতটি স্তবকে যে-সমমাপ সুসামঞ্জস্য তা-ও মুক্তকের একেবারে বিপরীত।

কবীরের একথা ঠিকই যে, মুক্তক অক্ষরবৃত্তের সূচনা শুধু গৈরিশ ছন্দে নয়, আরো অনেকের মধ্যে দেখা দিয়েছিলো। কারো-কারো কথা তিনি বলেছেন, আরো কারো-কারো উল্লেখ সম্ভব। কিন্তু রামাই পণ্ডিতের "শূন্য পুরাণ" থেকে তিনি তথা কাদির শাহেব যে-পঙক্তিগুলো উদ্ধৃত করেছেন, তা অসমপঙক্তিক ঠিক কিন্তু প্রবহমান নয়। বস্তুত 'আদিরূপ', 'আভাস'

www.pathagar.com

(এসব শব্দ কবীর একটু-বেশি ব্যবহার করেছেন) অনেক কিছুতেই পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু নতুন ছন্দপ্রবর্তকের সম্মান আমরা তাঁকেই দিই, যিনি পূর্ণতা দেন :—যেমন বলি স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ, মুক্তছন্দ (অবশ্যই বাংলায়) কবিতার প্রবর্তক অমিয় চক্রবর্তী, মুক্তক মাত্রাবৃত্তের প্রবর্তক নজরুল ইসলাম।

এই বলে কবীর তাঁর আলোচনা শেষ করেছেন, 'নজরুলের ছন্দকে তিনি [শঙ্খ ঘোষ] এড়িয়ে গিয়েছেন সত্যি, কিন্তু তাঁর কবিব্যক্তিত্বের সঙ্গে নজরুলের ছন্দের যথাযথ যোগাযোগ ঘটেনি একথা সহজে যুক্তিপ্রমাণ ব্যতিরেকে কেউ মেনে নেবেন না।' যে-কোনো আলোচনায় প্রাসঙ্গিক থাকা দরকার। কবীর এই অপ্রাসঙ্গিক বিষয় তুলতে গেলেন কেন? শঙ্খ ঘোষের নজরুলের ছন্দ বিষয়ক নীরবতা কিংবা অ-নীরবতা আমাদের আলোচ্য হতে পারে ; কিন্তু শঙ্খ ঘোষের কবি-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে নজরুলের ছন্দের যোগাযোগের প্রসঙ্গ উঠছে কেন? শঙ্খ ঘোষের কবিতা তো আমার প্রবন্ধের একেবারে বাইরের বিষয়। সুতরাং সে-বিষয়ে যুক্তিপ্রমাণ দেবার কথাই ওঠে না।

কবীরের জন্যে যদিও আমাকে একটু পরিশ্রম করতে হলো, কিন্তু তার ছন্দসন্ধিৎসায় আমি খুশি হয়েছি।

কারো-কারো ভুল বুঝবার আশঙ্কা থাকতে পারে বলে আর-একটি অনুচ্ছেদ যোগ করি এখানে।—আমাদের বহু ভাগ্য যে, বাংলা ছন্দের দুই প্রধান ব্যক্তিত্ব—প্রবোধচন্দ্র সেন এবং আবদুল কাদির—আজো আমাদের মধ্যে জীবিত আছেন। প্রবোধচন্দ্র সেন আশি ছাড়িয়েছেন, কাদির শাহেব সত্তর বছর। আমি ব্যক্তিগতভাবে দুজনের কাছেই ঋণী ও কৃতজ্ঞ। জগদীশ ঘোষের "বাংলা ব্যাকরণে" প্রবোধ সেন লিখিত ছন্দালোচনা থেকে আমি ছন্দ শিখেছিলাম। তাঁর "ছন্দ-পরিক্রমা"-র মতো বইএ (দ্বিতীয় সংস্করণ) আমার উল্লেখ করে তিনি আমাকে চিরদিনের জন্যে কৃতজ্ঞ করেছেন। আর কাদির শাহেবের ব্যক্তিগত স্নেহ ও উৎসাহ আমি সবসময় পাই। তিনিও তাঁর আশু-প্রকাশিতব্য "ছন্দ-সমীক্ষণে" আমার কথা বলেছেন। এঁদের দুজনের (এবং আরো অনেকের) কাছেই আমি শিখেছি, জ্ঞানের আলোচনায় সত্য উচ্চারণের সাহস।

১ জুলাই ১৯৮৯

www.pathagar.com

জগদীশ গুপ্তের গল্প 'প্রলয়ংকরী ষষ্ঠী'

জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) আধুনিক ছোটোগল্পের জনক। এই উক্তিতে অনেকেই হয়তো অবাক হবেন। অবাক হওয়ার কারণ, বাংলা সমালোচনার প্রথানুগত্য। এখানে সাধারণত সাহস করে সত্য উচ্চারণ করা হয় না। আর বাঙালি সমালোচকদের প্রিয় প্রসঙ্গ কবিতা। কথা-সাহিত্য যে-পরিমাণ জনপ্রিয়, সেই পরিমাণে সমালোচক-পরিত্যক্ত। আর একটি কারণ বাঙালি কথাসাহিত্যিকদের চরিত্রেই নিহিত : কবিরা যেমন কবিতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ---অন্তত পক্ষে মন্তব্য---করে থাকেন, বাঙালি কথা-সাহিত্যিকরা তেমন করেন না সাধারণত। বঙ্কিমচন্দ্র বা অন্নদাশংকর সেদিক থেকে ব্যতিক্রম। তিরিশের প্রধান পাঁচ কবি কবিতা-সমালোচনাতেও কুশলী; কিন্তু তিরিশের প্রধান তিন ঔপন্যাসিক—তারাশংকর, মানিক ও বিভূতিভূষণ—উপন্যাস সম্পর্কে তাঁদের কোনো সুগভীর বিবেচনা উপস্থিত করেননি। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে মোটামুটি এই অবস্থাই বহাল আছে। অ-কথাশিল্পী সমালোচকদের কারো-কারো পাঠের ব্যাপ্তি ও বোধের গভীরতা বিপুল হলেও, যিনি স্বয়ং গল্প বা উপন্যাস রচনায় নিরত, তাঁর বিশ্লেষণে থাকে অভিজ্ঞতার মুদ্রণ। ঐ অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ মতামত ও বিশ্লেষণ ছোটো গল্পের ক্ষেত্রে এতাবৎকালে একজনের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি—তিনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, উপন্যাস ও ছোটোগল্প সম্পূর্ণ বিভিন্ন দু'টি শিল্পমাধ্যম হিশাবে স্বীকৃতি পেলেও, উপন্যাস যতোখানি আলোচিত হয় ছোটোগল্প তার শিকির শিকিও হয় না। উত্তররৈবিক কবিতা বা উপ-ন্যাস যতোখানি বিশ্লেষিত হয়েছে, ছোটোগল্প ততোখানি হয়নি। তাই আজ এই সত্য উচ্চারণ জরুরি হয়ে পড়েছে যে, জগদীশ গুপ্ত আধুনিক বাংলা ছোটোগল্পের জনকের ভূমিকা পালন করেছেন।

এই অনুচ্চারণের জন্যে অংশত দায়ী জগদীশ গুপ্তের আচ্ছাদিতপ্রায় ব্যক্তিজীবন। কোনো বর্ণাঢ্যতা বা নাটকীয়তা ছিলো না সেখানে। যে-বোলপুরে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসংস্কৃতির একটি মিলনকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন, সেখানেই জগদীশ গুপ্ত থাকতেন প্রায় অজ্ঞাতবাসে,বোলপুর চৌকি আদাল-

www.pathagar.com

তের নগণ্য টাইপিস্ট। বিভিন্ন আদালতের টাইপিস্ট হিশাবেই তাঁর জীবন কেটেছে। মোটামুটি দীর্ঘজীবী হলেও (সত্তর বছর বয়সের বেশি বেঁচে-ছিলেন), অনেকগুলো গল্প-উপন্যাস-নাটক লিখলেও, জীবদ্দশায় রবীন্দ্রনাথ-মোহিতলালের প্রশংসা অর্জন করলেও, ব্যাপক পরিচিতি বা জনপ্রিয়তা পাননি। অচিন্ত্যকুমার, শৈলজানন্দ, প্রবোধ সান্যাল বা অন্য কল্লোলীয়রা যে-খ্যাতি পেয়েছেন, জগদীশ গুপ্ত তা পাননি। তাঁর বইগুলোও সবসময় এক নামে প্রকাশিত হয়নি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ভাষায়, জগদীশ গুপ্ত নিজেও যে-অভিধা আত্মবিদ্রূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তিনি 'অনুপস্থিত' লেখক। কিন্তু এও সত্য, দারিদ্র্য খ্যাতিহীনতা সন্তানহীনতা সত্ত্বেও তিনি নিঃশব্দে সাহিত্যসাধনা করে গেছেন।

'কল্লোল'-'কালি-কলমে' যে-উত্তররাবীন্দ্রিক সাহিত্যধারা সূচিত হয়েছিলো জগদীশ গুপ্ত ছিলেন তারই ধারক, গোষ্ঠীচিহ্ন তাঁর রচনাবলিতে অমোঘভাবে মুদ্রিত হয়ে আছে। সুবীর রায়চৌধুরী, যিনি জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে অনেকদিন থেকে উৎসাহী ও সকর্মক, লিখেছেন, '.....মনে রাখা দরকার যে জগদীশ গুপ্ত 'কল্লোল', বিশেষ করে 'কালি-কলম' পত্রিকার নিয়মিত লেখক হওয়া সত্ত্বেও তিনি ঠিক কল্লোল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন।' ("জগদীশ গুপ্তের গল্প", ১৯৮৩) এই উক্তি বিশ্লেষী নয়— আরোপিত। কল্লোলীয়দের প্রত্যেকের সাফল্য-বৈফল্য একরকম নয় (জগদীশ গুপ্তেরও বৈফল্য আছে); কিন্তু তাহলেও, 'কল্লোল' গোষ্ঠী যে-কাজটি করেছিলো তা হচ্ছে—উত্তর-রাবীন্দ্রিক আধুনিকতা সঞ্চারের প্রয়োজনীয়তা সে বুঝেছিলো এবং তার জন্যে উদ্যম গ্রহণ করেছিলো। অনেকের সঙ্গে জগদীশ গুপ্তও তার অংশভাক। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর প্রতিভাবান কারো-কারো মতো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জগদীশ গুপ্তেরও একটি দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিলো।

জগদীশ গুপ্তের "লঘু-গুরু" (১৯৩১) উপন্যাসের দীর্ঘ অনুপুঙ্খ রিভিয়্যু লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ('পরিচয়', কার্তিক ১৩৩৮)। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাটি ছিলো তীব্র, তিক্ত, কিন্তু সৎ। রবীন্দ্রনাথ বলছেন,'.... একথা মানতে হবে রচনানৈপুণ্য লেখকের আছে। আধুনিক আসরে রিয়ালিজমের পালা সস্তায় জমাবার প্রলোভন যদি তাঁকে পেয়ে বসে, তবে তাঁর ক্ষতি হবে।' এবং 'এই উপাখ্যানের বিষয়টি সামাজিক কলুষঘটিত বটে তবুও কলুষ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার উৎসাহ এর মধ্যে নেই। পূর্বেই বলেছি যে, গল্পের চেহারাটি নিঃসন্দিগ্ধ সত্যের মতো দেখাচ্ছে না, এইটেতেই আমার

www.pathagar.com

আপত্তি।' জগদীশ গুপ্ত রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার জবাব দেন তাঁর "উদয়-লেখা" (১৯৩৩) গল্পগ্রন্থের মুখবন্ধে। তিনি বলেন, "লঘু-গুরু" গল্প সম্বন্ধে জজিয়তি করিতে বসিয়া বিভিন্ন জনগণ যে রায় দিয়াছেন, তাহার মধ্যে পরিচয়ে প্রকাশিত রায়টিই প্রধান --কারণ, তাহার ঘোষক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ; এবং দ্বিতীয় কারণ, বিচার্য বিষয় ছাড়িয়া তাহা বিপথগামী হইয়াছে, অর্থাৎ আসামীকে ত্যাগ করিয়া তাহা আসামীর নির্দোষ জনককে আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু আপীল নাই।' এবং'··আমার আপত্তি এই যে, পুস্তকের পরিচয় দিতে বসিয়া লেখকের জীবন কথা না তুলিলেই ভাল হইত, কারণ উহা সমালোচকের 'অবশ্য দায়িত্বের বাইরে' এবং তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ ছিল না।'

২

জগদীশ গুপ্তের 'প্রলয়ংকরী ষষ্ঠী' গল্পটি তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ "বিনোদিনী" (১৯২৭) গ্রন্থভুক্ত। জগদীশ গুপ্তকে বলেছি আধুনিক ছোটোগল্পের জনক। "বিনোদিনী"ই প্রথম আধুনিক গল্পগ্রন্থ--এখন একথা বলতে চাই। "বিনোদিনী" বইটির আকৃতি যেমন ছিলো গড়পড়তা বই থেকে আলাদা, তেম্নি তার প্রকৃতিও ছিলো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই বইয়ের আটটি গল্পই রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের জগৎ থেকে এক ভিন্ন পৃথিবীর নির্মাণ করেছিলো। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-প্রভাতকুমারের স্নিগ্ধ-মধুর জগৎ থেকে আমরা যে বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করেছি, এই গল্পগুলোতেই রয়েছে তার সাক্ষ্য। সকালবেলা উঠে একটি বালক ঘোষণা করে আজ তাকে কুমীরে নেবে, সন্ধেবেলা ঠিক তাই-ই হয়। ('দিবসের শেষে') দীর্ঘ দিনের পুরাতন ভৃত্য, মালিক যাকে রাস্তা থেকে তুলে এনে একদিন জীবন দান করেছিলেন, সে সুযোগ পেয়েই মনিবকে হত্যার চেষ্টায় প্রচণ্ড আহত করে টাকা নিয়ে পালায়। ('পুরাতন ভৃত্য') সম্পত্তি ও অর্থের লোভে কবিরাজ কৃষ্ণকান্ত একের পর এক তার পুত্রবধূকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে যায়। ('পয়োমুখম') —প্রত্যেকটি গল্পই এরকম। রবীন্দ্রনাথ "বিনোদিনী" বইয়ে দেখেছিলেন 'নূতন রূপ ও রস', সুকুমার সেনের মনে হয়েছে 'অভিনব'।

'প্রলয়ংকরী ষষ্ঠী' গল্পের সারাংশ এরকম:

সদু খাঁ খুব ছোটো থেকে বড়ো হয়েছে। দেখতে যেমন সে ভয়ংকর, তার প্রকৃতিও তেমনি। আর্থিক অবস্থা ফেরার পরও তার স্বভাব বদলায়নি, বরং আরো ভয়ংকর হয়েছে। দোতলা দালান, বহুবিবাহ, বিবাহ-ব্যতিরেকে

www.pathagar.com

দাসী-বাঁদীকে যথেচ্ছ ব্যবহার, গ্রামে সদু খাঁ-র বিরাট দাপট। একবার ব্যবসা-উপলক্ষেই কালিগঞ্জের ঘাটে স্নানরতা এক তরুণী বধূকে দেখে তার পছন্দ হয়ে যায়। ঐ বধু ঠিক যেন তার মৃত সহোদরার মতো, এরকম ভান করে সদু খাঁ তরুণী বধূর স্বামী জসিম ও তার পরিবারের অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক পাতায়। প্রচুর উপঢৌকন পাঠিয়ে ঐ দরিদ্র কৃষকদের হৃদয় জয় করে নেয়। তারপর একদিন সদু খাঁর বাড়িতে একটি মিথ্যা বিবাহের আয়োজন করে ঐ তরুণী বধূকে আনিয়ে নেয়। আর ফেরত পাঠায় না। তরুণী বধূর স্বামী জসিম বৌকে ফেরত নিতে এসে অপমানিত হয়ে ফিরে যায়। বৌকে ফিরে পাবার জন্য গ্রামের অর্জুন লেঠেলদের নিয়ে একটি মারামারির ব্যবস্থা হয়। দুশো জনের বিরুদ্ধে মাত্র বাইশ জন নিয়ে লড়াই করেও জিতে যায় অর্জুনরা। কিন্তু তারপরও 'জসিম তার বৌকে ফিরিয়া পায় নাই।' কেন? না, 'বৌ নিজেই আসিতে চায় নাই।'

আশ্চর্য গল্প। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-প্রভাতকুমারের পাঠক বলে উঠবেন, 'আশ্চর্য!' বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা গল্পউপন্যাসে সমাজের প্রতাপ প্রবল। তিরিশের তথা কল্লোলের লেখকদের প্রধান দান ব্যক্তিকে মূল্য দান করায়। ব্যক্তিও সমাজবিবিক্ত নয়। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের প্রতিমুহূর্তে দ্বন্দ্বসমাস চলছে। তিরিশের কথাশিল্পীদের প্রধান দান এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়ায়। জগদীশ গুপ্ত কথাসাহিত্যে যে-বিজয় সম্পন্ন করেছিলেন তা যে কোনো অসচেতন চর্যা ছিলো না, তার প্রমাণ দেবে বুদ্ধদেব বসুর ধারণাকে নস্যাৎ করে তাঁর নিজের সুচিন্তিত বিবেচনা :

> বুদ্ধদেব বসু মহাশয় কল্লোলে লিখিয়াছেন যে বাংলাদেশে কবির উৎপত্তি এবং উন্নতি যতটা সহজ, বিষয়বস্তুর অভাবেই গল্প-লেখকের ততটা উন্নতি দূরে থাক, গতিই সহজ নহে। শুধু গল্প লিখিবার বিষয় সৃষ্টির জন্যই তিনি সামাজিক ব্যবস্থা উল্টাইয়া দিতে চান।
>
> কিন্তু আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মনে হয়, শুধু মাত্র সামাজিক বা সাংসারিক ঘটনা লইয়া গল্প লিখিবার রেওয়াজ যখন ছিল তখন একথা বলা চলিত। কিন্তু এখন সে কায়দা ত নাই। ····উন্মুখ প্রবৃত্তি লইয়াই এবং মনোভাবের বিশ্লেষণ করিয়াই এখন গল্প লেখা চলিত হইয়াছে। কাজেই মানুষের বিভিন্ন প্রবৃত্তির সঙ্গে যার যত পরিচয় বা সে বিষয়ে যার যত অন্তর্দৃষ্টি তার গল্প তত বিচিত্র হইবে।
>
> [মুরলীধর বসুকে লেখা চিঠি। বোলপুর। ১৬-৯-২৭]

www.pathagar.com

'উন্মুখ প্রবৃত্তি' এবং 'মনোভাবের বিশ্লেষণ' জগদীশ গুপ্তের অসংখ্য গল্পে এবং 'প্রলয়ংকরী ষষ্ঠী'তেও আছে। তাঁর জীবনপ্রত্যয় ও রচনারীতি দুইই রুক্ষ, বক্র, সর্পিল ও জটিল। (আমার মনে আছে, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাপাঠে আমি যেমন প্রথমবার প্রতিহত হয়েছিলাম, তেমনি রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র-স্নাত আমার পাঠাভ্যাস প্রথমবার ভীষণভাবে আহত হয়েছিলো জগদীশ গুপ্তের রচনায়। দুই ক্ষেত্রেই আমি শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছি, এবং সে-জয় অপুরস্কৃত থাকেনি।) ছোটোগল্প অনেকখানি কবিতার সঙ্গে মেলে, তবে উভয়ের বৈযুজ্যও বিশাল। কবিতার কেন্দ্রাশ্রয় শব্দ, গল্পের বাক্য। ছোটো গল্পের সঙ্গে উপন্যাসের পার্থক্য এই যে, গল্প প্রতি মুহূর্তে দ্বিতীয়ার্থ রচনা করে চলে, উপন্যাস তা করে না। এবং এদিক থেকেই কবিতার সঙ্গে গল্পের সাযুজ্য। বহু সফল ছোটোগল্পের মতো প্রথম বাক্যেই 'প্রলয়ংকরী ষষ্ঠী'র গল্প শুরু হয়ে যায়। প্রথম বাক্য থেকে শেষ বাক্য পর্যন্ত গল্পটি আঁট করে বাঁধা। সদু খাঁ-র যে-দাপটে গল্পের সূচনা হয়, প্রতিটি বাক্যে ও পদ-ক্ষেপে তা অব্যাহত থাকে। এমনকি শেষ বাক্য পর্যন্ত অব্যাহত থেকেও এ একটি চমক সৃষ্টি করে। দুর্জ্ঞেয় নিয়তি জগদীশ গুপ্তের 'দিবসের শেষে' গল্পের নিয়ামক; এ গল্পেরও কি তা নয়? সদু খাঁ-র বিজয় সর্ব-ক্ষেত্রেই সাধিত হয়েছে—ছলে, বলে, কৌশলে। এমনকি তার দল যখন পরাজিত হলো, তার পরেও সে হলো বিজয়ী। কেননা জসিমের বৌ স্বেচ্ছায় তার কাছে থেকে গেলো, জসিমের কাছে ফিরে এলো না। জসিমের বৌ এই গল্পে সবসময়েই পরোক্ষে থেকেছে। কিন্তু সে-ই সদু খাঁর চরিত্রকে, তার বাধাহীন জয়যাত্রাকে চিহ্নিত করেছে।

গল্পের ভাষা সাধু, শরৎচন্দ্র-প্রতিম সরল, কিন্তু তার মধ্যেই মিশেছে জগদীশ গুপ্তের স্বকীয় বক্র চাল। ডট-ড্যাশ বহুল কল্লোলী মুদ্রাদোষও আছে। গ্রামের পটভূমিতে রচিত; কিন্তু গ্রামীণ বা চলতি শব্দ (আড়ে-দীঘে, গাওয়াল, পালোয়ারী, পড়তা, গেরাজি, দেখিয়ে, সাপাট) এমন অনায়াসে মিশে আছে যে তাদের আলাদা করে চিহ্নিত করাই মুশকিল। ছোটো গল্পে দীর্ঘ বর্ণনার অবকাশ নেই। একটিমাত্র বাক্যে অর্জুনদের লাঠি-যুদ্ধের বর্ণনা অপরূপ: 'মারামারি যখন থামিল, তখন সেই বাইশ জনেরই মনে হইল, কতকাল পরে তারা যেন মাটিতে ফিরিয়াছে।' গল্পের উপসংহার একই সঙ্গে বিস্ময়কর অথচ স্বাভাবিক। দুটি মাত্র ক্ষুদ্র বাক্য: 'জসিম তার বৌকে ফিরিয়ে পায় নাই। বৌ নিজেই আসিতে চায় নাই।' জীবন-প্রত্যয়ে জগদীশ গুপ্ত গদ্যের সুধীন্দ্রনাথ।

১০ মার্চ ১৯৮৮

www.pathagar.com

আ লো চ না
সুশান্ত মজুমদার

গত সপ্তাহের 'সংবাদ সাময়িকী'তে আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর লেখা 'দারুণ মাস্তুলের কর্ণধার : জগদীশ গুপ্তের প্রলয়ংকরী ষষ্ঠী' পাঠ করেছি। জগদীশ গুপ্তের সাহিত্য নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচিত বক্তব্য, "লঘু-গুরু" নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা ও জগদীশ গুপ্তের জবাবসহ পুরানো কথাই আবদুল মান্নান সৈয়দ নতুন করে লিখেছেন। তবু প্রাপ্য আলোচনা থেকে বঞ্চিত এবং বাংলা কথাসাহিত্যের বেশির ভাগ পাঠকের কাছে অপরিচিত জগদীশ গুপ্তকে নিয়ে নতুন আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে লেখাটির গুরুত্ব আছে।

কিন্তু, 'জগদীশ গুপ্ত আধুনিক ছোটোগল্পের জনক'—আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর এই অভিমতের সঙ্গে কথাসাহিত্যিক বা সাহিত্য-সমালোচকের ভিন্নমত থাকতে পারে। কেন জগদীশ গুপ্ত জনকত্ব গৌরবের প্রাপক—এ সম্পর্কে আবদুল মান্নান সৈয়দ বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরেননি, শুধমাত্র মন্তব্য করেছেন। উত্তর-রাবীন্দ্রিক আধুনিকতা সঞ্চারের উদ্যম গ্রহণে জগদীশ গুপ্তের অংশভাক, কথাসাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজ দ্বন্দ্বকে গুরুত্ব দান এবং 'উন্মুখ প্রবৃত্তি' ও 'মনোভাবের বিশ্লেষণ' আবদুল মান্নান সৈয়দ দুই-এক লাইনে উল্লেখ করেছেন, অথচ ব্যাখ্যা করেননি। সম্ভবত লেখাটি কলেবরে ছোট হওয়ায় বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ ছিল না। আমরা তাঁর কাছ থেকে বরং বিশদ আলোচনা প্রত্যাশা করতে পারি। কিন্তু বাঙালি কথাসাহিত্যিকরা কথাসাহিত্য নিয়ে বিশ্লেষণ, অন্তত মন্তব্যও করেন না, মোটামুটি এই অবস্থা বহাল আছে, এবং 'অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ' মতামত ও বিশ্লেষণ ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এতাবৎকালে একজনের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি—তিনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর এই বক্তব্যকে সমর্থন করা যায় না।

তারাশংকর, মানিক ও বিভূতিভূষণ উপন্যাস সম্পর্কে সুগভীর বিশদ বিবেচনা উপস্থিত করেননি বলে কথাসাহিত্যে ওই অবস্থা বহাল থাকবে এটা কোনো যুক্তির নয়। কথাসাহিত্যিকরা উপন্যাস ছোটগল্প নিয়ে তাঁদের মতামত উপস্থিত করেছেন, সমসাময়িক বা অনুজ লেখকদের

www.pathagar.com

লেখা নিয়েও আলোচনা করেছেন এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়াও ছোট গল্পের ক্রমবিকাশ ও মেজাজ নিয়ে বিশ্লেষণ পাওয়া গেছে এমন উদাহরণ আছে কয়েক ডজন। আবদুল মান্নান সৈয়দ—'এতাবৎকাল' বলে প্রবহমান বর্তমানকে নির্দিষ্ট করে এবং 'একজনের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি' বলে 'আমরা' শব্দে বহুজনকে শরিক করেছেন তাঁর নিজের অভিমত গ্রাহ্য করে নিতে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগল্প নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী লেখা লিখেছেন ঠিকই এবং ২৯ বছর আগে প্রকাশিত তার "সাহিত্যে ছোটগল্প" গ্রন্থটি আজো পাঠযোগ্যতার দাবীও রাখে। কিন্তু সাহিত্যের কনিষ্ঠ সন্তান ছোটগল্প কি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে? ত্রিশের ৩ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর ছোটগল্পে বিষয় ও প্রকরণ বিভিন্ন লেখকদের হাতে নতুন মাত্রা পেয়েছে। সময়ের সাথে ছোটগল্পের জন্য রচিত হয়েছে নতুন প্রেক্ষিত—গত হয়েছে 'কল্লোল' ও 'কালি-কলম' যুগের সাহিত্য আন্দোলন। আজ ছোটগল্প যেমন গতি-প্রকৃতি বদলাচ্ছে, তেমনি ছোটগল্প নিয়ে মতামত ও বিশ্লেষণ আগের মতামতের সাথে ঐক্য রক্ষা করতে পারছে না। এদেশের অন্যতম বয়োজ্যেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক সৈয়দ শামসুল হক ছোটগল্পের নিঃশব্দ মৃত্যু হয়েছে বলে তাঁর মতামত জানিয়েছেন। তাঁর এই বক্তব্যের সাথে ভিন্নমত পোষণ করলেও এটা ঠিক যে ছোটগল্প নিয়ে লেখকপাঠক উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি নড়ে-চড়ে গেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প আর আজকের ছোটগল্পের চারিত্র্যের মধ্যে ব্যবধানও কম নয়। ত্রিশের ৩ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাঁরা লিখেছেন তাঁরা তাঁদের মতো করে লিখেছেন। তারপরে যাঁরা লিখেছেন তাঁরা তাঁদের মতো করে লিখেছেন। বিভিন্ন সময়ের ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ, নতুন চাল-চলন নিয়ে নতুন বিশ্লেষণ 'এতাবৎকালে' নায়ায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ওই 'প্রাজ্ঞ মতামতের' সাথে কি মিলবে? নিশ্চয় না। আবদুল মান্নান সৈয়দ 'এতাবৎকালে একজনের বলে' ছোটগল্পের আর সব বিশ্লেষণ কার্যত অস্বীকার করেছেন।

হাসান আজিজুল হক তাঁর "কথাসাহিত্যের কথকতা" গ্রন্থে 'দুই যুগের দেশ মানুষের কথা', 'দুষ্পাঠ্য করেরেখা,' 'এক ও দুই' এই ৩টি প্রবন্ধের অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিভাগোত্তর ছোটগল্প নিয়ে তাঁর আলোচনাকে স্থান দিয়েছেন। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে '৪৭ পরবর্তী কথাসাহিত্য নিয়ে তার যে যুক্তিশাণিত মতামত, ছোটগল্পের সংকট ও

www.pathagar.com

সম্ভাবনা নিয়ে তার যে স্পষ্ট বক্তব্য তা এখন পর্যন্ত আয়ুষ্মান। '৮৬ সালের শেষের দিকে সৈয়দ শামসুল হক সাপ্তাহিক বিচিত্রায় লেখা শুরু করেছিলেন 'মাজিনে মন্তব্য' কলাম। তাঁর লেখাগুলো গ্রন্থাকারে বের হলে অনেক প্রাজ্ঞ মতামত পাঠকরা দুই মলাটের মধ্যে আবিষ্কার করতে পারতেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের জায়গা কোথায়, উপন্যাস লেখকের ভূমিকা কি এবং খোলামেলা ধুলো-কাদা মাখা ও মানুষ ভর্তি জায়গা বিচরণের ক্ষেত্রে সুবিধা, শিল্প হিসেবে উপন্যাসের যে মহনীয়তা শওকত আলী তাঁর একাধিক প্রবন্ধে বলেছেন। তাঁর এই সব লেখায় উপন্যাসের আবশ্যিক শর্তাবলী নিয়ে যে আলোচনা আছে লেখকদেরও কাছে আগ্রহের কারণ হয়ে ওঠে। 'উপন্যাসের সমাজবাস্তবতা' শিরোনামের দীর্ঘ প্রবন্ধে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কথাসাহিত্য চর্চার সূত্রপাত, কথা-সাহিত্যে ব্যক্তির মুক্তি প্রয়াস বিশ্লেষণ করে বাংলা কথা-সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য নিয়ে যে যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন তা নতুন ভাবনার যোগান দেয়। উপন্যাস আমাদের সামনে এক বিরাট দিগন্ত খুলে দিয়েছে, মানুষের অস্তিত্বের বিভিন্ন ব্যঞ্জনাময় উপলব্ধির চাবি তুলে দিয়েছে—অসীম রায়ের এ সম্পর্কিত নতুন বিশ্লেষণ বেশ গভীর। রাজনৈতিক কথা-সাহিত্য প্রসঙ্গে দেবেশ রায় বিশ্লেষণ করে বুঝিয়েছেন, লেখকদের জন্য স্বায়ত্তশাসন কতখানি জরুরী।

বাঙালি কথা-সাহিত্যিকরা অন্য কথা-সাহিত্যিকদের সাহিত্যকৃতি নিয়ে বিশ্লেষণ ও মন্তব্য অনেক করেছেন—যে কাজ কবিতায় করেছেন বুদ্ধদেব বসু। প্রশ্ন হতে পারে, কথা-সাহিত্যিকরা সহযাত্রী লেখকদের লেখা নিয়ে লেখা লিখলেও নিজেরা কতখানি মৌলিক মতামত রেখেছেন? কথা-সাহিত্য নিয়ে লেখালেখির অর্থ যদি নিজেদের সাহিত্য প্রসঙ্গে আলোচনা না বুঝায় তবে বাংলা কথা-সাহিত্য এ ব্যাপারে ভাগ্যবান যে আমাদের প্রধান কথা সাহিত্যিকরা আত্মপ্রচারমূলক কোনো লেখা লেখেননি। একথা তো অস্বীকার করা যায় না, কথাসাহিত্যিকদের লেখা নিয়ে আরেকজন কথা-সাহিত্যিকের যে আলোচনা তার মধ্যে গল্প-উপন্যাস নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, ভাবনাই প্রকাশিত হয়েছে যা কথা-সাহিত্যেরই বিষয় হওয়ার মতো মর্যাদা রাখে। তারাশংকর, মানিক, বিভূতিভূষণ করেননি বলে সেই অবস্থা যে বহাল নেই এর সমর্থনে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের, বিশেষত বিভাগোত্তর কথাসাহিত্য যার হাত ধরে আধুনিক হয়ে ওঠে সেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র সাহিত্য নিয়ে তাঁর সমসাময়িক কথা সাহিত্যিক ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু শওকত ওসমানের লেখা 'দুই লোকের যাত্রী' (গ্রন্থ: "সমুদ্র নদীসমর্পিত") প্রকাশিত হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায়। স্বয়ং আবদুল মান্নান সৈয়দ কথাসাহিত্য নিয়ে একাধিক লেখা লিখেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পুতুলনাচের ইতিকথা" ছাড়াও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যের ওপর তাঁর উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ রয়েছে, যদি না কথাসাহিত্যিক হিসেবে নিজের কৃতি তিনি অস্বীকার করেন। রশীদ করীম অন্য কথা-সাহিত্যিকদের গ্রন্থ নিয়ে মাসিক সাহিত্যপত্র 'দীপঙ্কর'-এ লিখেছেন 'পাঠ করে প্রীত হলাম।' হাসান আজিজুল হকের 'কথাসাহিত্যের কথকতা' গ্রন্থে রয়েছে 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিষবৃক্ষ' লেখাটি। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস লিখেছেন কায়েস আহমেদ-এর উপন্যাস নিয়ে 'জতুগৃহে দিনযাপন।' পশ্চিম বাংলার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কমলকুমার মজুমদারকে নিয়ে, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্প নিয়ে এবং সুবিমল মিশ্র অমিয়ভূষণ মজুমদারের সাহিত্য নিয়ে লিখেছেন। প্রয়াত অসীম রায়ের অপ্রকাশিত জার্নাল শারদীয় প্রতিক্ষণ-এ প্রকাশিত হলে জানা যায় সাহিত্য নিয়ে তাঁর মনোভাব ও তাঁর সমসাময়িক কথাসাহিত্যিকদের নিয়ে মন্তব্য। এইসব লেখকদের লেখায় অনায়াসে পাওয়া যায় উপন্যাস ও ছোটগল্প নিয়ে প্রাজ্ঞ ধারণা, চরিত্রের অন্তর্লীন দ্বন্দ্ব প্রকাশে বাণীশিল্পের গ্রহণ-বর্জনের ক্ষমতা কতখানি, অন্তর ও বাহিরের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষার উপায়, ব্যক্তির স্বরূপ সন্ধান, কিছু বানিয়ে বলা কতখানি যুক্তিগ্রাহ্য, শুধু স্থির চিত্র নয় ভেতরকার স্পন্দন ধরতে সমাজ বাস্তবতা গ্রহণ এবং গল্প-উপন্যাসের বিষয়বস্তু, আঙ্গিক ও ভাষা নিয়ে নানারকম মতামত। কথা-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা, মন্তব্য না করা বাঙালি কথাসাহিত্যি-কের চরিত্রেই নিহিত—আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর এই মন্তব্য কি এর পরেও মেনে নেয়া যায়?

১৭ মার্চ ১৯৮৮

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান সৈয়দ

প্রিয় সাহিত্য-সম্পাদক,

আপনার 'সংবাদ সাময়িকী'র পৃষ্ঠায় 'দারুণ মাস্তুলের কর্ণধার' শীর্ষে এক-একটি বাংলা ছোটোগল্প ধরে-ধরে যে-নিবিড় পাঠের আলোচনা শুরু করেছি, তার প্রথমটি ছিলো জগদীশ গুপ্তের 'প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠী' গল্প নিয়ে। ১০ই মার্চে প্রকাশিত হয়েছে আমার লেখাটি। ১৭ই মার্চে সুশান্ত মজুমদার তাঁর যে-প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, সে-সম্পর্কে আমার বক্তব্য এরকম। বক্তব্য আবার সংক্ষিপ্ত ও ইঙ্গিতধর্মী হবে। আপাতত আমি নাচার।

সুশান্ত মজুমদারের প্রতিবাদী পয়েন্ট আসলে দু'টি। তাঁর লেখা থেকেই উদ্ধৃত করছি :

ক। জগদীশ গুপ্ত আধুনিক ছোটোগল্পের জনক—আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর এই অভিমতের সঙ্গে কথাসাহিত্যিক বা সাহিত্য-সমালোচকের ভিন্ন মত থাকতে পারে।

খ। বাঙালি কথাসাহিত্যিকরা কথাসাহিত্য নিয়ে বিশ্লেষণ অন্তত মন্তব্যও করেন না, মোটামুটি এই অবস্থা বহাল আছে এবং অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ মতামত ও বিশ্লেষণ ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে এতাবৎকালে একজনের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি—তিনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর এই বক্তব্যকে সমর্থন করা যায় না।

এ বিষয়ে আমার বক্তব্য নিম্নরূপ :

ক। জগদীশ গুপ্তের আগে, সমকালে ও পরে কয়েকজন অসাধারণ বাঙালি গল্পলেখকের সন্ধান আমরা পেয়েছি। কিন্তু তাঁদের আমি বলিনি, 'আধুনিক ছোটোগল্পের জনক'। কেন? কারণ, সাহিত্যে 'আধুনিকতা' বলতে আমি যা বুঝি, যা 'অন্তর্গত মানুষ'কে উন্মোচিত করে, তার প্রথম উজ্জ্বলতম পরিচয় পেয়েছি জগদীশ গুপ্তের গল্পেই। ভাষা সেখানে সাধু না চলতি, রচনারীতি মার্জিত না মুদ্রাদোষচিহ্নিত সেটা কোনো ব্যাপার নয়, এটাই আসল কথা যে সেখানে জীবনের অন্তস্তল আশ্চর্য আলোকিত হয়ে উঠেছে। আধুনিক গল্পের কাজ জীবনের বহির্নারায়ণ নয়—জীবনের সত্য সন্ধান। জগদীশ গুপ্তের গল্পে তার পরিচয় আমরা প্রথমবারের মতো সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য রূপে পেয়েছি বলেই তাঁকে 'আধুনিক ছোটোগল্পের জনক' আখ্যা

www.pathagar.com

দিয়েছি, "বিনোদিনী"-কে বলেছি প্রথম আধুনিক গল্পগ্রন্থ। আলোচক ভিন্ন মতের কথা বলেছেন। হতে পারে। কিন্তু সব ব্যাপারেই কি ভিন্ন মত ভালো?

খ। কথাসাহিত্য সম্পর্কে সাধারণত কথাশিল্পীরা বিশ্লেষণ করেন না, কখনো-কখনো টুকরো মন্তব্য করেন—সুশান্ত মজুমদারের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথাই সত্যতর মনে হচ্ছে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন মন্তব্য শেষ-পর্যন্ত কোনো বিশ্লেষণী সমগ্রতা গড়ে তুলতে পারে না। আর কালের নিকষে যাঁরা উত্তীর্ণ নন (আবদুল মান্নান সৈয়দ সমেত), তাঁদের উদাহরণ জড়ো করা বৃথা।

ছোটোগল্প সম্পর্কে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটো-বড়ো চারটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। আর-কোনো সমুত্তীর্ণ গল্পলেখক কি অনুরূপ বিস্তারিত কাজ করেছেন? আমি লিখেছিলাম, '····অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ মতামত ও বিশ্লেষণ ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে একজনের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি—তিনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।' এই উক্তি অক্ষরে-অক্ষরে সত্য বলেই মনে করি।

২৪ মার্চ ১৯৮৮

বিনীত

—আবদুল মান্নান সৈয়দ

১৮/৩/৮৮

www.pathagar.com

কবির গদ্য

২৩.৫.৮৩
কলকাতা

প্রিয়বরেষু[১],

আপনাদের 'মাঝি' পত্রিকার 'কবির গদ্য' সংখ্যাটি (আগস্ট ১৯৮২) পড়লাম। চমৎকার! বোঝা যায়, আপনাদের সুচিন্তা ও সুপরিকল্পনা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছে এর পিছনে। যে-কবিদের নিয়ে আমাদের, আধুনিক কবিতা-পাঠকের, উৎসাহের শেষ নেই, তাঁদের গদ্যরচনাও আমাদের কাছে সমান উত্তেজক ও আনন্দজনক। সুতরাং তাঁদের সম্বন্ধে যখন একটি পত্রিকার পুরো সংখ্যাই নিবেদিত হলো তখন তার প্রাপ্তিতে আমাদের আনন্দ-যে সীমা ছাড়াবে তাতে আর সন্দেহ কী!

আপনাদের লক্ষ্য মোটামুটিভাবে রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাঙালি কবিদের গদ্যরচনা। আর-একটু সুনির্দিষ্ট ক'রে বললে মোহিতলাল থেকে শঙ্খ ঘোষ পর্যন্ত: বিশ, তিরিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের কবিদের গদ্য-রচনা আপনাদের আলোচনার আয়তনে এসেছে। (একটি আলোচনায় নবীনচন্দ্র সেনের গদ্যবিবেচনাও স্থান পেয়েছে। আমার মনে হয়েছে, এটি অপ্রাসঙ্গিক ও প্রক্ষিপ্ত। সংগত কারণেই রবীন্দ্রনাথের গদ্য যখন অনা-লোচিত থেকেছে, তখন নবীনচন্দ্র সেনের আলোচনা ইতিহাসের ধারাক্রম লংঘন বলে মনে হয়েছে আমার। এ ধরনের বিবেচনা অখণ্ড একটি মণ্ডল সফর করে এলেই পাঠকদের পক্ষে সুবিধা হয় সব দিক থেকে। বলা বাহুল্য, এই দায়িত্ব লেখকর নয়—সম্পাদকমণ্ডলীর।) মোহিতলাল মজুম-দার, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ— এঁদেরই গদ্য-কাজ আলোচিত হয়েছে। আর 'কবির গদ্যে'র নমুনা হিশেবে আহৃত ও উদাহৃত হয়েছে বিষ্ণু দে থেকে আজকের তরুণতম কবির অনেকগুলি

১. 'মাঝি' পত্রিকার সম্পাদক প্রশান্ত রায়কে লেখা।

www.pathagar.com

টুকরো গদ্যরচনা। দেড়শো পৃষ্ঠায় সত্যি একটি চিন্তাউদ্দীপক আশাশীল আয়োজন!

আমার চিঠির কেন্দ্রমর্মে প্রবেশের আগে দু'একটি আপত্তি ও আনন্দের কথা ব'লে নিই। সম্পাদকীয়তে কোনো-কোনো উল্লেখযোগ্য কবির গদ্যের আলোচনার অনুপস্থিতির কথা বলেছেন। সংগতভাবেই ধরে নেওয়া যায়, একটি নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাপরিসরে সব লেখকের আলোচনা সম্ভব নয়। তাহলেও এই সময়পরিসরের অন্তত দুজন কবি, যাঁরা সত্যিকার চিন্তাশীল গদ্য লিখেছেন, সেই সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের, গদ্যলেখার আলোচনা অনিবার্য ছিলো। অন্যদিকে খুশি হয়েছি নজরুল ইসলামের গদ্য-বিবেচনার অন্তর্ভুক্তিতে। (নজরুল সম্পর্কে কিছু-কিছু অবিবেচনা লক্ষ করছি। যেমন: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী-সম্পাদিত "কবিতা পরিচয়" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ থেকে বিনয় মজুমদার পর্যন্ত কবিদের কবিতা বিশ্লেষিত হয়েছে, কিন্তু মধ্যবর্তী নজরুল আশ্চর্যভাবে অনুপস্থিত!)

মোটামুটি রবীন্দ্রোত্তর চার জেনারেশনের গদ্যকাজ বিশ্লেষিত হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে হয়নি; সাময়িকপত্রের পক্ষে তেমন করা সত্যি মুশকিল। আমি ধারাবাহিকভাবে এঁদের সম্বন্ধে আমার বিবেচনার সারাৎসার উপস্থিত করছি এখানে। তাতে আলোচকদের সঙ্গে আমার মতের সাযুজ্য-বৈযুজ্য স্পষ্ট হবে।

মোহিতলাল লিখে এবং ব্যক্তিগতভাবে অনেককে চটিয়েছিলেন। এদিকে বাংলা সমালোচনা চলে অনেকখানি ব্যক্তিগত চালে। ফলে তিনি-যে বিশিষ্ট কবি এবং বিশিষ্ট সমালোচক (বিশিষ্ট কথাটি ব্যবহারে-ব্যবহারে অর্থাৎ অপব্যবহারে-অপব্যবহারে শুয়ারের মাংস হয়ে গেছে এতোদিনে; আমি এখানে আদি অর্থেই প্রয়োগ করছি, এবং সমগ্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পরিসর সামনে রেখেই), এই তথ্যটি আমরা ভুলেছি। (যেমন: সুকুমার সেনের প্রামাণ্য "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" চতুর্থ খণ্ডে সমালোচক ও প্রাবন্ধিক মোহিতলালকে উপস্থিত করা হয়েছে নিতান্ত দীনভাবেই। যেমন: নজরুলের বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতার উপরে মোহিতলালের 'আমি' কথিকার প্রভাব থাকা সত্ত্বেও মুজফফর আহমদ ও অন্যান্য নজরুল-জীবনীকারেরা ঐ প্রসঙ্গে অন্যায় আক্রমণ করেছেন মোহিতলালকে।) তখন-পর্যন্ত সমগ্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মোহিতলালই প্রথম ব্যাপক বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা

www.pathagar.com

করেন। তখন-পর্যন্ত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের—বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—এঁদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে তিনি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এঁদের মধ্যে, আমার বিবেচনায়, তাঁর মাইকেল-আলোচনা ("শ্রীমধুসূদন") শ্রেষ্ঠ। রবীন্দ্র-সমকালীন কয়েকজন উজ্জ্বল গৌণ কবির (অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ) তিনিই এখন-পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ সমালোচক। পরবর্তী কয়েকজন লেখকেরও (নজরুল, তারাশংকর) তিনি দীপ্তিমান বিশ্লেষক। সমালোচনার ভিতরে-ভিতরে একটি আশ্চর্য কুটাভাস কাজ করে---একদিকে সমালোচককে হতে হয় বহু বিভিন্ন এমনকি বিরোধী রুচির আস্বাদকারী; অন্যদিকে তাঁকে হতে হয় আদর্শবাদী অর্থাৎ একটি-কোনো পয়েন্ট থেকে তাঁর বিবেচনা উপস্থিত করতে হয়। মোহিতলালের মধ্যে এই সন্নিপাত, অল্পকালের জন্যে হলেও, সাধিত হয়েছিলো (পরবর্তীকালে বুদ্ধদেবে)। তার ফলেই তাঁর হাতে আমরা কিছু বিস্ময়কর বিশ্লেষণ ফলতে দেখেছি। বাংলা সমালোচনায় যে-বিজ্ঞানধর্মিতা আমরা প্রথমবার লক্ষ্য করি সুধীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেবের রচনায়, তার অগ্রজ উদ্‌গাতা মোহিতলাল। মোহিতলালের সঙ্গে কল্লোলের লেখকদের সম্পর্ক কখনো বিস্মরণযোগ্য নয়—তাঁর উড়ে-আসা স্ফুলিঙ্গ থেকে কোনো-কোনো অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিলো। জীবনানন্দের গদ্যের (এবং কবিতারও) দীর্ঘ, জটিল, প্যাঁচালো রীতি কি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলো মোহিতলালের ঐরকম দীর্ঘ, গ্রন্থিল, কুটিল বাক্যবন্ধ থেকে?

মোহিতলালের গদ্য তাঁর কবিতার সম্পূরক; কিন্তু নজরুলের গদ্য তাঁর কবিতার অনুপূরক। নজরুলের কবিতার যে-বিশিষ্টতা—বলিষ্ঠতা, স্বতঃস্ফূর্ততা, অকৃত্রিমতা, আবেগময়তা—তা তাঁর গদ্যেরও কেন্দ্রীয় চারিত্রলক্ষণ। তাঁর গদ্যের দোষ-গুণও তাই। গদ্যে তিনি লিখেছেন গল্প, উপন্যাস, প্রাবন্ধিক রচনা, সাংবাদিক রচনা, বক্তৃতা, পত্রাবলি ইত্যাদি। কবির সমগ্র গদ্যকাজকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে মোটামুটি ছয়টি ধরন : ১. সহজ, সাধারণ, আবেগময়, ভাবপ্রকাশক গদ্য; ২. নাটকীয় গদ্য; ৩. কাব্যিক গদ্য; ৪. আঞ্চলিক শব্দময় গদ্য; ৫. আরবি-ফারসি শব্দময় গদ্য; ৬. যুক্তিশাণিত গদ্য। নজরুলের গদ্যকে তাঁর কবিতার অনুপূরক বলেছি এজন্যে যে নজরুলের কবিতার যা চারিত্রলক্ষণ, তা তাঁর গদ্যেরও চারিত্রলক্ষণ—বলিষ্ঠতা, স্বতঃস্ফূর্ততা, অকৃত্রিমতা, আবেগ ও উচ্ছ্বাস।

www.pathagar.com

তিরিশের কবিদের মধ্যে অন্তত তিনজনের গদ্য আমার কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ: জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেবের। তিরিশের প্রধান পাঁচ কবি কবিতার মতো বিশিষ্ট গদ্যও-যে রচনা করেছেন, এ তথ্যটি মনোযোগ্য। (অনেক বছর আগে আমার একটি রচনায় দেখিয়েছিলাম, উত্তর-রৈবিক প্রথম গদ্যশিল্পীরা সবাই সৃষ্টিশীল কবি বা ঔপন্যাসিক। আমার তালিকায় ও আলোচনায় ছিলেন জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী—এই পাঁচজন কবি; এবং অন্নদাশঙ্কর রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—এই দুজন ঔপন্যাসিক। 'উত্তররৈবিক ক্যারাভান' নামে আমার ঐ প্রবন্ধটি আমার "নির্বাচিত প্রবন্ধ" গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত আছে। এখন, এই তালিকায় আর-একটি নাম যোগ করতে চাই, আমার ঐ রচনা প্রণয়নের অনেক পরে তিনি পূর্ণ রূপে ও তাপে ফুটে উঠেছেন, তিনি সৃষ্টিশীল কবি বা কথাশিল্পী নন্, কিন্তু সৃষ্টিশীল একজন লেখকই, সৃষ্টিশীল প্রাবন্ধিক: আবু সয়ীদ আইয়ুব।) এঁদের কবিতা আর এঁদের গদ্য দুই-ই সব সময় একই চেতনার ফসল, এঁদের গদ্য এঁদের কবিতাকে আর-একটু উদ্‌ঘাটিত করে। হয়তো সাধারণভাবে একথা সত্য: কবির গদ্য মাত্রেই কবির কবিতার একটি ছন্দহীন কঠিন পাদপীঠ। গদ্যের নিজস্ব চারিত্রের জন্যেই হয়তো এমন হয়—কবিতায় যা ছিলো জটিল ও কুয়াশাময়, গদ্যে তা স্পষ্ট, যুক্তির শৃংখলে বদ্ধ, কবিতার অনেক কূট কলাকুশলতাও সেখানে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়, কবির গদ্যকে কবির কবিতারই একটি নিশ্ছন্দ সম্প্রসার বলে মেনে নিই আমরা। জীবনানন্দ দাশের গদ্যকাজের অন্তর্ভুক্ত তিনটি গল্প, তিনটি উপন্যাস, "কবিতার কথা" গ্রন্থভূর্ত ও গ্রন্থবহির্ভূত কিছু প্রবন্ধ, পঞ্চাশটির মতো পত্র—এখন-পর্যন্ত এইসব। এই সব গদ্যরচনাকে বলা যেতে পারে কবি জীবনানন্দ দাশের নিঃশব্দ আত্মজীবনী কিংবা গোপন আত্মভাষ্য। (প্রসঙ্গত বলি, প্রভাতকুমার দাস তাঁর প্রবন্ধে আমার "শুদ্ধতম কবি" দ্বিতীয় সংস্করণ গ্রন্থে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের চিঠি সম্পর্কে কয়েকটি আপত্তি উত্থাপন করেছেন। সেগুলি সম্পর্কে আমার জবাব হলো এই: ১. কোনো চিঠিই আমি মূল কপি দেখিনি। সবই পত্রিকা বা পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রণ। সুতরাং তারিখ বিষয়ে ভুল হতেই পারে। কিন্তু প্রভাতবাবু নিজেও কোনো চিঠি দ্যাখেননি। এবং তিনি সবটাই জল্পনা বা অনুমান করেছেন। আর অনুমানের যা নিয়ম, ভুল-ঠিক দুই-ই হ'তে পারে। ২. তাঁর অনুমান, রবীন্দ্রনাথের প্রথম পত্রটি

www.pathagar.com

"ঝরা পালক" পড়ে লেখা। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, নজরুল প্রতিধ্বনিত "ঝরা পালক" কি এতোই নতুন মনে হবে রবীন্দ্রনাথের—যিনি সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, নজরুলের কবিতার সঙ্গে দীর্ঘ পরিচিত—যে, তিনি অতোখানি ক্রুদ্ধ হয়ে চিঠি লিখবেন তরুণ একজন কবিকে? হ্যাঁ, জীবনানন্দ-ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দগুলি বাংলা হরফে না-থেকে ইংরেজি হরফেই থাকা উচিত ছিলো। কিন্তু এই কর্মে আমার চেয়ে মুদ্রাযন্ত্রই বেশি দায়ী। বাংলা মেশিনজাত লাইনো টাইপের মধ্যে ইংরেজি হরফ ঢোকানো দুঃসাধ্য।—তবু, তাহলেও প্রভাতকুমার দাসের প্রশ্ন ও ঔৎসুক্য এই চেতাবনী জাগিয়ে দিয়ে যায় যে, এই ধরনের লেখায় লেখককে প্রতি মুহূর্তে শুধু সৃষ্টি-বা-চিন্তা-শীল হলেই চলে না, হতে হয় তথ্য বিষয়ে সতত জাগ্রত)। বুদ্ধদেব বসু কবিতা ও গদ্য বিস্তর লিখেছেন, সাহিত্যের প্রায় সমস্ত শাখাতেই অবিশ্রাম সৃষ্টি করে গিয়েছেন তিনি। আমার কাছে (এবং আমার বন্ধু ও আলাপীদের অনেকের মধ্যেই দেখেছি) তাঁর প্রবন্ধ ও সমালোচনাই সবচেয়ে মূল্যবান। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার তিনিই শ্রেষ্ঠ সংগঠক, নির্মাতা ও ভাষ্যকার; বিদেশি সাহিত্যের নিরন্তর নিবিড় চর্চায় ও পাঠে তিনিই বাঙালি পাঠককে দীক্ষিত করেছেন; সমগ্রভাবে আধুনিক সাহিত্যরুচি তাঁর নির্মাণ। তাঁর স্বভাবজ উচ্ছ্বাস-প্রবণতা তাঁর কবিতা ও উপন্যাসকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, কিন্তু প্রাবন্ধিক গদ্যে তিনি সংহত আবেগে ঐশ্বর্যবান। বুদ্ধদেব বসু ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রাবন্ধিক বাংলা গদ্যে রাবীন্দ্রিক অতিরেক বর্জন করে আবার বঙ্কিমী দৃঢ়তা ফিরিয়ে আনেন—এটাই, আমার বিবেচনায়, তাঁদের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। জীবনানন্দ দাশের 'কবিতার কথা', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'কাব্যের মুক্তি', বুদ্ধদেব বসুর "কালিদাসের মেঘদূত" ও "শার্ল বোদলেয়ার: তাঁর কবিতা" গ্রন্থদ্বয়ের ভূমিকা—আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ ও সমালোচনায় এই রচনাগুলি ধ্রুপদী জিনিশ: এদের মধ্যে আধুনিক কবিতা ও চেতনার হিরে-জহরত ভরা, আমার কাছে (আমার মনে হয়, আধুনিক বাঙালি সকল কাব্যপাঠকের কাছেই) এইসব গদ্যের আবেদন অনিঃশেষ।

সুভাষ, সুকান্ত বা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর গদ্যের আমি খুব উৎসাহী পাঠক নই। তিরিশের কবিদের গদ্যের যে-উন্নত ও সর্বব্যাপী আবহ ছিলো—যা বিষ্ণু দে বা অমিয় চক্রবর্তীর গদ্যেরও বহুমুখ আগ্রহে, উৎসাহে বা আত্ম-কবিতার পদপাতে নিরন্তর উদ্‌ঘাপিত ছিলো—মনে হয়, চল্লিশের

www.pathagar.com

কবিদের গদ্যকর্মে তা হয়ে ওঠে প্রায় প্রাদেশিক। সুকান্ত তো গদ্য লেখার সময়ই পাননি—কিছু পত্র ছাড়া। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁদের নিজের-নিজের ধরনে বাক্‌রীতিকে কবিতার একমাত্র আরাধ্য ভেবে ভুল করেছেন বলে মনে হয়। যা ছিলো মাধ্যম, তা এঁদের হাতে হয়ে ওঠে গন্তব্য। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্য মনে হয় যতোখানি চিন্তা-উদ্রেকী, তার চেয়ে বেশী সাংবাদিকী; আর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কাব্য-পাঠকের মোটামুটি অগ্রসরণের কথা ভুলে গিয়ে এতো প্রাথমিক জ্ঞান দান করতে থাকেন যে চিন্তার বিদ্যুৎ আর স্ফুলিঙ্গ কৃচিৎই ঝলশে ওঠে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গদ্যের গুণ তাঁর ব্যক্তিক চিন্তার বিদ্যুদ্দীপ্তিতে, অনাড়ম্বর সহজ স্বতঃস্ফূর্ত অকৃত্রিম প্রকাশে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের গদ্যে ভাবনার চেয়ে চেতনার দখলই বড়ো, দেশজ শব্দ-গন্ধের জগৎ তিনি সৃষ্টি করেন আধুনিক মণ্ডলে। প্রকৃত 'চিন্তার আভার ব্যবহার' দেখতে পাই শঙ্খ ঘোষের নিম্নকণ্ঠ গদ্যের ভিতরে।

হ্যাঁ, একটি কথা মনে পড়ছে খুব স্বাভাবিকভাবেই। এ বিষয়ে হয়তো আপনাদেরও একটু ঔৎসুক্য আছে। বাংলাদেশের কবিদের গদ্য কিরকম? এ বিষয়ে, না-লিখে পারছি না, একটি বাজে রেওয়াজই চালু আছে। বাংলাদেশের কবিরা সাধারণত গদ্য লেখেনই না। 'গদ্য? ও তো অন্যদের কাজ।' অনেকের মনোভাবই এরকম। সত্যি, দুঃখজনক। চিন্তার যে-শিরদাঁড়া কবিতার পিছনে কাজ করে, তা-ই তো কবিকে দিয়ে গদ্য লিখিয়ে নেয়। চিন্তার দীনতা গদ্য না-লেখার কারণ। আর কারণ, দায়িত্বহীনতা। কবিতা অনেকখানি ব্যক্তিগত, গদ্য অনেকখানি সামাজিক। দীর্ঘ, নিষ্ঠাবান, সকর্মক কবির গদ্যচর্চার উদাহরণ আমাদের দেশে বিরল। এরই মধ্যে অন্তত দুই জেনারেশনের দু'জন কবির উল্লেখ করবো, যাঁরা দীপ্যমান গদ্য-কাজ করেছেন: সৈয়দ আলী আহসান ও সম্প্রতি-মৃত (এপ্রিল ১৯৮৩) হাসান হাফিজুর রহমান। সৈয়দ আলী আহসান প্রাচীন, মধ্যযুগ ও আধুনিক সাহিত্যে সমান দক্ষতায় সঞ্চরণ করেন। চর্যাগীতি, আলাওল, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল—এঁদের সম্পর্কে তিনি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ আলাওল ও মাইকেল সম্পর্কে। আধুনিক কবিতা, চিত্রকলা এসবও তাঁর অনুক্ষণ আলোচনার বিষয়। আর হাসান হাফিজুর রহমানের শ্রেষ্ঠ সমালোচনাকৃতি আবহমান বাংলা কবিতার ধারায় বাংলাদেশী কবিদের স্থাপনা ও বিচার।

www.pathagar.com

ঢাকা থেকেই লিখতে চেয়েছিলাম এই চিঠি। ব্যস্ততায় ও আলস্যে হ'য়ে ওঠেনি আর। কলকাতায় এসে, একটি প্রয়োজনীয় নৈঃসঙ্গ্যে, লেখাটি সম্পন্ন করলাম। বাংলাদেশের মেয়েরা-বউরা-মায়েরা মাটির কিসিমেন্টের মেজেয় বসে যেরকম অলস-দ্রুত হাতে কাঁথায় সুঁইয়ের ফোঁড় তোলে, সেরকম লেপ্টে, জমিয়ে, আনন্দে। কিন্তু কাঁথায় সুঁইয়ের ফোঁড় তুলে নকশা বানানো তো, কাজেই খানিকটা এলোমেলো হবেই।

রবীন্দ্রোত্তর গদ্যচর্চার পর্যালোচনা এবং তার একমুঠো উদাহরণ জড়ো করে আমার মতো উৎসুক পাঠকের পিয়াস বাড়িয়ে দিয়েছেন। আপনারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করবেন।

'মাঝি' (কলকাতা)
আগস্ট-নবেম্বর ১৯৮৩

www.pathagar.com

আমাদের নবজাগরণ ও ফররুখ আহমদ

আমার প্রবন্ধের বিষয়ের দুটি অংশ সম্পর্কে আপনারা নিশ্চয় সচেতন : একটি, আমাদের নবজাগরণ; দ্বিতীয়টি, ফররুখ আহমদ। আমি প্রথমে নবজাগরণ এবং পরে তার সঙ্গে ফররুখ আহমদের সম্পৃক্তি বিষয়ে আমার বিবেচনা আপনাদের সামনে উপস্থিত করবো।

বলা হয়ে থাকে, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ বা রেনেসাঁস ঘটেছিলো। রেনেসাঁস কথাটির অর্থ পুনর্জন্ম। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার রেনেসাঁস প্রসঙ্গে 'স্বর্ণযুগ', 'প্রতিভার মিছিল', 'পুনর্জন্ম', 'পুনরুজ্জীবন' ইত্যাদি শব্দ ও শব্দপুঞ্জ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

রেনেসাঁসের স্বধর্ম জীবনের বিচিত্র তৃষ্ণা ও জিজ্ঞাসার উন্মীলন ও বিচ্ছুরণ। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় আমরা লক্ষ্য করি এই শতমুখ উচ্ছ্রিতি ও উৎসারণ। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে ইংরেজ রাজত্বের সূচনা। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দী অস্ত যাবার সঙ্গে-সঙ্গে মধ্যযুগের অবসান হলো। জিজ্ঞাসাহীন নিরুত্তেজ মন্থর আবৃত্তি, পুনরাবৃত্তি ও চংক্রমণের পরিবর্তে দেখা দিলো এক সার্বত্রিক জীবনক্ষুধা। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলো; লক্ষ্য : ইংরেজ রাজকর্মচারীদের এদেশের রাজনীতি ও ভাষা-সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষাদান। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলো। বাংলা গদ্যের প্রতিষ্ঠা ও পরিচর্চার জন্যে এই দুই বিদ্যায়তনের দান অপরিসীম। গদ্যভাষার নাড়িনক্ষত্রের ব্যাখ্যাতা বাংলা ব্যাকরণ রচিত হলো প্রথমবারের জন্যে; বাংলা গদ্যের ক্রমমসৃণতা; ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি রাজভাষা হিশাবে প্রবর্তিত; মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা; ইংরেজি থেকে সুপ্রচুর অনুবাদ ও অনুসরণ; সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা ভাষার নতুন সম্বন্ধ ও সংঘর্ষ, অবিরল ইস্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা; সুপরিকল্পিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন; সাময়িক পত্রের প্রথম প্রকাশ; সাহিত্যিক গদ্য, নাটক, উপন্যাস; সাহিত্যের বাণিজ্য-মূল্য; সতীদাহ রোধ; বহুবিবাহ রোধ; বিধবাবিবাহ প্রবর্তন; নারীশিক্ষা; নারীজাগরণ; সার্বত্রিক জাগরণের কেন্দ্রভূমি ছিলো সাহিত্য; দর্শন, চিত্র

www.pathagar.com

কলা, সংগীত, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়েও উদ্যম সঞ্চারিত হয়।—এই সমস্ত বিষয়েরই কেন্দ্র ছিলো চিন্তা, ভাবুকতা, মনস্বিতা। ফলে জাগরণকামী ও পুরাতনপন্থীদের মধ্যে নিরন্তর তর্কবিতর্ক, আলোচনা-পুনরালোচনায় সেকালের সাময়িকপত্র ও পুস্তক-পুস্তিকা মুখরিত।

মধ্যযুগী মানসের জাড্য ঘুচিয়েছেন যাঁরা, তাঁদের প্রধান স্থপতি : রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—এই জাগরণের প্রধান সাহিত্যিক সন্তান; অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যামিনী রায়—চিত্রকলায়; জগদীশচন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু—বিজ্ঞানে; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, সুরেশচন্দ্র মজুমদার—ইতিহাসে। এছাড়া উনবিংশ শতাব্দীতে আরো অনেক মনীষী, ভাবুক, চিন্তাবিদের রচনায়, আলোচনায়, জীবনচর্চায় ঘটেছিলো এক সর্বব্যাপ্ত পুনরুজ্জীবনের প্রকাশ।

উনিশ শতকী পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে ইউরোপের কার্যকারণ শৃংখলাগত রেনেসাঁসের সাযুজ্য-বৈযুজ্য দুই-ই আছে। এবং সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। মানবজীবন ও প্রকৃতিতে কোন্ দুটি জিনিশই বা অবিকল এক রকম? স্বাভাবিকভাবেই ইউরোপীয় রেনেসাঁসের পরিধি ও আয়োজন বিশাল; তার জাগরণের উৎস ছিলো তারই অন্তরে : লাতিন ও গ্রীক ধ্রুপদী সাহিত্যের পুনরাবর্তনে। পক্ষান্তরে উনিশ শতকী বাংলায় রেনেসাঁসের প্রাণ ও উপাদান এসেছে বাইরে থেকে—ইংরেজ সংস্পর্শে; আর তার আকৃতি-প্রকৃতিও ছিলো ছোটো এবং অনেকখানি আকস্মিক।

ঐহিকতা, প্রাতিস্বিকতা, যুক্তিশীলতা, বিচিত্রের প্রতি উন্মুখিতা, জিজ্ঞাসা, কৌতূহল, সন্ধিৎসা, পুনর্বিবেচনা, ভাবুকতা, আধুনিকতা—রেনেসাঁসের মর্মতলে অবিরলভাবে কাজ করে যাচ্ছে এইসব। বাংলার রেনেসাঁসের পাটাতনও তৈরি হয়েছে এই সমস্তের অবিরলতায়।

কিছুকাল থেকে বাংলার নবজাগরণ বিষয়েই কোনো-কোনো মহল থেকে কোনো-কোনো প্রশ্ন উচ্চারিত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য রেনেসাঁসের তুলনায় বাংলার জাগরণ নবজাগরণই নয়, কেননা তা পরাধীন ভারতে সংঘটিত হয়েছে এবং তার আহরণকেন্দ্রও পাশ্চাত্ত্য—কারো-কারো এই বিবেচনা স্বীকারযোগ্য নয়, কেননা ইংরেজের শ্রেষ্ঠ দানই এই বাংলার রেনেসাঁস। বিনয় ঘোষের "বাংলার নবজাগৃতি" (বৈশাখ ১৩৮৬) গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের নাম ছিলো 'নবজাগৃতিকেন্দ্র কলিকাতা', তিরিশ বছর পরে তাঁর মনে

www.pathagar.com

হয় 'বাংলার নবজাগৃতি একটি অতিকথা'। আর তাঁর যুক্তি : কলকাতা শহর যদি 'নবজাগৃতিকেন্দ্র' হয়, যদি রেনেসাঁসের সূর্য 'জ্যোতির কনকপদ্মের' মতো কলকাতার আকাশে উদিত হয়ে থাকে, তাহলে 'কলকাতার খুব কাছাকাছি গ্রামেও, দেড়শো বছর পরেও কেন অমাবস্যার রাত্রের মতো অন্ধকার ? কেন অতীতের ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে গ্রামের মানুষ আজও গভীর ঘুমে অচৈতন্য ?' এবং 'আমাদের দেশের বৃহত্তম জনশ্রেণী কৃষকেরা নিম্নতম শূদ্রবর্ণভুক্ত হবার ফলে যে রাজনৈতিক ট্রাজেডি ঘটেছে তা আরও শোচনীয়।'

কিন্তু ১৯৭৮ শালে রচিত এই আলোচনায় একবারও উল্লিখিত হয় না বাংলার বিপুল সংখ্যক মানুষ—বাঙালি-মুসলমান—বাংলার নবজাগরণে কতোখানি অংশগ্রহণ করেছে, বা কতোখানি ফল লাভ করেছে, তাদেরও কিছু প্রাপ্তি ছিলো কিনা। 'আল-এসলাম' পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩২২) প্রকাশিত একটি আদমশুমারীর তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে : ১৮৮১ শাল থেকে বৃহত্তর বাংলায় হিন্দু জনসংখ্যার তুলনায় মুসলিম জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিলো। আজ আমাদের কাছে এই প্রশ্নটিই তীব্রতম হ'য়ে দেখা দ্যায় যে, উনিশ শতাব্দীর নবজাগরণ বাংলার অর্ধেক—অর্ধেকের চেয়ে ক্রমশ বর্ধমান—মানুষকে যদি স্পর্শমাত্র না-করে, তাহলে তাকে নবজাগরণ বলা চলবে কিনা।

রামমোহন রায়ের মধ্যে সর্বজাতি সমন্বয়ের বিস্ময়কর একটি চেষ্টা দেখা গিয়েছিলো। তিনি শুধু তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে অভিজ্ঞ ছিলেন না, সেকালের ধনীদের রেওয়াজ অনুযায়ী ইসলামী চালচলন পছন্দ করতেন। 'এমনকি, অনেকের ধারণা ছিল, তিনি মুসলমানের সহিত পান-ভোজনও করেন। এইজন্য হিন্দু-আচারের পক্ষপাতী লোকেরা তাঁহাকে অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিত ও 'যবন' বলিয়া নিন্দা করিত। রামমোহন কিন্তু সেজন্য নিজের আচার-ব্যবহারের কোন পরিবর্তন বা মুসলমান বন্ধুদিগকে বর্জন করেন নাই।' (প্রথম খণ্ড, "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা" : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) আর বর্ধমানে সেকালে দুরারোগ্য ম্যালেরিয়া দেখা দিলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যাদের চিকিৎসাভার গ্রহণ করেছিলেন তারা অধিকাংশই মুসলমান। ("বিদ্যাসাগর" : চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) মুহররমের ঘটনা-বলি নিয়ে মাইকেল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন মহাকাব্য রচনার। আর 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'য় গোলাম মোস্তফার 'ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ'

www.pathagar.com

(শ্রাবণ ১৩২৯) প্রবন্ধ পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ পত্রিকার সম্পাদকদের জানিয়েছিলেন একটি পত্রে, 'আপনাদের পত্রিকায় 'ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক লেখাটি পড়িয়া আনন্দলাভ করিয়াছি। মুসলমানদের প্রতি আমার মনে বিন্দুমাত্র বিরাগ বা অশ্রদ্ধা নাই বলিয়াই আমার লেখার কোথাও তাহা প্রকাশ পায় পাই।' (কার্তিক ১৩২৯)

এইসব সংলগ্নতা সত্ত্বেও না-মেনে উপায় নেই, উনিশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রধান পুরুষেরা তাঁদের একান্ত পার্শ্ববর্তী বাঙালি-মুসলমান সম্পর্কে আশ্চর্যরকম উদাসীনতাই উদযাপন করেছেন।

অন্যদিকে রাষ্ট্রক্ষমতা ব্রিটিশের হাতে যাওয়ার পর রাষ্ট্রভাষা ফারসি থেকে ইংরেজিতে পরিবর্তিত হওয়ার পর বাঙালি-মুসলমান কেবল অন্ধকার থেকে আরো-অন্ধকারে গিয়ে পড়েছে। প্রতিবেশী বাঙালি-হিন্দুর মতো সে ইংরেজি শেখেনি। তার সমাজে রাজা রামমোহন রায় বা স্যার সৈয়দ আহমদের মতো কোনো নেতা আসেননি। তার ফলে 'বাংলাদেশে দু-একটি পরিবার ছাড়া মোটামুটি সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরেই বাংলার মুসলমানেরা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করেনি।' (পৃ. ১৬, "বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত": মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান) ব্যতিক্রমের মধ্যে ছিলো নবাব আবদুল লতিফ-প্রতিষ্ঠিত 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' (১৮৬৩) বা সৈয়দ আমীর আলী-প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৮)। কিন্তু 'সোসাইটি বা এ্যাসোসিয়েশন কোনটার প্রতিই বাঙালী-মুসলমানের বৃহত্তর জন-সমাজের কোন আস্থা ছিল মনে হয় না।' (পৃ. ৮২, "আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা": কাজী আবদুল মান্নান) ফলত নবাব আবদুল লতিফ বা সৈয়দ আমীর আলী বাঙালি-মুসলমানের মধ্যে সেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারেননি, যা করেছিলেন রামমোহন বা বিদ্যাসাগর।

কিন্তু ইতিহাসের ধারা ক্রমঅগ্রসরমান। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার জাগরণ যখন নির্মীয়মাণ অর্ধাংশ অতিক্রম ক'রে সৃজ্যমান অর্ধাংশে এসে পড়লো, ততোদিনে বাঙালি-মুসলমানের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। যে-জিজ্ঞাসা, সন্ধিৎসা, তর্কপ্রবণতা নবজাগরণের কেন্দ্রোৎস তা যতো ছোটো আকারে বা বৈদগ্ধ্যশূন্যভাবেই হোক শুরু হয়ে গেছে। এবং দেখা গেলো, বাঙালি-হিন্দুর জিজ্ঞাসা ও সন্ধিৎসার সঙ্গে যুক্ত থেকেও তা স্বতন্ত্রও বটে। এ সময়কার পত্র-পত্রিকা ঘাঁটলে দেখা যাবে দুটি সমস্যাই সবচেয়ে তীব্র ও জ্বলন্ত :

www.pathagar.com

এক ভাষার সমস্যা; আর দুই, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। বাঙালি-হিন্দুর কাছে এ দুটির কোনোটিই তিলতম সমস্যা সৃষ্টি করেনি।

আমরা মুহম্মদ আবদুল হাই প্রদত্ত বাঙালি-মুসলমান লেখকদের দ্বিভাজন—স্বাতন্ত্র্যধর্মী ও সমন্বয়ধর্মী—এর সারবত্তা শেষ-পর্যন্ত স্বীকার করতে পারি না এজন্যে যে, স্বরগ্রামের নানারকম পার্থক্য সত্ত্বেও ইসলাম ও মুসলমান সে-যুগের সব লেখকেরই ছিলো কেন্দ্রীয় বিষয়। 'সুধাকর' ও 'নবনূর' পত্রিকার, বা উত্তরকালের 'সওগাত' ও 'মোহাম্মদী' পত্রিকার, মনোপ্রতিন্যাসের তুলনাতেই তা ধরা পড়বে। এমনকি 'শিখা' গোষ্ঠীরও—যতো যুক্তিশীলতাই থাক—কেন্দ্রীয় ভূমি ও ভিত্তি ছিলো তা-ই। বাঙালি-মুসলমানের ভাষা বিষয়ক যে-প্রশ্ন উঠেছিলো তাও মুসলমান হিশাবে, ভারতবর্ষের বাইরের মুসলমানী ঐতিহ্য ও সাম্প্রতিককে সে কতোখানি পরিগ্রহণ করবে মুসলমান হিশাবে, এই সমস্যাও জেগেছিলো। বাঙালি-হিন্দু ছিলো এ ধরনের সমস্যা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

এদিকে বাঙালি-হিন্দুর সঙ্গে সম্পর্ক সাধনের জন্য বাঙালি-মুসলমান ছিলো সতত তৎপর—যদিও তারই মধ্যে তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য সে কখনো ভোলেনি। মুসলমান-সম্পাদিত সাময়িকপত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিষয়ে সতত যে-ভাবনা-বেদনা জাগ্রত ছিলো, হিন্দু-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকায় তা ছিলো না। মীর মশাররফ হোসেন থেকে নজরুল ইসলাম পর্যন্ত, নজরুল ইসলাম থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত বাঙালি-মুসলমানের সাহিত্যসাধনা এই সম্পর্ক সাধন ও স্বাতন্ত্র্য সাধনের কমবেশি মাত্রা-বিতরণে অগ্রসর হয়ে চলেছে।

উনিশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকে এক সার্বত্রিক জীবনপিপাসা জেগে উঠেছিলো বাঙালি-মুসলমানের মধ্যে। একক কোনো রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের প্রবর্তনায় নয়—সমবায়ী এক জিজ্ঞাসায় ও সঙ্কিৎসায়। তার মধ্য দিয়ে সে যেমন ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, তেমনি সংলগ্ন হয়েছে সমকালীনে। জিজ্ঞাসা, কৌতূহল, সঙ্কিৎসা, তর্কসংকুলতা, আলোচনা-প্রত্যালোচনায় উনিশ শতাব্দীর প্রথমাংশের মতো এইসব মুসলিম পত্র-পত্রিকা অবিরল পরিকীর্ণ। 'কোহিনূর', 'নবনূর', 'মোহাম্মদী', 'বাসনা', 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা', 'সওগাত', 'মোসলেম ভারত', 'ধূমকেতু', 'লাঙল', 'শিখা', 'নওরোজ', 'জয়তী', 'বুলবুল' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এই নবজাগরণের ধারা প্রবাহিত হয়। মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী, শেখ আবদুর

www.pathagar.com

রহিম, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী-র মতো সমাজ-সংস্কারক, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও আবদুল গফুর সিদ্দিকীর মতো ইতিহাস-সন্ধানী, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও মোহাম্মদ আকরম খাঁ-র মতো পণ্ডিত, সৈয়দ এমদাদ আলী ও মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের মতো সংগঠক-সম্পাদক, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর মতো ঐতিহ্যচেতন, বেগম রোকেয়ার মতো নারীজাগরণকামী, কাজী ইমদাদুল হক, ডা. লুৎফর রহমান, এয়াকুব আলী চৌধুরী, এস. ওয়াজেদ আলী, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর মতো ভাবুক—এঁরাই সমবেতভাবে বাঙালি-মুসলমানের নবজাগরণের পৃষ্ঠপট তৈরি করেছিলেন। ব্যাপক অর্থে বাংলার নবজাগরণের শূন্যাংশ এঁরাই পূর্ণ করেছিলেন। 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' (১৮৬৩, কলকাতা), 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' (১৯১১, কলকাতা), 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (১৯২৬, ঢাকা)—এই তিনটি সংস্থা বাঙালি-মুসলমানের জাগরণের সিঁড়ির তিনটি উজ্জ্বল ধাপ।

আমাদের নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ ফল নজরুল ইসলাম। উনিশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকে আমাদের যে-নবজাগরণের ধারা প্রবাহিত হয়, বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে তা চূড়ান্ত ও এককেন্দ্রিক স্পষ্টতা পায়। নজরুল ঐ প্রবহমান নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, উনিশ শতাব্দীশোভন মানসস্বাস্থ্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রতিভার অধিকারী। এই স্বীকৃতি রেনেসাঁস-ব্যাখ্যাতারা দেননি। যেমন: অন্নদাশংকর রায় তাঁর "বাংলার রেনেসাঁস" (১৩৮৮) গ্রন্থে বাঙালি-মুসলমানের নবজাগরণের সবটাই কৃতিত্ব দিয়েছেন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' বা 'শিখা' গোষ্ঠীকে। কিংবা শিবনারায়ণ রায় ('জিজ্ঞাসা' পত্রিকার রেনেসাঁস বিষয়ক আলোচনায়) বেগম রোকেয়া ও 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'কে। পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞানের অভাবেই এরকম একপেশে মন্তব্য করা হয়েছে—কোনো সমাজকে পূর্বাপর না-জানারই ফল এরকম বিভ্রম। কিন্তু বিস্ময়কর লাগে: নজরুল ইসলাম তো অপরিচিত কোনো লেখক নন। তাহলে কেন নজরুল ইসলাম-কে রেনেসাঁসের ধারায় এঁরা বিবেচনা করেননি। এর পিছনে কোনো মানসকূট কাজ করেছে কিনা, সন্দেহ হয়। কেননা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' বা 'শিখা' গোষ্ঠীর প্রাণপুরুষ স্বয়ং কাজী আবদুল ওদুদ নজরুল বিষয়ক প্রথম গ্রন্থপ্রণেতা—এবং তাঁর নজরুল-আলোচনা আজো আশ্চর্য অন্তর্দর্শিতায় পরিপূর্ণ ব'লে মনে হয়। 'শিখা'-গোষ্ঠীরই কাজী মোতাহার হোসেন ও আবুল ফজল নজরুল বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ

www.pathagar.com

গ্রন্থ রচনা করেছেন, এই গোষ্ঠীরই সদস্য কবি আবদুল কাদির তাঁর সমগ্র জীবন নজরুল-চর্চায় নিবেদন করেছেন; এই গোষ্ঠীরই কনিষ্ঠতম সদস্য মোতাহের হোসেন চৌধুরী এমনকি রেনেসাঁস ও নজরুলের সম্পর্ক বিষয়ে একক প্রবন্ধ পর্যন্ত রচনা করেছেন। না-মেনে উপায় নেই, অন্নদাশংকর বা শিবনারায়ণ 'শিখা' গোষ্ঠীর বহিঃকার্যক্রমে বা কিংবদন্তীতে যতোখানি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, ততোখানি চেষ্টা করেননি তাঁদের রচনাবলি পাঠ বা অনুধাবনের। ফলে এইসব রায়বাবুদের রায় দানে আমরা একমত হতে পারছি না। আমরা পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই: রেনেসাঁস যে-ব্যক্তিত্বের বন্দনা করে, বহুবিপরীতের সম্মিলনকারী নজরুল ইসলাম তার শ্রেষ্ঠ তূর্যবাদক, আমাদের নবজাগরণের প্রধানতম পুরুষ।

আমাদের এই নবজাগরণ কোনো স্থির ব্যাপার নয়—প্রবহমান। কম-বেশি একশো বছর ধরে প্রবহমান। আর আমরা মনে করি: আমাদের এই বিলম্বিত জাগরণ উনিশ শতকী বৃহত্তম জাগরণের সঙ্গে যুক্ত হয়েই বাংলার নবজাগরণকে অর্থতাৎপর্যময় করেছে, এবং তাকে অন্তত একদিক থেকে পূর্ণতা দিয়েছে।

২

আমাদের এই নবজাগরণের ধারায় ফররুখ আহমদের অবস্থান কোথায়? বস্তুত ফররুখ আহমদকে ঘিরে এত-যে বিচার-বিবেচনা-বিতর্ক, তার মূলে তাঁর ঐ অবস্থান। ঐ নবজাগরণের ধারায় তিনি এমন-একটি দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন যে তাঁকে নিয়ে বিতর্কের ধূম্রজাল উঠেছে। সেই বিতর্ক তাঁর জীবদ্দশাতেই শুরু হয়েছিলো; তিনি তার কোনো জবাব দেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি, বরং তাঁর কাজ নিঃশব্দে সমাধা করে চলে গিয়েছেন। সেই কাজ—জীবদ্দশায় প্রকাশিত চোদ্দোটি বই, মৃত্যুর পরে এ-পর্যন্ত প্রকাশিত পনেরোটি বই, পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়ানো ও পাণ্ডুলিপিতে আবদ্ধ আরো অসংখ্য কবিতা ও অন্যান্য রচনা—এখন আমাদের সামনে এক অখণ্ড, একক, অবিভাজ্য রচনাসমগ্রের আকার নিয়েছে। সব মিলিয়ে ফররুখ আহমদ তাঁর নিজস্ব জগৎ তৈরি করে গিয়েছেন। প্রথম জীবনে কয়েকটি ছোটোগল্প তিনি লিখেছেন; একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাসও আছে তাঁর; কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন; বেশ-কিছু গানও আছে তাঁর লেখা; শিশু ও কিশোর-সাহিত্য বিস্তর;—কিন্তু সব-মিলিয়ে প্রথমত ও শেষত তিনি কবি। কবি—কবি ছাড়া আর-কিছুই নন। আর সব মিলিয়ে যে-কাব্য-জগৎ তিনি নির্মাণ করেছিলেন, সেটিই তাঁর নিজস্ব জগৎ।

www.pathagar.com

কবিতা লিখেও, রোমান্টিক কবিতা লিখেও, ফররুখ আহমদের চেতনার জগৎ, বাস্তবতার কঠিন ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে। সেটা তাঁর ঘনিষ্ঠ কাব্য-বিশ্লেষণে ধরা পড়ে।

নজরুল ইসলাম ও মোহিতলাল মজুমদার, জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বিষ্ণু দে-কে তিনি শোষণ করে নিয়েছিলেন; এঁদের কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁর উপরে নেই, কিন্তু এঁদের কাছ থেকে কবিতার পাঠ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা নজরুল, কিন্তু লক্ষণীয়: আমাদের তিরিশের কবিদের উপর তাঁর সংস্কৃতিচেতনা বা ইসলামী চেতনার কোনো প্রভাব নেই—আমাদের তিরিশের শ্রেষ্ঠ কবি জসীমউদ্‌দীনের কবিতা সম্পূর্ণ পৃথক জগৎপরিধি নিয়ে আবর্তিত হয়েছে। চল্লিশের দশকের কবিতায় স্বাতন্ত্র্যচেতনা যখন প্রবল হয়ে উঠলো—ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ কবির রচনায়, তখন, ততো-দিনে, নজরুল সম্পর্কে এঁরা সম্পূর্ণ সজাগ থেকেও নজরুল থেকে পৃথক হয়ে উঠলেন। আজকে বিংশ শতাব্দীর প্রান্তদেশে দাঁড়িয়ে মনে হয়, নজরুল ইসলাম, যিনি হিন্দু-মুসলমান মিলনসাধনার শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা, তাঁর ঐ মিলন-চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে; ঐ মিলন-সাধনার ব্যর্থ কিন্তু মহৎ প্রবক্তা হয়েই থাকলেন নজরুল। সুস্থ অবস্থার শেষ দিকে নজরুল নিজেও তা অনুভব করেছিলেন যেন—এরকম ব্যর্থতার বোধ তাঁর শেষদিককার কিছু কবিতা, ভাষণ বা চিঠিপত্রে টের পাওয়া যায়। কিন্তু এই মিলন-সাধনায় ব্যর্থতার বীজ যে তখনই রোপিত ছিলো, তা বোঝা যায় যখন আমরা এই মজার কুটাভাস লক্ষ্য করি: নজরুলের হিন্দু-মুসলিম মিলন-সাধনার রচনাবলি প্রকাশিত হচ্ছে মুসলিম-সম্পাদিত সাময়িকীতেই! ফররুখ আহমদ ও তাঁর সমকালীনেরা এই বিষয়ে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতেই হয়তো সচেতন হয়ে গিয়েছিলেন। এদিকে রাজনীতিক্ষেত্রে দেশ তখন এগিয়ে যাচ্ছিলো মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র একটি আবাস-খণ্ডের আকাঙ্ক্ষায়। ফলে এঁরা স্বাভাবিকভাবেই মুসলমান-চেতন ইসলাম-চেতন হয়ে ওঠেন। আমাদের যে-নবজাগরণের ধারা গত শতাব্দীর শেষ থেকে প্রবাহিত হচ্ছিলো, এঁরা তাতে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হলেন, এবং নিজেদের স্বাতন্ত্র্য-বিষয়ে আতীব্র সচেতন হয়ে উঠলেন। কোনো ভীরুতা, মৃদুতা, কুণ্ঠা রইলো না। ফলে যে-ফররুখ আহমদ মধ্য-তিরিশে রোমান্টিকতায় সর্বস্ব সমর্পণ করেছিলেন, কয়েক বছর যেতে-না-যেতে তিনি হয়ে উঠলেন আদর্শনিষ্ঠ, স্বকীয় বিশ্বাসে বলীয়ান।

www.pathagar.com

এই সময়ে একজন সমালোচকের উক্তি মনে হয় খুব উপকারী হয়েছিলো। ১৯৪১ শালে 'সওগাত' পত্রিকায় 'আধুনিক কবিতা ও মুসলিম কবিগণ' প্রবন্ধে আবু রুশদ লিখেছিলেন : 'কবি হিসাবে ফররুখ আহমদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা নিজের শক্তির উপর তাঁর আস্থার অভাব। তাঁর প্রকাশ ও দৃষ্টিভঙ্গী রোমান্টিক বলে যেন একটু কুন্ঠিত এবং এই কুন্ঠার জন্য তাঁর অধিকাংশ কবিতা পরিপূর্ণরূপে রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি। নিজের তৈরি যে কারাগারে কবির মন এখন বন্দী তা তাঁর কাব্য-প্রচেষ্টাকে বহু জায়গায় ব্যর্থ করেছে। ফররুখ আহমদের যা সবচেয়ে বেশি জানা দরকার তা এই যে, বলিষ্ঠ রোমান্টিসিজম বাস্তবিকই নিন্দার কিছু নয়।' ('সওগাত', ভাদ্র ১৩৪৮) ১৯৪৩-৪৪ শালেই ফররুখ আহমদ আত্মপ্রত্যয়িত হ'য়ে ওঠেন; "সাত সাগরের মাঝি"র কবিতাগুলি লেখা ঐ দুই বছরে। ঐ বইয়ে যে-অরুণ্ণ, বলিষ্ঠ, অসংকোচ রোমান্টিসিজম প্রকাশিত হয় আতীব্র আবেগে, ফররুখের পরবর্তী কবিতায়ও তা প্রবাহিত হয়েছে; নিজের শক্তির উপরে ফররুখের আস্থার অভাব পরবর্তীকালে আর-কখনো ঘটেনি। বরং ঐ আত্ম-শক্তিতেই আমাদের নবজাগরণের ধারা নূতন করে সঞ্জীবিত ও উজ্জীবিত হয়।

তিরিশের বাংলা কবিতার প্রধান দুটি ধারা : একটি হৃদয়বাহী; অন্যটি চিন্তাবাহী। চিন্তাবাহী কবিতার প্রধান দুই ব্যক্তিত্ব সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে। ১৯৩০ শালে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একটি সভায় আধুনিক বাংলা কবিতার ইশতাহার-স্বরূপ 'কাব্যের মুক্তি' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, যে-প্রবন্ধে প্রথম টি. এস. এলিয়ট উল্লিখিত হন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে এলিয়টকে পরিচিত করেন বাঙালি সমাজে। কবি-সমালোচক এলিয়ট ঐতিহ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন তাঁর বিখ্যাত 'Tradition and Individual Talent' নামক প্রবন্ধে। চল্লিশের দশকে ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ এলিয়টের রচনায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। এলিয়ট-ইয়েটস-এর অনুসরণে এঁরা ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণে অগ্রসর হন। ১৯৪৫ শালে ঢাকায় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদে'র একটি অনুষ্ঠানে পুঁথির পুনরুজ্জীবন বিষয়ে একটি বিতর্ক উপস্থিত হয়। ঐতিহ্যের পুনরুত্থানে বাঙালি-মুসলমান পুঁথি-কারদের পুনর্জন্ম দেওয়া মধ্য-বিংশ শতাব্দীর প্রায় একটি অসম্ভব ব্যাপার —এবং পুঁথি-পুনরুজ্জীবনবাদীরা সকলেই অনিবার্যভাবে ব্যর্থ হয়েছেন,

www.pathagar.com

শুধু অনেক বছর পরে অসম্ভব প্রতিভাবান ফররুখ আহমদ তাঁর "হাতেম তা'য়ী" কাব্যগ্রন্থে সেই অসম্ভব-কে সম্ভব করেছিলেন।

নবজাগরণের একটি লক্ষণ হচ্ছে প্রাচীনের নবীভূত উত্থান। ফররুখ আহমদ এই কাব্যকৌশল আবহমান মুসলিম কবিদের মধ্যে সবচেয়ে সফলভাবে প্রয়োগ করেন। আধুনিক বিশ্বসাহিত্যেরই একটি বহুখ্যাত কৌশল হচ্ছে পুরাণের পুনর্ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অতীতকালের সঙ্গে বর্তমান কালের সেতু সংরচন। মাইকেল, নজরুল, বিষ্ণু দে—বাঙালি কবিদের মধ্যে এঁরাই সর্বাধিক পুরাণ ব্যবহার করেছেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, গ্রীক, মুসলিম ইত্যাদি পুরাণ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত। মুসলিম পুরাণের প্রথম প্রকৃত কাব্যিক ব্যবহার করেছেন নজরুল। উত্তরকালে সর্বাধিক এবং সবচেয়ে যোগ্যতায় ফররুখ আহমদ। "সাত সাগরের মাঝি"তে তো বটেই, "নৌফেল ও হাতেম," "হাতেম তা'য়ী"—এসবের মধ্যেও ফররুখ মুসলিম পুরাণেরই উদ্বোধন করেছেন। (হাতেম তা'য়ীকে অমুসলিম এবং প্রাক-ইসলাম যুগের বলে কেউ-কেউ ফররুখের ভুল ধরেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মুসলমানদের কাছে হাতেম আমাদেরই একজন পূর্বসূরী হিশাবে চিহ্নিত, বাংলার পুঁথি-সাহিত্যেও সেভাবেই তিনি গৃহীত। সুতরাং পাণ্ডিতিক ব্যাখ্যা যাই হোক, কবিতার সাধারণ্যে স্বীকৃতিই আসল। আর মুসলিম পুরাণ যেহেতু সুবিস্তৃত নয়, এবং কিছুটা অস্পষ্ট, কাজেই একজন মুসলিম কবি ব্যবহার করতে পারেন কল্প-পুরাণ। আমাদের বিচারে হাতেম তা'য়ীর পুনর্ব্যবহার ফররুখে সম্পূর্ণ সংগত এবং তা কাব্যন্যায়-কে কখনোই এবং কিছুতেই উল্লঙ্ঘন করেনি।) ফররুখের অসামান্য কৃতিত্ব এই যে তিনি ইতিপূর্বে অব্যবহৃত আরব্যোপন্যাস-কে মুসলিম পুরাণের রূপে প্রয়োগ করেন। আরব্যোপন্যাসের এক নায়ক সিন্দাবাদ ফররুখেরও কাব্যনায়ক। আরব্যোপন্যাসের কাহিনী ফররুখকে চিরকালই বিমুগ্ধ রেখেছে। "সাত সাগরের মাঝি"র বাইরেও তাঁর অনেক কবিতার উৎস আরব্যোপন্যাস। ফররুখ আহমদ এদেশের কবিতায় পুরাণ প্রয়োগের (মুসলিম পুরাণ প্রয়োগের) দুয়ার খুলে দিয়েছেন। ফররুখ আহমদের যে-সব বিস্ময়কর মৌলিকতার জন্যে এদেশের সাহিত্যে তিনি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, মুসলিম পুরাণের পুনর্জন্ম তার অন্যতম।

কিন্তু শেষ-পর্যন্ত সব-কিছুই—নবজাগরণও—মানবিকতাতেই তার মুক্তি খুঁজে নিয়েছে। মানুষের মুক্তি ও কল্যাণ সাধনই নবজাগরণের শেষ গন্তব্য।

www.pathagar.com

এদিক থেকে ফররুখ আহমদের সমস্ত সাহিত্যকর্মই মানবিকবাদের সপক্ষে। তাঁর সমস্ত রচনার মর্মবাণী খচিত হয়েছে—"নৌফেল ও হাতেম" কাব্যনাট্যে শায়েরের উক্তিতে :

কাব্য নয়, গান নয়, শিল্প নয়,—শুধু সে মানুষ
নিঃস্বার্থ, ত্যাগী ও কর্মী, সেবাব্রতী—পারে যে জাগাতে
সমস্ত ঘুমন্ত প্রাণ—ঘুমঘোরে যখন বেহুঁশ
জ্বালাতে পারে যে আলো ঝড়-ক্ষুব্ধ অন্ধকার রাতে;
যার সাথে শুরু হয় পথ চলা জাগ্রত যাত্রীর
দিল সে ইশারা আজ আত্মত্যাগ হাতেম তা'য়ীর॥

১৯৮৮

www.pathagar.com

হাসান হাফিজুর রহমান

যে-কোনো দেশের রাজধানী যেমন তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উৎস, তেম্নি তার সাহিত্যিক-শৈল্পিক-সাংস্কৃতিক কেন্দ্রভূমি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জনন ও বিকাশ যে ইংরেজ রাজত্বকালে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ও সম্প্রসারমান কলকাতা নগরীতেই হবে এবং হয়েছিলো—এটাই স্বাভাবিক। ঢাকা তখন মফস্বল—তবু পূর্ব বাংলার এই শহরটিতে মফস্বলী মলিনতার মধ্যেও একটুখানি স্বতন্ত্র ঔজ্জ্বল্য ছিলো। দেশবিভাগের আগে এই মলিন উজ্জ্বলতা উজ্জ্বলতম শিখায় দীপ্যমান হয়ে উঠেছিলো এই শতাব্দীর বিশের দশকে। যে-কোনো সংঘটনের পিছনেই মনে হয় খানিকটা প্রাকৃতিক ষড়যন্ত্র থাকে—সবটাই যুক্তিশীল বা পারম্পর্যময় নয়। বিশের দশকের ঢাকার সাহিত্যিক জগতে একই সঙ্গে কয়েকটি বিপরীতের উন্মীলন ঘটেছিলো—যাদের মধ্যে আবার একটুখানি সরু বিনিময়ের ব্যবস্থাও হয়েছিলো। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটুখানি পরোক্ষ ভূমিকা ছিলো—বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্র বলেই, সাহিত্যের হৃদয়বাদিতার পিছনেও মননের হাত থাকে বলেই। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক সাহিত্যের, 'কল্লোলে'র বা তিরিশের কবি ও কথাশিল্পীদের বিকাশে একটি ভূমিকা নিয়েছিলো বিশের দশকের ঢাকা। আবার বাঙালি-মুসলমানের প্রথম প্রমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি এখানেই একটি নিবিড় সংগঠন ও পত্রিকার আকার নিয়েছিলো। এই দুই আধুনিকতার প্রকাশে বিশের দশকের ঢাকা গৌরবময়। এক কথায়, বিশের দশকে সাহিত্যে এসেছিলো নতুন হাওয়া, আর তা এসেছিলো ঢাকা থেকে।

গোপাল হালদার বা সৈয়দ আলী আহসান এবং আরো কেউ-কেউ 'কল্লোল যুগ'কে স্বীকার করেন না—কিন্তু তাতে কোনো এসে যায় না, ইতিহাসের ধারা সতত সম্মুখযাত্রিক, কল্লোল যুগ রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক সাহিত্যের প্রধানতম ঘটনা। সুকুমার সেন লক্ষ্য করেছেন: 'কল্লোলে'র বীজ বোনা হয়েছিলো ঢাকায়, বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত জগন্নাথ হল বার্ষিকী 'বাসন্তিকা'য়—১৯২২ শালে। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রধান তিনটি বাহন 'কল্লোল' (১৯২৩, কলকাতা), 'কালি-কলম' (১৯২৬, কল-

www.pathagar.com

কাতা) আর 'প্রগতি' (১৯২৭, ঢাকা)। 'প্রগতি' পত্রিকায় সমবেত হয়েছিলেন মূলত পূর্ববঙ্গের কয়েকজন লেখক: বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, অমলেন্দু বসু, পরিমল রায়, জীবনানন্দ দাশ, ভৃগুকুমার গুহ প্রমুখ। নজরুল ইসলাম, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখও এই পত্রিকায় শরিক হয়েছিলেন। এই পত্রিকা কেবল সৃষ্টিশীল তরুণ লেখকদের লেখাই ছাপেনি, আধুনিকতার প্রতিপক্ষকেও নির্জিত করতে সতত সচেষ্ট ছিলো। আবার এদিকে ১৯২৬ শালে ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক মুখপত্র 'শিখা' প্রকাশিত হয় ১৯২৭ শালে। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' বা 'শিখা'র প্রধান পুরুষদের মধ্যে ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, অধ্যাপক আবুল হুসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, আবদুল কাদির, আনোয়ারুল কাদির, আবুল ফজল প্রমুখ। এঁদের লক্ষ্য ছিলো বুদ্ধির মুক্তি—বাঙালি-মুসলমান সমাজে মননের প্রাধান্য আর-কখনো এমনভাবে দেখা যায়নি। কিন্তু এঁরা উন্মূল বা শিকড়হীন ছিলেন না—গোঁড়ামিমুক্ত বাঙালি-মুসলমান সমাজকেই এঁরা জাগ্রত ও সচেতন করতে চেয়েছিলেন। এঁরা ছিলেন যুক্তিবাদী ও জিজ্ঞাসু। এঁদের প্রথম দুই বছরের বার্ষিক অধিবেশনে কলকাতা থেকে এসেছিলেন নজরুল ইসলাম—যিনি এই বিশের দশকেই বাঙালি-মুসলমানের জাগৃতির প্রধান বংশীবাদক। 'প্রগতি' ও 'শিখা'—এই দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শের পত্রিকার মধ্যে সাবলীল যাতায়াত করেছেন একজন—নজরুল ইসলাম—দুই জায়গাতেই যিনি ছিলেন সম্মানিত ও প্রেরণাস্বরূপ। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র একটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী—স্বনির্বাসিত এই অসামান্য ভাবুক লেখককে আহবান করে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ঢাকা তখন সাহিত্যিক প্রাণ-চাঞ্চল্যের কেন্দ্রও হয়ে উঠেছিলো। আধুনিক সাহিত্যের উন্মেষকালের এক প্রধান পুরুষ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত তখন ঢাকায়। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনাকর্মে যোগ দিয়েছেন। ১৯২৮ শালে আধুনিকতার আর-এক পুরোধা পুরুষ মোহিতলাল মজুমদার ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগ দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোহিতলালের কর্মকাল ১৯২৮-৪৪। আধুনিক সাহিত্যের এক প্রধান ব্যক্তিত্ব হয়েও মোহিতলাল অত্যল্পকালের মধ্যেই আধুনিক সাহিত্যের বিরোধী হয়ে দাঁড়ান।

www.pathagar.com

তা সত্ত্বেও তাঁর আধুনিকতা অনস্বীকার্য—একটি কূটাভাসী আধুনিকতা তিনি শেষ-পর্যন্ত অর্জন করেন। আধুনিক কোনো-কোনো লেখকের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে তিনি পূর্ব বাংলাকেই অনেক সময় দায়ী করেছেন; কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদায়ী বক্তৃতায় তিনি পূর্ব বাংলার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে গেছেন।

বিশের দশকের ঢাকায় এই প্রাণচাঞ্চল্য স্থায়ী হয়নি। 'প্রগতি' ও 'শিখা' গোষ্ঠীর লেখকেরা কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন প্রায়-সবাই। কলকাতাই ছিলো প্রাণকেন্দ্র। আমাদের দেশবিভাগ-পূর্ব তিনটি প্রধান পত্রিকাই—'সওগাত', 'মাসিক মোহাম্মদী' ও 'বুলবুল'—কলকাতা থেকে বেরিয়েছিলো। এবং এটিই স্বাভাবিক।

চল্লিশের দশকে ঢাকায় আবার একটুখানি সাহিত্যিক রণন উঠেছিলো। ১৯৩৬ শালে লক্ষ্ণৌতে হিন্দু ও উর্দু কথাশিল্পী প্রেমচন্দের সভাপতিত্বে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই পিঠ-পিঠ স্থাপিত হয় 'ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ', 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ'। চল্লিশের দশকে মার্কসবাদ ও বামপন্থা চূড়ান্ত রূপে সম্প্রসারিত হয়। সাহিত্যেও তার স্বাক্ষর আছে। ১৯৪০ শালে ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক সংঘ প্রকাশ করেন 'ক্রান্তি', ১৯৪২ শালে 'প্রতিরোধ'। এসব পত্রিকা ও সংস্থার সঙ্গে তখন যুক্ত ছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, অচ্যুত গোস্বামী, অজিত গুহ, মুনীর চৌধুরী প্রমুখ। ১৯৪২ শালে ঢাকায় ফ্যাসিবাদ-বিরোধী মিছিল পরিচালনা করতে গিয়ে নিহত হন তরুণ লেখক সোমেন চন্দ।

এই পটভূমির পরে, ১৯৪৭-এ দেশবিভাগের ফলে ঢাকা হয় পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী এবং বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় রাজধানী। এই প্রথম বাঙালি-মুসলমান একটি কেন্দ্রে সংস্থিত হয়। ততোদিনে প্রগতি লেখক সংঘ ভেঙে গেছে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি এসে পড়েছে এক অভাবিত নূতন পরিপ্রেক্ষিতে। নূতন দিক-নির্দেশনা দরকার। দেশবিভাগোত্তর এই সাহিত্যিক নূতন দিক-নির্দেশনা যিনি সবচেয়ে সফল ও সাবলীলভাবে দান করেছেন, তিনি হাসান হাফিজুর রহমান। হাসান হাফিজুর রহমান সৃষ্টিশীল শিল্পী, কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর মননময়তা তাঁকে এমন-এক জায়গায় দাঁড় করিয়েছে, যা দ্বিতীয়রহিত।

www.pathagar.com

২

১৯৪৭-এ হাসান হাফিজুর রহমানের প্রথম লেখা 'সওগাতে' প্রকাশিত হয়েছিলো বলে জানিয়েছেন মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (একটি গল্প, 'অশ্রু-ভেজা পথ চলতে', 'সওগাত', বৈশাখ ১৩৫৪), তাহলেও হাসান হাফিজুর রহমানের প্রকৃত উত্থান ঠিক ১৯৫০-এ—মধ্য-বিংশ শতাব্দীতে। কবি রূপে এবং গল্পকার রূপে। ১৯৫০ শালে আশরাফ সিদ্দিকী ও আবদুর রশীদ খান-সম্পাদিত "নতুন কবিতা" প্রকাশিত হয়। উপান্ত-চল্লিশের এই দুই কবি-সম্পাদক পরবর্তী কবিতারও প্রাথমিক শড়ক নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। "নতুন কবিতা"র তেরোজন কবির অন্যতম ছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান। এই "নতুন কবিতা"র কয়েকজন কবি পঞ্চাশের কবি-সংঘের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আবার ঐ ১৯৫০ শালেই আবদুল গনি হাজারী ও মাহবুব জামাল জাহেদী-সম্পাদিত 'মুক্তি' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইতিহাসচেতন হাসান হাফিজুর রহমান 'মুক্তি' পত্রিকার সম্পাদক-দ্বয়কে তাঁর "আরো দুটি মৃত্যু" গল্পগ্রন্থ উৎসর্গ করেন এই বলে যে 'এ-দেশের আধুনিক সাহিত্য আন্দোলনের প্রথম সাংস্কৃতিক মুখপত্র'। বস্তুত আমাদের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন যে-আবদুল গনি হাজারী, তাঁর কথা আমরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছি। বস্তুত হাসান হাফিজুর রহমানের প্রতিধ্বনি করে বলতে হয় 'মুক্তি' ছিলো 'এদেশের আধুনিক সাহিত্য আন্দোলনের প্রথম সাংস্কৃতিক মুখপত্র'। 'মুক্তি' ছিলো মাসিক পত্রিকা—কিন্তু মাত্র চারটি সংখ্যা বেরিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। অসামান্য এই পত্রিকায় হাসান হাফিজুর রহমানের দুটি গল্প বেরিয়েছিলো : 'মাছ' ও 'বৌ'। হাসান তখন পর্যন্ত ছিলেন কেবল লেখক—যদিও তাঁর সম্পাদক-প্রতিভা ছেলেবেলাতেই দেখা দিয়েছিলো 'রাঙা প্রভাত' নামে হাতে-লেখা একটি পত্রিকায়। '৫০-এর বছর দুয়েকের মধ্যেই হাসান তাঁর পূর্ণ স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। ১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারিতে তাঁর ভূমিকা ছিলো সক্রিয় ও উদ্দীপ্ত। তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু মোহাম্মদ সুলতান লিখেছেন, 'ভাষা আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যে সমস্ত পোস্টার, দেওয়াল পত্রিকা সাঁটা হয়েছিল তার নব্বই ভাগেরই দাবীদার হাসান নিশ্চয়ই হতে পারে।' ১৯৫২-র শেষাংশে হাসান হাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ নাসির-উদ্দীন-সম্পাদিত নবপর্যায় মাসিক 'সওগাত'-এর পরিচালনায় প্রধান হিশাবে যোগদান করেন। 'সওগাত'-এর অফিস ততোদিনে কলকাতা থেকে ঢাকায়

www.pathagar.com

স্থানান্তরিত হয়েছিলো। 'সওগাত'-এর নববর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ ১৩৫৯ শালে। ঢাকায় নূতন লেখকেরা 'সওগাত'কে কেন্দ্র করে সেদিন একত্রিত হয়েছিলেন। পরের বছর ১৯৫৩ শালে জানুয়ারি মাসে হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় ও মোহাম্মদ সুলতানের প্রকাশনায় বেরোয় "একুশে ফেব্রুয়ারী"—এক মহৎ দূরপ্রভাবী সংকলন। তখন থেকেই বছর-বছর অজস্রধারে 'একুশে ফেব্রুয়ারি' সংকলন প্রকাশের রেওয়াজ হয়। একুশে ফেব্রুয়ারি হয়ে ওঠে আমাদের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক জাগরণ ও প্রগতির এক অমেয়-অম্লেয় উৎস। ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩ শালে হাসান হাফিজুর রহমান-সম্পাদিত "একুশে ফেব্রুয়ারী" সংকলন বাজেয়াপ্ত করে তদানীন্তন সরকার। ১৯৫৬ শাল পর্যন্ত বইটি নিষিদ্ধ ঘোষিত ছিলো। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ শালে। হাসান হাফিজুর রহমানই আরেকটি পত্রিকার সূচনা করেন, নামকরণও তাঁর, 'সমকাল,' যার সম্পাদক হিশাবে অবতীর্ণ হন সিকান্দার আবু জাফর। 'সমকাল' প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ শালে, সম্পাদক সিকান্দার আবু জাফর, সহযোগী সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান। দেশবিভাগের পাঁচ বছর পরে সংঘটিত হয় ভাষা-আন্দোলন, ভাষা-আন্দোলনের পাঁচ বছর বছর পরে প্রকাশিত হয় 'সমকাল' পত্রিকা, বস্তুত দেশবিভাগের দশ বছর পরে আমাদের সাহিত্য এক স্বস্থ সমীকরণে পৌঁছোয়। আর এ দায়িত্ব সবচেয়ে সফলভাবে পালিত হয় হাসান হাফিজুর রহমানের হাতে।

হাসান হাফিজুর রহমান সাহিত্য-পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন পরেও—ষাটের দশকে লেখক সংঘের মুখপত্র 'পরিক্রম', সত্তরের দশকে সিকান্দার আবু জাফরের মৃত্যুর পরে 'সমকাল'। কিন্তু পঞ্চাশের দশকেই তাঁর হাতে আমাদের সাহিত্যের ভিত্তিপাথর স্থাপিত হয়ে গিয়েছিলো। সেকালে তাঁর কর্ম-কুশলতা কেবল সম্পাদকরূপে নয়—এমনকি প্রকাশক হিশাবেও দেখা গেছে : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ও আলাউদ্দিন আল আজাদ-সম্পাদিত "দাঙ্গার পাঁচটি গল্প" এবং আলাউদ্দিন আল আজাদের গল্পগ্রন্থ "জেগে আছি"। আসলে হাসান হাফিজুর রহমান প্রকৃত অর্থে এক সব্যসাচী প্রতিভা : অধ্যাপক ও সাংবাদিক; কবি, গ্রন্থকার, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক; সম্পাদক ও প্রকাশক; সংগঠক। সংগঠক হিশাবে তাঁর ভূমিকা এদেশে তুলনাহীন। সমসাময়িক লেখক সাইয়িদ আতীকুল্লাহ বলেছেন : 'সীমিত অর্থে আমাদের এই ছোট সাহিত্য-জগতে হাসান হাফিজুর রহমান ছিলেন প্রায় এজরা পাউণ্ড।' কিংবা

www.pathagar.com

বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গেও তুলনা দেওয়া যায়। তিনি অনায়াস সাবলীলতায় সহাস্যে একটি জাতিগত দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বিভিন্ন সংস্থার কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হিশাবে কাজ করেছেন তিনি। তাঁর একান্ন বছরের ছোটো জীবনকেই আজ মনে হয় নিটোলভাবে পরিপূর্ণ। তার আরম্ভে "একুশে ফেব্রুয়ারী"র মতো অসাধারণ গ্রন্থ সম্পাদনা, শেষে "বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ" নামের ষোলো খণ্ডের মহাগ্রন্থ সম্পাদনা। 'সওগাত' ও 'সমকাল'-এর মতো পত্রিকা সম্পাদনা। আর দেশে-বিদেশে এইসব কাজই তিনি করেছেন অন্তহীন আনন্দের মধ্য দিয়ে, নির্ভার আড্ডার মধ্য দিয়ে। আড্ডা—লেখকশিল্পীর আড্ডাও তার কর্মধারারই অংশ : হাসান হাফিজুর রহমান তা প্রমাণ করেছেন।

কিন্তু হাসান হাফিজুর রহমান শেষ-পর্যন্ত পুরো-খোলা, সম্পূর্ণ বহির্বৃত ছিলেন না; তিনি অন্তর্বৃতও ছিলেন। সামাজিকতা ও ব্যক্তিকতার একটি সংঘর্ষ ছিলো তাঁর মধ্যে—এমনকি তথাকথিত 'প্রগতি' আর তথাকথিত 'প্রতিক্রিয়া'র। সমাজচেতন ও রাজনীতিচেতন ছিলেন তিনি—তার সাক্ষ্য দেবে তাঁর সাংবাদিক-জীবন আর তাঁর সমগ্র রচনাবলি। ইতিহাসচেতন ছিলেন তিনি—তার সাক্ষ্য দেবে তাঁর প্রবন্ধাবলি। শিল্পচেতন ছিলেন তিনি—তার সাক্ষ্য দেবে তাঁর কবিতাবলি। তিনি প্রগতি বলতে শিকড়হীন-তাকে বুঝতেন না অনেকের মতো। তাই তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'অমর একুশে'র প্রথম পঙক্তির প্রথম শব্দ 'আম্মা' নিয়ে বিতর্ক দেখা দিলেও তিনি তাকে অবজিত রাখেন। হুমায়ুন কবিরের বক্তব্যকে আরো অগ্রসর করে দিয়ে আমাদের সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য বিচার করেন। তাঁর হাতেই প্রথমবারের মতো আধুনিক বাঙালি-মুসলমান কবিদের কালবিন্যস্ত নকশা প্রণীত হয়। আর তাঁর কবিতা ও গদ্য রচিত হয় এক বিশ্লেষণী নিজস্ব ভাষায়। ফলে মানববিশ্বাসী ও সমাজবিশ্বাসী কবির গদ্যে ও কবিতায় এক-ধরনের অ্যাবস্ট্রাকশন দেখা দ্যায়—হৃদয়ের সঙ্গে মেশে মনন। ফলে তাঁর কবিতা ও গদ্য কোনোটাই দ্রুতবোধ্য ও জনপ্রিয় হয় না। হাসান হাফিজুর রহমানের ব্যক্তি-মানুষটির মধ্যে সামাজিকতার সঙ্গে মিশে ছিলো লাজুকতা। কবিতা যেহেতু মানুষের গহন আত্মার প্রতিবিম্বপাত, তাই কবিতা ব্যক্তিমানুষের প্রকৃত দর্পণ। হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায় তাই সামাজিকতার সঙ্গে মিশেছে ব্যক্তিকতা—গদ্যকার কখনো-কখনো ঋংবৃত হয়েছেন আশ্চর্য লিরিক লাবণ্যে। সংগঠক, সম্পাদক, সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক হাসান

www.pathagar.com

হাফিজুর রহমান আশ্চর্য আশাশীল, গভীর সংবেদী, অতীতে-বর্তমানে-ভবিষ্যতে তাঁর দৃষ্টি বিস্তীর্ণ; কিন্তু কবি হাসান হাফিজুর রহমানের কণ্ঠে অনেক সময় জেঁকে বসে বিষাদ—নিরাশ্বাস—ঐ বিষন্নতা ও আশ্বাসহীনতা হাসান হাফিজুর রহমানকে জৈবনিক পূর্ণতা দিয়েছে, বোধের পূর্ণতা দিয়েছে। ঐ বিষাদ না-থাকলে হাসান হাফিজুর রহমান জীবনকে সম্পূর্ণ দেখতে পেতেন না।

'অবিস্মরণীয়' শব্দটির যাথার্থ্য আজকাল অনেক অপব্যবহারে ক্ষয়ে গেছে; হাসান হাফিজুর রহমানের সাহিত্যিক ভূমিকাকে আমি ঐ শব্দের প্রকৃতার্থে প্রয়োগ করতে চাই।

১৯৮৯

www.pathagar.com

আল মাহমুদের সাম্প্রতিক কবিতা

কবি আল মাহমুদের একগুচ্ছ নূতন কবিতা* হাতে এলো যখন, তখন আমি ছোটো একটি ব্যক্তিগত গদ্যরচনা তৈরি করছিলাম। রচনাটি যতোক্ষণ লিখিত হতে থাকলো, আমার মাঝে-মাঝে মনে পড়তে থাকলো এই একগুচ্ছ নবপল্লবের কথা। একটি তৃষ্ণা ও প্রত্যাশা ভিতরে-ভিতরে জেগে থাকলো। আল মাহমুদের নূতন কবিতা! তার মানে নূতন কিছু পাওয়া যাবে। আর তার মানে কবির কাছে আমাদের প্রত্যাশা ফুরোয়নি এখনো। আল মাহমুদের সমসাময়িক অনেক কবি ও কথাশিল্পীর ক্ষেত্রে হয়তো এরকম প্রত্যাশা আপনাদেরও অনেকের জাগবে না। আল মাহমুদ আজো-যে আমাদের আগ্রহ-উন্মুখ রাখতে পারছেন, এখানে তাঁর শিল্পী হিশেবে সচলতা ও জাগ্রত-চিত্ততার পরিচয়। আর এখানেই পাঠক ও সমালোচক হিশেবে আমাদের আনন্দ।

প্রায় চার দশক হয়ে এলো আল মাহমুদ কবিতা লিখছেন। ঢাকা ও কলকাতার প্রধান-অপ্রধান পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হচ্ছে, বই বেরুচ্ছে মাঝে-মাঝে, বেশ কয়েক বছর হয়ে গেলো ঢাকা ও কলকাতা থেকে "আল মাহমুদের কবিতা" নামে তাঁর কবিতাসংগ্রহ বেরিয়েছে, তারপরও এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তাঁর তিনটি কবিতাগ্রন্থ : "বখতিয়ারের ঘোড়া" (১৯৮৫), "আরব্য রজনীর রাজহাঁস" (১৯৮৭), "প্রহরান্তের পাশ ফেরা" (১৯৮৮)। একেবারে প্রথম জীবনে আল মাহমুদ গল্পও লিখতেন, পরবর্তীকালে অনেকদিন ধরে কবিতা লেখার পর এখন কিছুকাল হলো আবার গল্প লিখছেন, গল্পব্যতিরেকী গদ্যও লিখছেন। এখন যেন তাঁকে মনে হয় সাহিত্যে আগের চেয়ে নিবিষ্ট। এইসব গল্প ও গদ্যরচনাতেও তাঁর স্বভাব, মেজাজ, চারিত্র খুব স্বচ্ছস্পষ্টভাবেই মুদ্রিত। গদ্যে আজকাল তাঁর তীব্র রাগ ও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ মাঝে-মাঝেই ঝলশে উঠছে—বাঁকা ছুরির মতো

---

* কবিতাগুলি এই : 'দূরদৃষ্টি', 'জন্মদিন,' 'এক সুহাসিনী বোনের জন্য,' 'সমারোহ,' 'কাজের কথা,' 'সুযোগ,' 'মীনার প্রান্তরে ইয়াসির আরাফাত,' 'কদর রাত্রির প্রার্থনা,' 'সুড়সুড়ির ছড়া,' 'আত্ম-সংহারের গান', 'দিওয়ান : হাফিজের স্মরণে,' 'ছিদ্রান্বেষণ,' 'একচক্ষু হরিণ,' 'ঠিকানাহীন নাওয়ের ভাসান' ও 'পানির মারণ'।

www.pathagar.com

কখনো, কখনো খোলা তলোয়ারের মতো। সব-মিলিয়ে একটি প্রাণবান, ক্রুদ্ধ, সহর্ষ, জ্যান্ত ও জঙ্গম জগতের তিনি অধিবাসী ও স্রষ্টা। আল মাহমুদ নামক সচল, সপ্রাণ, সাবলীল ব্যক্তিমানুষটির মতোই তাঁর লেখা।

কিন্তু কবিতায় মাঝে-মাঝে তিনি যে-জগৎ নামিয়ে আনেন, তাতে আমরা, আল মাহমুদের ঈষৎ-ঘনিষ্ঠেরাও, অবাক হয়ে ভাবি: 'এ কোন জগৎ!' আমাদের-চেয়ে-ঘনিষ্ঠতর আল মাহমুদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যারাও—আমি নিশ্চিত—তাঁর কাব্যপৃথিবীতে ঢুকে পড়লে চমকে ভাবেন: 'আরে, এ কোন জগৎ!' হ্যাঁ, কবির অন্তরঙ্গতমেরও সাধ্য নেই এই জগতের গোপন চাবির সন্ধান পাওয়া। তার কারণ, এই জগৎটি একান্ত কবি-কল্পনারই অতিব্যক্তিগত অতিঅনাক্রমণীয় আত্মজগৎ। বহুদিন হলো আল মাহমুদ ঢাকা শহরের স্থায়ী অধিবাসী। প্রায়ই অবশ্য তিনি মফস্বলের এ-শহরে ও-শহরে যাচ্ছেন কবিতা পড়তে বা কবিতা বিষয়ে বলতে—তাতে আর গ্রামজীবনের কতোটুকুই বা দেখা যায়। কিন্তু আসলে তো বাল্যবেলার বহু বীজ চিরকালের মতো উপ্ত হয়েছে তাঁর মনে, কোনোদিনই আর সে-সবের উচ্ছেদ সম্ভব না; তার সঙ্গে সব সময়ই মিশছে চলিষ্ণু সাম্প্রতিকের অজস্র রেণুকণা; বস্তু ও কল্পনার আশ্চর্য মিশেলে, স্বপ্ন ও আদর্শের আশ্চর্য মিশেলে, এইভাবে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ-স্পর্শী তাঁর আত্মজগৎ নির্মিত হয়েছে। আল মাহমুদের অন্তর্জগতেই নদীকেন্দ্রী নৌকোময় গ্রামবাংলা প্রবেশ করে তাকে সম্পূর্ণ অধিকার করে আছে—তাঁর বাইরের জীবনযাপন, চলাফেরা, ওঠাবসা দিয়ে তাঁকে সব সময় মেলানো যাবে না। কবি এভাবেই লিখে থাকেন কবিতা। কবি নন কথাশিল্পী। তাঁর অন্তর্জগৎ, তাঁর কল্পজগৎই তাঁর কাছে বস্তুজগতের চেয়ে বেশি সত্য। আল মাহমুদের মতো কবি, যিনি সমকালীন ঘটনার দ্বারা অনেক সময়ই স্পৃষ্ট হচ্ছেন (এই কবিতাপুঞ্জেও তার কয়েকটি সাক্ষ্য আছে), তিনিও, শেষ-পর্যন্ত, সময়-অসময়েই, তাঁর সেই নিজস্ব খোড়লে প্রবেশ করেন। ঐ ব্যক্তিগত খোড়লে প্রবেশ করা মানে পলায়ন নয়—যেমন অনেকে বলেন। (আল মাহমুদই অনেক বছর আগে একটি কবিতায় এর বিনীত প্রতিবাদ করেছিলেন অনেকটা এরকমভাবে: পলাতক বলে লোকে, বুকে বড়ো বাজে।) না—যাকে অনেকে 'পলায়ন' বলে তা পলায়ন নয়, তা আসলে অন্তঃপ্রবেশ; যাকে 'পলাতক' মনে করে, সে-ই আসলে গভীরতর যুক্ত। রবার্ট ফ্রস্ট একবার অনুবাদ-কবিতা সম্পর্কে বলেছিলেন: কবিতার অনুবাদে যা বাদ

www.pathagar.com

পড়ে, সেটাই আসল কবিতা। ঐ কথাটার মতোই ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে: পলায়নই আসলে কবিতা, থাকা কবিতা নয়, অর্থাৎ সত্তা বা অস্তিত্ব কবিতা নয়, কবিতা সত্তা বা অস্তিত্ব থেকে উর্ধ্বারোহণ। তা না হলে একজন কবিতা লিখবেই বা কেন। সে যদি সত্তার বাইরে এক-লহমার জন্যেও না-যায়, তাহলে আর সত্তার পুনর্নির্মাণ করতে চাইবে কেন? আসলে তো কবিতা কোনো ব্যবহারিক জিনিশ নয়—এ আত্মার আশবাব। আল মাহমুদের এই সাম্প্রতিক কবিতাগুচ্ছও শেষ-পর্যন্ত বস্তু-অতিক্রমী আত্মার আশবাব।

১৯৭৯ শালে, আজ থেকে ঠিক দশ বছর আগে, 'আল মাহমুদ' ("করতলে মহাদেশ" গ্রন্থভুর্ত) নামাঙ্কিত একটি রচনায় আমি বলেছিলাম:

> মধ্যপঞ্চাশে আল মাহমুদ প্রবেশ করেন এদেশের কবিতায়, কবিতা এবং আধুনিকতা নিয়ে। এদেশের প্রথম আধুনিক কবিদের অন্যতম তিনি, তাঁর কবিতার গ্রামীণতার চেয়ে অনেক-বেশি জরুরি ও তাৎপর্যবান ও উপকারী এই নতুন আলিঙ্গনকারী আধুনিকতা। পঞ্চাশের ও পঞ্চাশ-পূর্ববর্তী কবিতার পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখেই এই তাৎপর্যে জোর দিতে চাই আমি। আল মাহমুদ আধুনিকতাকে পল্লবগ্রাহকের মতো ধারণ করেননি, আধুনিকতার শিকড় প্রোথিত ও সঞ্চারিত তাঁর কবিতায়, তাঁর কবিতার শিখর একালের বাতাসে সমীরিত—কেবল শব্দে-ছন্দে বহির্বিষয়ে নয়, আন্তরিক অর্থেই।

এ-কথা এখন আরো পরিষ্কার হয়ে গেছে। আল মাহমুদ কোনো পল্লীকবি নন; —লোক-কবিদের সঙ্গে জসীমউদ্‌দীনের যতোটা দূরত্ব, জসীমউদ্‌দীনের সঙ্গে আল মাহমুদের দূরত্ব ততোটাই। যে-গ্রামের ছবি এঁকেছেন আল মাহমুদ, তা বাংলাদেশেরই প্রতিভূ-গ্রাম; আল মাহমুদের ঐ একফোঁটা গ্রামে সারা বাংলাদেশই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। ঐ বিম্বিত বাংলাদেশই আল মাহমুদের কবিতা।

দেশজতার ছাপ আল মাহমুদের কবিতায় এমন প্রবলভাবে চেপে বসেছে যে তাঁর কবিতা আমাদের একটি প্রশ্নের সম্মুখীন করে: আমাদের কবিতায় আমাদের নিজস্ব ছাপ কতোখানি থাকবে? —এই ছাপ আঞ্চলিকতা বা স্থানিক বর্ণিমার ছাপ নয়, জীবন-যাপনের সমগ্রতার একটি ছাপ। অনেক বছর আগে আল মাহমুদেরই সমকালীন কবি-

www.pathagar.com

সমালোচক হাসান হাফিজুর রহমান আমাদের সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যের কথা উচ্চারণ করেছিলেন যুক্তিশীল তেজে। আমরাও বিশ্বাস করি: আবহমান বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত থেকেও আমরা বাংলা সাহিত্যে একটি স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যের সংস্থান করেছি। আল মাহমুদের কবিতা খুব স্পষ্টভাবেই পশ্চিম বাংলার কবিতামণ্ডল থেকে পৃথক। তাঁর কবিতায় বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের তরতাজা স্বাদ-গন্ধ প্রাপ্তব্য। বছর চল্লিশ আগে "বাংলার কাব্য" (বৈশাখ ১৩৫৪) নামক কালোত্তর গ্রন্থে কবি-মনীষী হুমায়ুন কবির পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার স্বাতন্ত্রিকতা যেভাবে চিহ্নিত করেছিলেন, মনে পড়ে যাচ্ছে তার কথা:

> পশ্চিম বাঙলার প্রকৃতি তাই বাঙালীর কবিমানসকে যে রূপ দিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে লোকাতীত রহস্যের আভাস। অনির্বচনীয়ের আস্বাদে অন্তর সেখানে উন্মুখ ও প্রত্যাশী, জীবনের প্রতিদিনের সংগ্রাম ও প্রচেষ্টাকে অতিক্রম করে প্রশান্তির মধ্যে আত্মবিস্মরণ। বাঙলার পূর্বাঞ্চলের প্রকৃতি ভিন্নধর্মী। পূর্ব বাঙলার নিসর্গ হৃদয়কে ভাবুক করেছে বটে, কিন্তু উদাসী করেনি। দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরের অভাব সেখানেও নাই, কিন্তু সে প্রান্তরে রয়েছে অহোরাত্র জীবনের চঞ্চল লীলা। পদ্মা-যমুনা-মেঘনার অবিরাম স্রোতধারায় নতুন জগতের সৃষ্টি ও পুরাতনের ধ্বংস।

এই কথাগুলি আল মাহমুদের তথা বাংলাদেশের কবিতা ও সাহিত্য সম্পর্কে প্রযোজ্য। আল মাহমুদের কবিতায় অবিশ্রাম যে-জীবনের উৎসার ও সংঘর্ষ, তা আসলে এই ভূখণ্ডেরই বিশিষ্টতা।

কবি-মনীষী হুমায়ুন কবিরই পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মধ্যেকার এই মৌল পার্থক্য আবিষ্কার করেছিলেন। স্পেনীয় কবিতায় ঠিক অনুরূপ পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন কোনো-কোনো সমালোচক কাস্তিল ও আন্দালুসীয় কবিদের মধ্যে—কাস্তিলের কবিবৃন্দ অপেক্ষাকৃত রুক্ষ, কর্কশ, পৌরুষময়; আর আন্দালুসীয় কবিরা কোমল, পেলব, নারীত্বময়। আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন, আমাদের প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'বিদ্রোহী কবি' হিশেবেই সর্বজনপরিচিত বটে, কিন্তু বাংলাদেশে তথা পূর্ববঙ্গে বহুবার সফরে এসে তিনি যে-সব কবিতা লিখেছেন তার একটিতেও দ্রোহ ঘোষণা বা সংগ্রামের চিহ্নমাত্র নেই—তা কেবলি নারী আর নিসর্গের বন্দনায় উন্মুখর?

www.pathagar.com

"বাংলার কাব্য" হুমায়ুন কবির লিখেছিলেন দেশবিভাগের আগে, দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয় দেশবিভাগের পরে। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় (আষাঢ় ১৩৬৫) 'রাষ্ট্রবিভাগের বাধা-বন্ধন অতিক্রম করে বাঙালীর কাব্য-সাধনার ঐক্য ও ধারাবাহিকতা'র প্রসঙ্গ তুলেছিলেন হুমায়ুন কবির। সেই ঐক্য ও ধারাবাহিকতা নিশ্চয় আছে—অচ্ছেদ্যভাবেই আছে। কিন্তু দেশবিভাগের পরে তো বটেই, আগেও ("বাংলার কাব্য" দেশবিভাগের আগেই লিখিত) বাঙালি-মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন বলেই হুমায়ুন কবির তাঁর বইয়ের ষষ্ঠ ও শেষ অধ্যায়ে 'হিন্দু মধ্যবিত্তে'র পাশে 'মুসলমান মধ্যবিত্ত'কে আলাদাভাবে বিশদ বিচার করেছেন। কাজেই মুসলিম মধ্য-বিত্তের সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্যের প্রসঙ্গও অনিবার্য এসেছে। বস্তুত দেশবিভাগের পরবর্তীকালেরই নয়, প্রাক্তন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিচারে বাঙালি-মুসলমানের স্বতন্ত্র সাহিত্যসাধনা যে-কারো চোখে পড়বে। আল মাহমুদের পূর্ণাঙ্গ কাব্যবিচার যেদিন হবে, সেদিন এসব প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবেই বিশ্লেষিত হবে—কেননা তাঁর মধ্যে এইসব স্রোত-প্রতিস্রোত কাজ করে যাচ্ছে।

আল মাহমুদের কবিতার চিরকালের অনন্য চারিত্র : দেশজতা; কিন্তু দেশজতা মানে কেবল মাটির আঘ্রাণ নয়—মানুষের প্রতিবিম্বন। আল মাহমুদের কবিতায় এখন এই দুয়ের অপরূপ মিশেল ঘটেছে। যেন কোন আশ্চর্য স্বজ্ঞাবলে—যেখানে প্রয়াসের কোনো স্বেদচিহ্ন নেই—তিনি জসীম-উদ্‌দীন আর ফররুখ আহমদের সারাৎসার শোষণ করে নিয়েছেন নিজের আত্মায়। জনতা ও জনপদ—দুইকেই যেন দুই বাহু দিয়ে আগলে রেখেছে তাঁর কবিতা। অথচ এসব কোনো চীৎকৃত শ্লোগানের মধ্য দিয়ে নয়—একটি নির্ভার গানের মতো উৎসারিত। এর উৎসস্থল আল মাহমুদের নিহিত কবিস্বভাব। আল মাহমুদ যখনই কবিতা লিখতে বসেন, তখনই তাঁর মধ্যে নিঃশব্দে বিকশিত ও মুঞ্জরিত হয় তাঁর নিহিত নারীসত্তা। বিনতি, সমর্পণ, পেলবতা, নম্রতা, চারুতা—এসবেই তৈরি হয়েছে তাঁর শাশ্বত মৌচাক : তাঁর গোপনতম, নিঃশব্দতম, মধুরতম নারীসত্তা। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে আল মাহমুদ যতো বাহাসই করুন, এই অভেদ্য শিল্পসত্তাই আজ-পর্যন্ত তাঁকে দুর্গের মতো রক্ষা করেছে। কিছুদিন আগে এক তরুণ কবির কবিতাগ্রন্থ আলোচনা করতে গিয়ে খানিকটা আকস্মিকভাবেই আল মাহমুদ তাঁর ভাষণে নিজের সম্পর্কে বলেন, 'জন্ম-রোমান্টিক'। আমার তখনি মনে পড়ে গিয়েছিলো রবীন্দ্রনাথের

www.pathagar.com

কথা, যিনি বৃদ্ধ বয়সে তদানীন্তন তরুণ কবিদের মতো সমাজ-জাগর গদ্যাক্রান্ত কবিতা লিখতে-লিখতেই সমস্ত পারিপার্শ্বিকতা ফাটিয়ে সহসা বলে উঠেছিলেন, 'আমি জন্ম-রোমান্টিক'। রবীন্দ্রনাথের এই আকস্মিক সত্যোচ্চারণে কবিতারই জন্মোৎস আলোকিত হয়ে উঠেছিলো সেদিন। কবি মাত্রেই রোমান্টিক, জন্ম-রোমান্টিক, তা না হলে কবিতা কেন। এমনকি বাস্তবাদী, সাম্যবাদী, শ্রেণী-সংগ্রামী কবিরাও জন্ম-রোমান্টিক। তবে তাদের রোমান্টিকতা আলাদা জিনিশ—শ্রেণী-সংগ্রামীদের রোমান্টিকতাকে এরিখ মারিয়া রেমার্ক যথার্থই চিহ্নিত করেছিলেন 'Romanticism of the Un-Romantics' বলে। আল মাহমুদ প্রকৃতার্থে রোমান্টিক—সর্ব সময়েই রোমান্টিক—রোমান্টিকতা তাঁর ঢাল এবং একই সঙ্গে রোমান্টিকতা তাঁর তলোয়ার।

'জন্মদিন' কবিতায় জন্মভূমির মৃত্তিকাকে স্মরণ করেছেন কবি তাঁর জন্মদিনে। মাটির সঙ্গে এই কবির সম্পর্ক প্রায় গাছের সঙ্গে তার শিকড়ের মতো। এই উপমাও তাঁরই দ্বারা প্রযুক্ত। এই কবিতাতেই নিজের বর্ণনা দিয়েছেন তিনি : 'কদম্বের কাণ্ড যেন নদীর কিনারে।' (দশ বছর আগে আল মাহমুদের কবিতা প্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম : 'তাঁর কবিতার গ্রামীণতার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি ও তাৎপর্যবান ও উপকারী এই নতুন আলিঙ্গনকারী আধুনিকতা'। 'জন্মদিন' কবিতায় জন্মভূমির মৃত্তিকাকে সম্বোধন করে কবি আসলে তো কথা বলেছেন নিজের সঙ্গেই। ভিতরে-ভিতরে বৈপরীত্যকে ধারণ করেছেন কবি দুই মুখোমুখি দর্পণের মতো : একদিকে জন্মদিনেই জেগেছে মৃত্যুভাবনা : 'অপেক্ষায় বসে আছে যম; চোখের মণির মধ্যে মরে পড়ে আছে দুটি সোনার মৌমাছি।' অন্যদিকে জন্মগ্রামের সমুখে এসে দাঁড়িয়েছে 'নগরদর্পণ'। ঝিঁঝির ঝংকার, পুদিনার ঝোপ, চুড়ি, হাঁড়ি, ভিটেবাড়ির গ্রামীণ চিত্রণের চেয়ে —আমি বলতে চাই—এখানে অনেক বেশি মূল্যবান কবির ভাবনার ভাস্কর্য।) জন্মভূমির মৃত্তিকাকে সম্বোধন করে লেখা এই কবিতায় যেন একটি সজল অব্যক্ত কারুণ্য সমুপস্থিত। 'মাটি-পৃথিবীর টান' (জীবনানন্দের শব্দগুচ্ছ) তাঁর এমনই নিবিড়-গভীর যে যখনই তাঁর জন্মভূমি আক্রান্ত-আলোড়িত হয়েছে বা হতে পারে তখনই তাঁর শিরা-উপশিরাময় বেজে উঠেছে একটি আর্ত ঝংকার। বন্যায় দেশ যখন ডুবে যাচ্ছে, তখন তাঁর প্রার্থনা কেবল'·····আমাকে শুধু দাও একটু ভাসার সাহস।' ('পানির মারণ') বাংলাদেশের প্রকৃতি বদলে যাচ্ছে, ঘটছে

www.pathagar.com

মরুভূমির বিস্তার, সবুজের সংহার, খরার আক্রমণ, উবে যাচ্ছে সমস্ত সজলতা আর কোমলতা : এই ব্যথা প্রকৃতির এই কবিকে তো স্পর্শ করবেই : '···· পাখির কান্না আমি আর সইতে পারছি না/মাছের মর্মবেদনা পানির সাথে বিষের মত মিশে আছে। ···· ' ('আত্মসংহারের গান') এই কবিতায় পাখির ঠোঁট একটি নগ্ন তরবারিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। 'কদর রাত্রির প্রার্থনা' কবিতায় তিনি লক্ষ্য করেছেন,'····· মাতৃভূমিকে পেঁচিয়ে আবর্তিত হচ্ছে/এক কুটিল অন্ধকার।' একদিকে প্রকৃতির মার, অন্যদিকে রাজনৈতিক আগ্রাসনের বিবর দেখে তাঁর ব্যাকুল মোনাজাত আল্লার দরবারে : '····তুমি যেন আমাদের ধ্বংস করে দিও না।' আপনারা লক্ষ্য করবেন এই অলংকার-চঞ্চল কবি এখানে স্পষ্ট, নিরাভরণ, একলক্ষ্য।

আল মাহমুদের প্রেমের কবিতায়—কবি এখন উত্তরপঞ্চাশ বলেই কিনা জানি না—তাঁর আগেকার প্রেমকবিতার সংরাগী তীব্রতা নেই। মনে হয় কবি প্রেমের শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু প্রেমের তৃষ্ণা জেগে রয়েছে, আর যা আছে তা হচ্ছে অভ্যাসের অনুবর্তন। আল মাহমুদের চিরকালের কবিতায় প্রেম যতোটা আছে, তার চেয়ে বেশি আছে নারী। প্রেমিকতার চেয়ে সম্পূর্ণ নারীত্বই তাঁকে চিরকাল আকর্ষণ করেছে। আর সে-নারীত্বে প্রেমের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে কামনা। নিষ্কাম প্রেমের কবিতা, মর্মচ্ছেদী বিরহের কবিতা, দিগন্তভেদী প্রিয়া-হারানোর ব্যথার কবিতা আল মাহমুদ কখনো লেখেননি। আল মাহমুদের বহু কবিতা গার্হস্থ্য প্রেমের কবিতা। জীবনানন্দের মতো কবি, যিনি ছিলেন একান্ত নিরীহ নিবিরোধী অধ্যাপক ও ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী, তিনিও একবার লিখেছিলেন, 'অবৈধ সংগম ছাড়া সুখ নেই।' অবশ্য এ লাইন তিনি লিখেছিলেন এ-যুগের মূল্যবোধের অবক্ষয় বোঝাতেই, কেননা এর আগের বা পরের লাইন (এই মুহূর্তে তাঁর বই হাতের কাছে নেই) : 'অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ নেই।' আল মাহমুদের কবিতায় অবৈধ সংগমের সুখ সম্প্রচারিত হয়নি, কিন্তু তাঁর কবিতায় আছে সরল বলিষ্ঠ যৌনতা। লক্ষণীয়, আল মাহমুদের প্রেমের কবিতায় প্রায় সব সময়ই আছে কামের মিশেল। আল মাহমুদের সাম্প্রতিক কবিতায় নারীপ্রেম আর দেশপ্রেম একটি রেখায় এসে মিলেছে, যার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ 'এক সুহাসিনী বোনের জন্য'। ('সোনালি কাবিন' সনেটপরম্পরায়ও নারী আর দেশপ্রেম যুক্ত ছিলো, নারীকে তিনি সেখানেও আহ্বান করেছিলেন তাঁর আরাধ্য আদর্শিক পরিপ্রেক্ষিতে তবু

www.pathagar.com

সেখানে পাত্রী আর পটভূমির মধ্যে একটি ব্যবধান ছিলো, 'এক সুহাসিনী বোনের জন্য' কবিতায় সেই ব্যবধানও বিলুপ্ত।) এখানে সুহাসিনী নারীই স্বদেশ, এবং স্বদেশই প্রিয়তমা। প্রিয়তমা দেশ-নারীর বর্ণনায় কবি জানিয়ে দিচ্ছেন তার মধ্যে 'অদম্য স্বাস্থ্যের দ্যুতি বিচ্ছুরিত।' কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, আমাদের দেশের মেয়েরা কি এতোই সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী?—সেক্ষেত্রে আমাদের জবাব হবে : কবিতা বস্তুবাদীদের জন্যে নয়। আল মাহমুদের এই কবিতায় নারী (বা কামরুল হাসানের চিত্রকলার সুঠাম স্বাস্থ্যবতী বাঙালি নারীদের ক্ষেত্রেও) এসব প্রসঙ্গ অবান্তর। শিল্পী বা কবির কল্পনার সত্য বাস্তব সত্যের চেয়ে সত্যতর। অযোদ্ধা নয়, কবির মনোভূমিই রামের জন্মস্থান। কবিতার শেষ স্তবকে দেশ আর প্রিয়তমা নারী এক হয়ে মিলেমিশে গেছে :

> কৃষ্ণা সে। কিন্তু আমার দেশ তা যত কালোই হোক।
> কেশদামে কি উদ্দাম আর রুক্ষ সে। হোক, তবুও উত্তর বাংলার গুল্মের মতই সে পানির পিয়াসী, বৃষ্টিপ্রার্থিনী দেশ আমার। কী শীতল পয়োধরা সে। তবুও এই পর্বত আর পাথরহীন প্রান্তরে তার উপত্যকাই তো শত সন্তানের আশ্রয়। তার বক্ষস্থল বিপ্লবের ধাত্রী।

বরাবরের মতো আল মাহমুদ এই কবিতাগুচ্ছেও ঐহিক—প্রবলভাবেই ঐহিক। একটি বিশ্বাস হয়তো কোথাও দানা বেঁধেছে ("আরব্য রজনীর রাজহাঁস" কাব্যগ্রন্থের 'ডাক' কবিতার শেষ স্তবক স্মরণীয় : 'ভাগ্যেরও অদৃশ্যে বসে যিনি/ঠিক রাখে আত্মার বাদাম/আমি ঠিক চিনি বা না চিনি/তারই প্রতি অজস্র সালাম।' কিন্তু আল মাহমুদ ধার্মিক বা আধ্যাত্মিক কবি নন। বরাবর যেমন ছিলেন আল মাহমুদ আজো তেম্নি জীবনপ্রেমী কবি। প্রথম জীবনের নৈরাশ্য থেকে হয়তো তিনি এতোদিনে একটি বিশ্বাসে উত্তীর্ণ হয়েছেন। হয়তো। আল মাহমুদের বিশ্বাস খাঁটি কিনা জানি না, কারো পক্ষেই জানা সম্ভব নয়, অনেকে সন্দেহ করেন, আমাকেও খানিকটা তাদের দলে ফেলতে পারেন, কিন্তু— আমার বিবেচনায়— সেজন্যেই আল মাহমুদের কবিতা খাঁটি হয়েছে। কবিতাবহির্ভূত বিশ্বাস থেকে খাঁটি কবিতা লেখা কঠিন। মাহমুদের ঘোষিত কাব্যবিশ্বাস আর তাঁর কবিতা সব সময় একাত্ম নয় বলেই তাঁর হাত থেকে নানা ধরনের বিস্ময়কর কবিতা নিষ্ক্রান্ত হয়েছে। আজো হচ্ছে। আল মাহমুদের স্বভাব হচ্ছে এক

www.pathagar.com

ধরনের কবি বা শিল্পীর স্বভাব—যখন যা বলেন, তীব্রভাবেই বলেন। (আমি তো মনে করি এই তীব্রতাই শিল্পীর স্বভাব বা চারিত্র। অতীব্র শিল্প আমি তো দেখি না। তীব্র শিল্পী হিশেবে কবি নজরুল ইসলামের কথা তো সকলেরই মনে পড়বে। অতীব্র বা মৃদুতার শিল্পী হিশেবে কেউ হয়তো নাম করবেন কবি রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু রবীন্দ্রচারিত্রের গভীর পর্যবেক্ষণে কী পাই আমরা?—যিনি জীবনে পিতা-মাতা-স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মৃত্যুশোক সহ্য করেছেন, তিনিই লেখেন, 'যা দেখেছি, যা পেয়েছি, তুলনা তার নাই।' কিংবা 'আমার মতে জগৎটাতে ভালোটারই প্রাধান্য/মন্দ যদি তিনচল্লিশ, ভালোর সংখ্যা সাতান্ন।' আমার বিবেচনায়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম লেখক লেভ্ তলস্তয়-এর কথাও স্মরণযোগ্য : লেখক হিশেবেও তিনি তীব্রতম।) আল মাহমুদের মধ্যেও এই তীব্রতা উজ্জ্বল রেখায় দীপ্যমান চিরকালই। "সোনালি কাবিন"-এর কবির কথা মনে না-পড়া অসম্ভব। তখন আল মাহমুদ এইরকম জোরের সঙ্গেই শ্রেণীসাম্যের কথা বলতেন—এখন যেমন্ জোরের সঙ্গে তাঁর ধর্মবিশ্বাসের কথা রাষ্ট্র করেন। কিন্তু আল মাহমুদের কবিতা এসব বিশ্বাসকে—পাশ কাটিয়ে নয় অবশ্য, কেন্দ্রে রেখেই—অন্য জায়গায় উত্তীর্ণ হয়েছে। আমাদের ধারণার কথা বলেছি : সেটাই ভালো হয়েছে। শিল্পী বা কবির ধর্মবিশ্বাস বা রাজনৈতিক মত-বাদকে শিল্প বা কবিতা যখন অতিক্রম করে, তখনই আসলে সে তার যথাস্থানে পৌঁছোয়। শিল্পীর স্বধর্মই তাঁর আচরিত ধর্ম বা রাজনৈতিক মতবাদের চেয়ে বড়ো জিনিশ। যতোক্ষণ তা হচ্ছে, ততোক্ষণ শিল্প মার খায় না। আল মাহমুদ এখনো অপরাজিত কবি, অনাক্রমণীয় কবি—এখানেই তাঁর জিৎ। তাঁর মৌখিক বাক্যে ও গদ্যরচনায় আল মাহমুদ যে-বিশ্বাসের কথা সম্প্রচার করেন, তা তাঁর কবিতার—পশ্চাদপট। কিন্তু পশ্চাদপটই—সম্মুখপট নয়। সম্মুখপট তাঁর কবিতা—শিল্পিত কবিতা। কিন্তু তাই বলে আবার পশ্চাদপটকে মূল্যহীন বলা হচ্ছে না। অন্তত আল মাহমুদের ক্ষেত্রে তো নয়ই। কেননা তাঁর কবিতার জন্যে সব সময়ই পশ্চাদপটের প্রয়োজন হয়েছে। এই কবিতাগুচ্ছে নেই, কিন্তু আল মাহমুদেরই অন্য কোনো-কোনো কবিতায়, কখনো-কখনো বৌদ্ধ ঐতিহ্যের ব্যবহার রয়েছে। রবীন্দ্রনাথে, সুধীন্দ্রনাথে, জীবনানন্দে বৌদ্ধ ভাবনা-বেদনা কেন্দ্রাশ্রিত। আল মাহমুদ, যিনি একটি গাছের মতো মাটির সঙ্গে সংবদ্ধ, যিনি বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার মানুষ, তাঁর পক্ষে এই ঐতিহ্যের পরিগ্রহণ

www.pathagar.com

ও প্রয়োগও একান্ত স্বাভাবিক। আল মাহমুদ কবিতা যখন লেখেন তখন সব সময় তাঁর বিশ্বাসে স্থিত থাকেন না;—ভাগ্যিশ থাকেন না, আজো থাকেন না। কবিতা এক অনাক্রমণীয় স্বজ্ঞার অর্দ্ধচেতন উৎসারণ– তাকে রুখতে বা ঢাকতে যাওয়া অনুচিত। আল মাহমুদ এই অনুচিত কাজটি করেননি, কবিতাকে স্ব-সমুত্থিত হতে দিয়েছেন, সেটাই ভালো হয়েছে। এর ফলেই বহু বিপরীতকে আজো তিনি আলিঙ্গন করেন। 'দূরদৃষ্টি' কবিতায় যে-নারীকে তিনি একসঙ্গে সবটাই দেখতে চান, তা কেবল অন্তর্দৃষ্টিবলেই সম্ভব। আল মাহমুদ এখন আর কেবল দৃশ্যের দ্বারাই তুষ্ট হতে চাচ্ছেন না—তিনি-যে দৃষ্টির আড়ালেও বিহার করতে চাচ্ছেন কবিতাটি তার সাক্ষ্য। ইনিই সেই কবি, যিনি একদিন অনেকখানি নির্ভর করেছিলেন দৃশ্যপায়ী লোচনের উপরে। বোঝা যায়, কবির বয়স বাড়ছে। অন্য একটি কবিতাতেও ('একচক্ষু হরিণ') এই অন্তর্দৃষ্টির কথা আছে। 'অন্তরচক্ষু'কে সম্বোধন করেই, এই কবিতায় কিছু কথা বলা হয়েছে—এবং অন্তশ্চক্ষু বলেই এই চোখ 'শ্রবণেন্দ্রিয়ের মত শুষে নেয় শব্দ' আর এ 'ভুলে যাওয়া প্রতিটি ধ্বনির দ্রাবক'। কয়েক বছর আগে আল মাহমুদের একটি কবিতায় মৃত্যুর প্রবেশ দেখে আমার মন খারাপ হ'য়ে গিয়েছিলো; ভেবেছিলাম,'কবি এখনি কেন মৃত্যুর কথা ভাবছেন?' 'ছিদ্রান্বেষণ' কবিতায় আবার দেখলাম মৃত্যুর পরাক্রম। কিন্তু এখন যেন আমি তাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারি। উত্তরপঞ্চাশে এসে মাঝে-মাঝে মৃত্যুচিন্তা আসতেই পারে। আর, যিনি কবি, তিনি তাঁর সংবেদনে সব-কিছুকেই গ্রহণ করবেন না কেন? তবে, আল মাহমুদ শেষ-পর্যন্ত মৃত্যুচিন্তিত কবি নন, জীবনের পক্ষেই দরজা ধরে থাকেন। হ্যাঁ, মানবমনই তাবৎ (বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি) সৃষ্টিশীলতার উৎস। 'কবিতা ও জীবন একই জিনিশের দু'রকম উৎসারণ।' (জীবনানন্দ) কবিতাও এক সৃষ্টিশীলতা—মানবমন যার উৎস। আবার মানবমন হচ্ছে সেই জিনিশ—যেখানে বহির্জীবন অবিশ্রাম সংমিশ্রিত ও কেলাসিত হচ্ছে। কবি ঐ প্রমুক্তির কবি।

আল মাহমুদ একদিন লিরিকে বাদিত হয়েছিলেন—আজো লিরিক তাঁকে ছেড়ে যায়নি। তবু সুন্দর শব্দ আর ধ্বনিময় ছন্দ কি কবিতাকে বিপথগামী করে না কখনো-কখনো, হয়তো গদ্যকবিতায় বক্তব্যকে আরো ঠেঁশে মনোমতো করে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। মধ্যপর্যায় থেকে আল মাহমুদ তাঁর নিজস্ব ধরনে গদ্যকবিতা লিখে আসছেন। "মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো"

www.pathagar.com

থেকে এর সত্যিকার সূচনা। লক্ষণীয়, প্রায় তখন থেকেই আল মাহমুদ গদ্যকর্মেও নিবিষ্ট হয়ে ওঠেন। তাঁর এই ধরনের গদ্যকবিতায় অনেক সময় কাহিনীরেখা থাকে একটুখানি। এটা ঠিকই, আল মাহমুদের কবিতা সাধারণত ছন্দে ন্যস্ত ও নিবিড়, তবে তাঁর গদ্যকবিতাও তাঁরই ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত। বিষ্ণু দে সমর সেনের কাব্যালোচনা করতে গিয়ে একদিন যথার্থ-ভাবেই চিহ্নিত করেছিলেন গদ্যছন্দ চলে প্রত্যেক কবির 'ব্যক্তিগত চালে'। সেদিক থেকে প্রত্যেক কবির গদ্যছন্দ তাঁরই নিজস্ব স্বকীয়তার ছাঁচে তৈরি হয়। আল মাহমুদের গদ্যকবিতাও তাঁরই ব্যক্তিত্বের দ্বারা রঞ্জিত ও স্বাক্ষরিত। গদ্যকবিতা এখন তিনি প্রায়ই লিখছেন। এবং এই গদ্যকবিতায় তাঁর প্রেম ও দেশভাবনার মতো বিরোধী জিনিশও সমানে জায়গা করে নিচ্ছে। 'কদর রাত্রির প্রার্থনা' কবিতায় আল মাহমুদ জানিয়েছেন যে তিনি ওয়াকিফহাল 'প্রতিটি শব্দের জ্ঞাত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ।' আর কবিকে জানতে হয় শব্দকে কখন-কোন্ অর্থে-কোথায় প্রয়োগ করতে হয়। ঐ কবিতাতেই আল্লা-কে কবি সম্বোধন করছেন 'হে অনুকম্পার মহান প্রতিনিধি' বলে কিংবা শবে-কদর রাত্রি-কে আখ্যায়িত করছেন 'মহাযামিনী' বলে। 'ডাকাত, ছিনতাইকারী, পণ্ডিত ও বেশ্যা' শব্দগুচ্ছকে অনায়াসে পাশাপাশি বসিয়ে দেওয়াতেই আমাদের সমকালীন সামাজিক ক্লেদ মুহূর্তে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়। 'হিংস্র পাখি', 'জ্বলন্ত মেঘ' ('আত্ম-সংহারের গান')—এরকম বিশেষণ প্রয়োগ আল মাহমুদ কখনো করেছেন কি?—সময়ই করিয়ে নিচ্ছে। তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থে ("লোক-লোকান্তর") হয়তো নৈরাশা ছিলো—সে অনেকখানি ব্যক্তিগত বিষাদ ও নৈরাশা। এখন যে-নৈরাশা তা সামাজিক বিষাদ ও নৈরাশা। ঐ দুই নৈরাশার মধ্যে কয়েকটি দশক পার হয়ে গেছে কবির আত্মার ভিতর দিয়ে। 'পাখির কান্না', 'মাছের মর্মবেদনা'র মতো ভাষাও তো তাঁর অজ্ঞাত ছিলো। ('আত্মসংহারের গান') 'নদী' ও 'নৌকো' তো আল মাহমুদের কবিতার উপর্যুপরি দুই শব্দ। 'ঠিকানাহীন নাওয়ের ভাসান' কবিতায় দুই 'কামের কবুতর', দুই নারী-পুরুষ, চরমভাবে যৌনাকৃষ্ট হয়েও পরস্পরে উপগত হয় না, বিবেক এসে তাদের উদ্ধার করে। আবার 'ছিদ্রান্বেষণ' কবিতায় মানবশরীরকে তাঁর মনে হয় 'ছিদ্রে ভরা নাও'। এই জীবন ও মৃত্যুর বর্ণনার দুই বিরোধী প্রসঙ্গেই নৌকো ভেসে যায়। তাঁর কবিতার বিষয় থেকে তাঁর কবিতার আঙ্গিককে আলাদা করা যায় না। তাই 'এক সুহাসিনী

www.pathagar.com

বোনের জন্য' কবিতায় কবি যখন উৎপ্রেক্ষার পর উৎপ্রেক্ষা নির্মাণ করেন, তখন তারও প্রাসঙ্গিকতা দেশজতাতেই লিপ্ত ও মগ্ন থাকে :

মনে হল বাংলার আকাশ জুড়ে মালার মত উড়ে যাচ্ছে হাঁসেরা।
যেন বালিহাঁসের বোনেরা দল বেঁধে নামল মেদীর হাওরে,
শামুকের মাংসের পাশে জমে থাকা নির্মল বারির জন্য তৃষ্ণার্ত।
শৈবালের দামে চঞ্চু চুবিয়ে যারা তুলে আনে আহার্য।
পরিশ্রান্ত কিন্তু কলহাস্যমুখর আমার হ্রদবিহারিণী ভগ্নীরা,
কমলসরসীতে যেন খসে যাওয়া পদ্মের পাপড়ির ঢেউয়েরা।

'মীনার প্রান্তরে ইয়াসির আরাফাত' কবিতার শেষ পঙক্তিগুলোতে ক্রমাগত ছেদচিহ্ন যেন ইয়াসির আরাফাতের দৃঢ়প্রতিজ্ঞার পাথুরে প্রকাশের মতো মনে হয়।

এইসব আধ-বোঁজা কি পুরো-ফোটা ফুল যিনি আমাদের উপহার দিচ্ছেন, তাঁকে আমাদের হৃদয়াৎসারিত শুভেচ্ছা জানাই। শব্দ কি করে কবিতা হয়ে ওঠে, তা আমরা জানি না। কিন্তু এইসব কবিতা আমাদের যখন উত্তেজিত, আনন্দিত কি অভিভূত করে, তখন আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রণত হই এজন্যে যে তিনি আমাদেরই একজন সমসাময়িককে দিয়েছেন এমন ম্যাজিক-শক্তি যে তিনি অভিধানের ও প্রতিদিনের মৃত ও ব্যবহৃত শব্দকে আশ্চর্য কবিতায় রূপান্তরিত করেন জাদুকরের মতো সহাস্য কুশলতায়। এক টুকরো সামান্য রুমাল থেকে যে-আশ্চর্য কবুতরগুলি তিনি উড়িয়ে দিচ্ছেন, সুখের বিষয়, তা শেষ-পর্যন্ত ভোজবাজির মতো উবে যাবে না;—আমাদের কাব্যেতিহাসের আকাশে কিংবা কোনো পল্লবাচ্ছন্ন বৃক্ষশাখায় থেকে যাবে। এসব কবিতা পড়ে বুঝি, জীবনের অর্থহীনতার মধ্যেও ঘাসের সবুজ জ্বলছে; এসব কবিতা দেখে বুঝি, রাজনীতি আর অর্থনীতিই জীবনকে সম্পূর্ণ গ্রাস করতে পারে না; —জীবনেই আছে ভালোবাসার সাহস, সৌন্দর্য, শক্তি : 'ঝিঁঝির ঝংকার', 'স্তনের নুন', 'বালিহাঁসের বোনেরা', 'স্বপ্নের গিরিমাটি', 'ধলিমোর ঝাঁক,' 'স্পর্শের স্ফুলিঙ্গ থেকে উত্থিত ফোয়ারা,' 'চাঁদের ছুরি', 'আজানের আওয়াজের চূড়া'—অর্থাৎ অফুরান জীবনোৎসব।

আল মাহমুদের সাম্প্রতিক কবিতা তাঁর প্রাক্তন কবিতা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়,—তা এক ধারাবাহিকতারই মুঠো পিছলে-বেরিয়ে-বেরিয়ে-যাওয়া টুকরো, তা এক গ্রামের কিনার দিয়ে বয়ে-যাওয়া নদীর অংশ, তা

www.pathagar.com

একটি গাছের ফলভারে মৃত্তিকাচুম্বনকারী একটি ডাল। এইসব কবিতার শরীরে-অন্তরে আবহমান আল মাহমুদ উপস্থিত। "সোনালি কাবিন"-এর কবি কেন ওরকম নয় এরকম, অর্থাৎ পাঠক বা সমালোচকের ইচ্ছা-পূরক নয়—এসবের কোনো জবাব নেই। সৃজনের কোনো জবাবদিহি চলে না। কবি বা শিল্পীর স্বধর্মই চলিষ্ণুতা। তাঁর এই স্বাভাবিক পরিণামকে না-বুঝে যদি "ডাকঘরে"র মাধব দত্তের মতো আমরা অস্থির হয়ে উঠি, তাহলে আল মাহমুদের অধিকার আছে ঐ নাটকের ঠাকুর্দার মতো কড়া ধমক দিয়ে উঠতে, 'চুপ করো অবিশ্বাসী। কথা কোয়ো না।'

১৯৮৯

www.pathagar.com

আবু হেনা মোস্তফা কামাল: এক ঘণ্টার শিক্ষক

১৯৭৪-এর প্রথমদিকে চট্টগ্রাম থেকে আবু হেনা মোস্তফা কামালের একেবারে অভাবিত একটি চিঠি পাই জগন্নাথ কলেজের ঠিকানায়। অভাবিত একেবারে—কেননা স্যারের সঙ্গে আমার কোনোরকম যোগাযোগই ছিলো না। আমি তখন জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক। আমার যা-কিছু চিঠিপত্র আসে, আসে বাড়ির ঠিকানায়। কাজেই কলেজের ঠিকানায় চিঠি পেয়ে একটু অবাকই হই। চিঠি খুলে আরো অবাক। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে যোগদানের আহ্বান। বাংলা বিভাগের প্রধান তখন ডক্টর আনিসুজ্জামান। চিঠিতে উল্লেখ, তাঁরই নির্দেশে এই পত্র।

বলা বাহুল্য, আমি খুব খুশি। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। জগন্নাথ কলেজে আমার বিভাগীয় প্রধান (মরহুম) আলী আসগর ভূঁইয়ার সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। উনি বারণ করেন। আমার আব্বা বারণ করেন। অধিকাংশই বলেন যেতে। আমি আবাল্য সাহিত্যনিবিষ্ট—কবিতা-গল্প-উপন্যাস লিখতে আমার যতো ভালো লাগে, আর-কিছুতে তা লাগে না; আমার তাবৎ অনুভূতি-অভিজ্ঞতা-ভাবনা-ধারণা-চেতনা-অনুচেতনা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে আমি যতো আনন্দিত হই, অন্য-কিছুতে তা হয় না। আর তার জন্যে, সাহিত্যচর্চার জন্যে, ঢাকায় থাকা দরকার। পৃথিবীর সব দেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি তার রাজধানীতেই বিকশিত হয়। অনেক ভেবেচিন্তে, আমার আর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করা হয়নি।

কিন্তু আমার দুই অধ্যাপক ডক্টর আনিসুজ্জামান আর ডক্টর আবু হেনা মোস্তফা কামালের—আমার প্রতি ঐ দাক্ষিণ্যের কথা আমি ভুলিনি। এম্নিতে এঁদের সঙ্গে আমার কোনোরকম যোগাযোগ ছিলো না। আমি ছিলাম সাহিত্যেই নিমগ্ন—এবং কেবল সৃষ্টিশীল সাহিত্যেই নয়, মননধর্মী রচনায়, গবেষণায়ও। কিন্তু এঁরা—জাত-শিক্ষক—নিশ্চয় আমার প্রাবন্ধিক গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডের প্রতি নজর রেখেছিলেন, এবং আমাকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আহ্বান করে আমার কর্মের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। আমাদের এই কৃপণতা, সংকীর্ণতা, জটিলতা, বাজে-প্রতিযোগিতার দেশে আমার শিক্ষকদের এই উদারতা আমি চিরকাল স্মরণ করবো।

www.pathagar.com

ডক্টর আনিসুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পুরোপুরি চার বছরেরই শিক্ষক। কিন্তু আবু হেনা মোস্তফা কামাল? হ্যাঁ, হেনা স্যার আমার মাত্র এক ঘণ্টার শিক্ষক। এক ঘণ্টারও পুরো নয়, চল্লিশ বা পঞ্চাশ মিনিটের একটি পিরিয়ডের শিক্ষক। এম. এ. তে ঐ একটিমাত্র ক্লাস তিনি আমাদের নিয়েছিলেন। এবং একটি মাত্র ক্লাসেই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জয় করে নিয়েছিলেন। তাঁর সেদিনকার বিষয় ছিলো জসীমউদ্‌দীন।

তারপর আবু হেনা মোস্তফা কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে পারেননি আর—অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ও দেশের বাইরে থেকেছেন। অবশ্য সর্বত্রই, সসম্মানে। আবু হেনা মোস্তফা কামালের একটি জিনিশই ছিলো —আত্মসম্মানজ্ঞান। আত্মসম্মান খুইয়ে জীবনে কিছুই তিনি অর্জন করেননি। অনেক ঘুরে, আবু হেনা মোস্তফা কামাল আশির দশকের সূচনায় আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহাল হন। এদিকে আমি, ১৯৮০ শালে গবেষণা ব্যপদেশে যাই কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফিরে এসেই, প্রকৃত, স্যারের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ ঘটে। সভা-সমিতিতেই দেখা হতো মাঝে-মাঝে। দু-একবার স্যারের বাসায় গিয়েছি। প্রথমবারই যে-সহৃদয়তায় তিনি আমাকে গ্রহণ করেন, তা কেবল প্রাচীনকালেই ছিলো বলে শুনেছি। প্রথম যে-দিন তাঁর বাসায় গিয়েছি, সেদিন তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুজিত মোস্তফাকে ডেকে গান শোনাতে বললেন। সুজিত হার্মোনিয়াম টেনে কয়েকটি নজরুল-সংগীত গাইলো। সে এখন ভারতে সংগীতে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করছে। আর-একদিন তাঁর বাসায় অনেকক্ষণ ছিলাম। একবার তিনি ভেতরে গেছেন একটুক্ষণের জন্যে। ফিরে এসে বললেন, 'আপনাকে বিমর্ষ মনে হ'লো। মন খারাপ না তো?' সত্যিই আমি তখন নানা কারণে মানসিকভাবে ভীষণ পীড়িত ছিলাম। কিন্তু আমার স্বভাবী সংকোচে আমি এড়িয়ে গেলাম, 'না—কিছু না' ব'লে। কিন্তু তীক্ষ্ণচক্ষু দরদী অধ্যাপকের উক্তিতেই একটি বরাভয় পেয়েছিলাম। তিনি ছিলেন না আমাদের অধিকাংশ অধ্যাপক বা লেখকের মতো আত্ম-প্রেমিক ও আত্মমুগ্ধ—যারা সারাক্ষণ নিজের কথাই সাতকাহন গাইতে অভ্যস্ত, কিংবা সহযোগী কারো বিপদের দিনে শতহস্ত দূরে থাকাই শ্রেয় জ্ঞান করেন।

এমনই আমাদের সমাজব্যবস্থা যে আবু হেনা মোস্তফা কামালের মতো অসাধারণ ব্যক্তিরও, ছাত্র ও অধ্যাপকেরও, ঢাকায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। তাঁর মতো গুণী ব্যক্তি জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

সফল হতে পারতেন। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় সে-সব ছেড়ে অধ্যাপকতার বৃত্তিকে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে রেডিওতে পুনঃপ্রচারিত এক আত্মকথায় আমরা জানলাম, কেন স্বেচ্ছায় তিনি অধ্যাপকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। কেন? না, ভালোবেসে। তাঁর দু'একজন স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শবান শিক্ষককে ভালোবেসে। এ-কথা তিনি নিজেই জানিয়েছেন। কিন্তু আমরা জানি পৃথিবী বিশাল আর মানুষ বিচিত্র, পৃথিবীতে সব-ধরনের উদাহরণই মওজুদ আছে। কোনো কিছু হয়ে-ওঠার প্রেরণা আমাদের অন্তরেই থাকে, বহির্জগৎ থেকে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত উদাহরণটিই বেছে নিই নিজের জন্যে, আমাদের বহির্জগতের মডেল আসলে আমাদের অন্তর্জগতের কাঙ্ক্ষণীয় মডেল। আবু হেনা মোস্তফা কামালের নিজের মধ্যেই ছিলো আদর্শ অধ্যাপক হয়ে ওঠার গুণাবলি, বাইরে তিনি তারই প্রতিরূপ খুঁজে 'পেয়েছিলেন' বলবো না—'নিয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন বহু গুণসম্পন্ন : গায়ক, গীতিকার, অধ্যাপক, কথক, প্রাবন্ধিক ও কবি। এসবের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সফল, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধি অর্জন করেছেন। ছিলেন এক সময় বেতারের তালিকাভুক্ত গায়ক। পরে প্রকাশ্যে অবশ্য তিনি গাইতেন না—কিন্তু, সকলেই জানেন, সংগীতে তাঁর ছিলো নাড়ির টান। গীতিকার হিশেবে আমাদের মধ্যে সম্ভবত তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ : সে-ক্ষেত্রে তাঁর কবিপ্রতিভা ও সংগীত-প্রতিভার একটি চারু সমন্বয় ঘটেছিলো; সম্ভবত আমাদের গীতি-কারদের মধ্যে সংগীতশাস্ত্র সম্বন্ধে অমন ওয়াকিফহাল আর কেউ ছিলেন না; আর গীতি রচনায় তাঁর অচ্ছেদ্য রোমান্টিকতার সঙ্গে মিলন ঘটেছিলো তাঁর স্বভাবী সুমিতির। অধ্যাপক হিশেবে তাঁর সাফল্য সম্পর্কে তাঁর অসংখ্য ছাত্রের যে-কেউ সাক্ষ্য দিতে পারবেন। আমি তাঁর একটিমাত্র ক্লাসের ছাত্র—ঐ একটি ক্লাসেই বুঝেছিলাম তাঁর অসাধারণ অধ্যাপকতার গুণ। সুন্দর বাচনভঙ্গি, যথার্থ শব্দপ্রয়োগ, শব্দ ও বাক্যের উপরে কণ্ঠস্বরের যথাযথ উৎক্ষেপণ—এসব তো আছেই; কিন্তু তার সঙ্গে আলোচিত বিষয়ের উপরে প্রভুত্বই বড়ো কথা, তার ফলেই সম্ভব হয় সীমিত সময়ের একটি পিরিয়ডে একটি বিষয়ের সারাৎসার উপস্থাপন। বাগ্মী নয়, তাঁকে বলবো আমি কথক। কথকতার জাদু তাঁর এমনই স্বায়ত্ত ছিলো যে আমাদের স্বল্প টি. ভি. ব্যক্তিত্বদের মধ্যেও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় ও বিকল্পহীন—যিনি সাহিত্য, সংগীত বা সংস্কৃতি সম্বন্ধে সার-কথা সাধারণের গ্রহণযোগ্য ও উপভোগ্য

www.pathagar.com

রূপে উপস্থাপন করতে পারতেন। আর তা ছিলো এমনই সঞ্চারী যে তাঁর রচিত কবিতা ও গদ্যকর্মের ভোক্তার চেয়ে তাঁর টি. ভি.-রেডিও-ভক্ত শ্রোতা-দর্শকের সংখ্যা অনেকগুণে বেশি। স্বভাবেই তিনি ছিলেন কথক; আড্ডায় ও সভাস্থলে সমান পারঙ্গম, এমন ব্যক্তি তো দেখি না আর; সৈয়দ আলী আহসান জনসমক্ষে হয়ে ওঠেন অসম্ভব বাক্‌কুশলী, যে-কোনো আড্ডায় বেলাল চৌধুরী হয়ে ওঠেন মধ্যমণি; দুই ক্ষেত্রেই অসাধারণত্ব দেখাতে পারতেন একজনই—আবু হেনা মোস্তফা কামাল। আবু হেনা ছিলেন স্বভাব-কথক, রেডিও-টিভি-সভাস্থলে তিনি ছিলেন উপস্থাপক, আর এস্নিতে আড্ডা দিতে তাঁর জুড়ি ছিলো না, কথা বলতে ভালোবাসতেন। আর তাঁর যে-কোনো তুচ্ছ কথার মধ্যেও এমন চারুতা, রম্যতা, রসিকতা, বুদ্ধির দীপ্তি ঠিকরে পড়তো যে, বিমুগ্ধ অনুমোদন ছাড়া শ্রোতার আর-কিছু করার থাকতো না। আর যখন আমাদের অধিকাংশ বয়োজ্যেষ্ঠ লেখকের রচনা দিন-দিন বিবর্ণ, রঙ-চটা, প্রাণহীন হয়ে উঠছে—তখন আবু হেনা মোস্তফা কামালের গদ্য ও কবিতায়, তাঁর দীর্ঘকালীন অনুপস্থিতি সত্ত্বেও, কখনো জং ধরেনি। মাত্র তিনটিই কবিতাগ্রন্থ তাঁর, মাত্র দুটি প্রবন্ধগ্রন্থ—কিন্তু তার মধ্যেই তাঁর চারিত্র চিহ্নিত আছে অটুটভাবে। কবিতায় তিনি বরাবর রোমান্টিক, অচ্ছেদ্যভাবে রোমান্টিক, নারী তার কেন্দ্রমর্মে প্রতিষ্ঠিতা; শেষ কবিতাগ্রন্থেরও তাই, কেবল শেষ কবিতাগ্রন্থে ও অগ্রন্থিত শেষ কবিতাগুচ্ছে মৃত্যুর পদচিহ্ন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে উপর্যুপরি। কবিতায় আবু হেনা মোস্তফা কামালের হৃদয় ও মন কাজ করেছে, গদ্যে কাজ করেছে তাঁর মেধা, সেদিক থেকে তাঁর গদ্য তাঁর কবিতার বিপরীত। দু'য়ের মধ্যে মিল যেখানে আছে, তা স্বচ্ছতায়, সরলতায়, বাচংযমে। আবু হেনা মোস্তফা কামালের আত্মার স্বচ্ছতা, সারল্য, লাবণ্য, তাঁর সমস্ত রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর গদ্যরচনার প্রধান বিষয় আধুনিক বাংলা সাহিত্য। তাঁর প্রবন্ধ সদর্থে আকাডেমিক; সর্বদাই তথ্যনির্ভর, যুক্তিশীল, নিরাবেগ, একলক্ষ্য। তাঁর সৃজনশীল মেধা কখনো-কখনো আশ্চর্য নূতন দৃষ্টিপাত ঘটিয়েছে—যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচিত হন 'পদ্মানদীর দ্বিতীয় মাঝি' হিশেবে (প্রথম মাঝি "গল্পগুচ্ছে"র রবীন্দ্রনাথ)। হৃদয়-ও-মনন-খচিত তাঁর কবিতা ও গদ্যের উজ্জ্বলতা কখনো মলিন হবে না।

সর্বতোভাবে জীবনরসিক ছিলেন আবু হেনা মোস্তফা কামাল। জীবনের যে-কোনো অবস্থা থেকে তিনি আনন্দ আহরণ করতে, এমনকি নিষ্কাশন

www.pathagar.com

ক'রে নিতে পারতেন। পৃথিবীতে তো আনন্দ উপভোগের অভাব নেই—যে চায়, তার জন্যে। সর্বতোভাবে অস্তিবাদী ছিলেন তিনি, জীবনসম্ভোগী ছিলেন, তিল পরিমাণ হতাশা বা নিরাশাকে ভিড়তে দিতেন না। এসব বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। যে-আমি অনেকখানি নিরাশাপ্রোথিত, আমি স্যারের কাছেও নিরাশার গুণ কীর্তন করেছি, কিন্তু তা তিনি স্বীকার করেন নি, তিনি ছিলেন জীবনের আনন্দ-উজ্জ্বলতা-সম্ভোগের সপক্ষে। কিন্তু ছিলেন কঠোরভাবে, আক্ষরিক অর্থে নীতিবাদী। জীবনসম্ভোগী হওয়ার জন্যে তাঁর কোনো বাইরের উপকরণের দরকার ছিলো না, অথবা অল্পমাত্র প্রয়োজন ছিলো, জীবনসম্ভোগের সমস্ত বা অধিকাংশ কঠিন উপকরণ ছিলো তাঁরই আত্মার ভিতরে সঞ্চিত। ফলে ক্লেদের যুগেও তিনি সাধুতার এক নির্দশন। আর তাঁর যদি কিছুটা দুর্মুখতার দুর্নাম শোনা যায়, তা তাঁর ব্যক্তিগত সাধুতা-জাত তেজস্বিতার ফলেই। কিন্তু সৎ ব্যক্তিদের যেমন হয় অনেক সময়, সারা পৃথিবীকে সমস্ত মানুষকে তাঁরা ভাবতে থাকেন অসৎ; এই ভাবনা থেকে ক্রমশ হ'য়ে ওঠেন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, একাকী, ক্রোধী, আত্মমুগ্ধ। আবু হেনা মোস্তফা কামালের প্রখর বোধ, সমাজ সম্পর্কে সম্যক ধারণা, মানুষের শুভ বুদ্ধিতে প্রবল প্রত্যয়, তুচ্ছ বিষয় থেকে আনন্দ গ্রহণ ও দান করার ক্ষমতা তাকে পরিণত করেনি জীবনবর্জিত ক্রুদ্ধ সন্ন্যাসীতে। তাঁর দরদী মানবিকতা, তাঁর রোমান্টিকতা সততার কুফল থেকে তাঁকে রক্ষা করেছে।

সংস্কৃতি বিষয়ে আবু হেনা মোস্তফা কামালের বোধ ছিলো অকম্পিত-রকম স্বচ্ছ। পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর দিয়ে বাংলা-দেশ আমলে পশ্চিম বাংলার সাক্ষ্য মানার হীন সুবুদ্ধি তাঁর ছিলো না; কেননা তিনি ছিলেন ব্যক্তিত্ববান। মিথ্যা হচ্ছে দুর্বলের আশ্রয়, আবু হেনা মোস্তফা কামাল দুর্বল ছিলেন না, তাই ছিলেন সত্যনিষ্ঠ, প্রিয় বাক্যের চেয়ে সত্য বাক্য তিনি পছন্দ করতেন। আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি, নজরুল-প্রতিভাকে তিনি বলেছেন 'অলৌকিক'; তাই ব'লে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কোনো উক্তি উচ্চারণ করা ছিলো তাঁর পক্ষে অসম্ভব। রচনায়, জীবনে, মৃত্যুতেও তিনি রয়ে গেলেন অস্খলিত সংস্কৃতিবান, সৌন্দর্যবান এবং সৌন্দর্য-উপাসক। তিনি জানতেন বাঙালি-মুসলমানের সংস্কৃতি বিমিশ্র সংস্কৃতি। বিমিশ্র; ফলত জটিল ও বহুবর্ণময়। যথার্থ ওয়াকিফহাল ছিলেন বলেই এই সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর বোধ ছিলো স্বচ্ছ। কাজেই কোনোদিকে তাঁকে

www.pathagar.com

বাড়াবাড়ি করতে হয়নি, তিনি একটি অনায়াস স্বাভাবিক সংশ্লেষণে পৌঁছে-ছিলেন। সংস্কৃতি কোনো ক্ষেত্রেই কারো ক্ষেত্রেই কোনো প্রদত্ত ব্যাপার নয়, এ এক অর্জনসাপেক্ষ বিষয়। আবু হেনা মোস্তফা কামাল তা অর্জন করে-ছিলেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মেও তাঁর সাংস্কৃতিক আচরণ ছিলো এমন রাজকীয় যে, মনে হতো তা বহু যুগবাহিত; অথচ তার কোথাও কৃত্রিমতা ছিলো না; ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত, স্বভাবী, সর্বতোসংযত। তিনি ছিলেন স্বভাব-সাংস্কৃতিক।

বাংলা একাডেমীতে তাঁর সময়কালের শ্রেষ্ঠ কাজ, আমার বিবেচনায়, দুটি : এক, সাহিত্যিকদের জীবনীসিরিজের প্রবর্তন; আর দুই, কবি নজরুল ইসলামের নব্বই বছর পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ। জীবনীসিরিজে শ-খানেক বই ইতিমধ্যেই প্রণীত ও প্রকাশিত হয়েছে; আর নজরুল বিষয়ে তাঁর পরিকল্পনা সদ্য সূচিত হয়েছে;—এই অবস্থায় তিনি চলে গেলেন। দুটি উদ্যোগই বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে এজন্যে যে, এগুলি আমাদের অপরিহার্য জাতীয় উদ্যোগ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একা যে-সাহিত্যিক জীবনচরিতমালা সংগ্রহ ও প্রণয়নের ব্যবস্থা করেছিলেন, তা এক অসাধারণ ব্যাপার। এ-যুগে, মনে হয়, তা কেবল অনেকের হাতেই সম্ভব হতে পারে—অন্তত দু-বাংলাতেই তো তা আর দ্বিতীয়বার হতে পারেনি। অনেক আগেই বাংলা একাডেমীর এই উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত ছিলো; যে-কোনো কারণেই হোক, হয়নি। জীবনী রচনায় সম্ভবত একাডেমী কর্তৃপক্ষ দুটি নীতি গ্রহণ করেছেন; বাংলাদেশে জন্ম হয়েছে যে-সব লেখকের, এবং যাঁরা মুসলিম লেখক, তাঁদের জীবনীই প্রণীত হবে। কলকাতার 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় এই জীবনীমালা প্রশংসিত হয়েছে এজন্যে যে, এতে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে। ভালো কথা। কিন্তু সেখানে একথা বলা হয়নি যে, পশ্চিম বাংলা থেকে প্রকাশিত সাহিত্যসাধক চরিতমালায় পশ্চিম বাংলায় জন্মগ্রহণ-কারী মুসলিম লেখকদের জীবনী প্রণয়ন করা হচ্ছে না কেন।—সে যাই হোক, এই উদ্যোগদ্বয় গ্রহণ করে আবু হেনা মোস্তফা কামাল সাহিত্য-সন্ধিৎসুদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

নিজে ছিলেন প্রকৃত শিক্ষক, তাই প্রকৃত শিক্ষকদের প্রতি তাঁর ছিলো অগাধ শ্রদ্ধা। তাঁর স্কুলশিক্ষক জব্বার স্যার ও মুনীর চৌধুরীকে ভালো-বেসেই তিনি এসেছিলেন শিক্ষকতায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগদান করার পর মুনীর চৌধুরী তাঁকে একই ঘরে বসতে বলায় নিজেকে

www.pathagar.com

তিনি সম্মানিত জ্ঞান করতেন। আমাকে তিনি এই সেদিন বলছিলেন, মরহুম মুহম্মদ আবদুল হাই ও মরহুম মুনীর চৌধুরী (যাঁরা ছিলেন আমারও অধ্যাপক) আসলে ছিলেন অসাধারণ—কেননা তাঁরা পঞ্চাশ বছরে বা তার আগেই মৃত্যুরবণ করলেও, ঐ অল্প বয়সেই কৃতিত্বের শীর্ষদেশে আরোহণ করেছেন। আর এই তালিকায় আজ আমি তাঁর নামটিও যুক্ত করতে চাই—মাত্র ৫৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করলেও তিনি নানাদিকে তাঁর অসাধারণ কৃতির স্বাক্ষর উৎকীর্ণ রেখে গেছেন। আর শিক্ষকের কাছে শেখার কি শেষ আছে? এই সেদিনও তাঁর কাছে দুই সমোচ্চার্য শব্দের মানে শিখলাম, 'অর্ঘ' ও 'অর্ঘ্য' দুই বানানের দুই মানে। এম্নিতে ক-জনের কাছে আমরা আজ কোনো সাহিত্যিক প্রশ্ন নিয়ে যেতে পারি, তার যথার্থ জবাব পেতে পারি?---স্যার চলে গেলেন ; আমার অতল অসহায়তা আরো অতল হয়ে ফেনিয়ে উঠলো।

গত কয়েক বছর ক্রমাগত তাঁর সন্নিহিত হচ্ছিলাম—তাঁরই দাক্ষিণ্যে, সৌজন্যে। আমার সম্পাদিত পত্রিকাসমূহে সর্বদাই তাঁর সহযোগিতা পেয়েছি। লেখক হিশেবে তাঁর আলস্য বিখ্যাত কিংবা কুখ্যাত, তাহলেও আমি বলতে বাধ্য, আমার প্রার্থনা তিনি কখনো না-মঞ্জুর করেন নি। ১৯৮৬ শালে 'এখন' পত্রিকায় (আমি ছিলাম ঐ পত্রিকার উপদেষ্টা সম্পাদক) তাঁর দুটি চমৎকার কবিতা ছাপি। ঐ কবিতা দুটির কপি তাঁর কাছে ছিলো না, কিন্তু কোথায় ছাপা হয়েছিলো তা, আরো অনেক কিছুর মতো, তাঁর স্মৃতি-ধার্য ছিলো। টেলিফোনে একদিন জানান, আমি জেরোক্স করে দিই, কবিতাদ্বয় স্থান করে নেয় তাঁর সর্বশেষ কবিতাগ্রন্থে। (এই কবিতাগ্রন্থ, "আক্রান্ত গজল"-এর, আমি বিস্তারিত রিভিয়ু লিখেছিলাম। দৈনিক সংবাদের সাহিত্যসাময়িকীতে আবুল হাসনাত গুরুত্ব দিয়ে ছাপেন। আমার সব কাজের মতো এই রিভিয়ু লিখতেও দেরি হয়ে গিয়েছিলো বেশ। তবে আজ আমার সব সান্ত্বনা ও আনন্দ এই যে, স্যার আমার বিশ্লেষণে তৃপ্ত হয়েছিলেন। আমি তো স্যারেরই ছাত্র ; তাই আত্মপ্রত্যয় থেকে বলে-ছিলাম স্যারকে, "আমার রিভিয়ুকে সাহিত্যিকভাবে আর-কোনো রিভিয়ু অতিক্রম করতে পারবে না।") আমার সম্পাদিত 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা'য় স্যারের নজরুল-সংক্রান্ত লেখাগুলি এক-এক করে পুনর্মুদ্রণ করে যাচ্ছিলাম। মাঝে-মাঝে বলতেন, আর কয়েকটি লেখা তৈরি হলেই নজরুল-বিষয়ক একটি বই তৈরি হয়ে যায়। নজরুল বিষয়ে স্যারকে দিয়ে

www.pathagar.com

আমার দু'একটি পরিকল্পিত লেখা লিখিয়ে নেওয়া হবে না আর। ১৯৮৮ শালে 'শিল্পতরু' পত্রিকা আমরা যখন শুরু করলাম (এই পত্রিকারও উপদেষ্টা সম্পাদক আমি), তার প্রথম সংখ্যাটি শুরুই হয়েছিলো স্যারের কবিতা বিষয়ক একটি প্রবন্ধ দিয়ে। পরে স্যার 'শিল্পতরু' পত্রিকায় লিখতে শুরু করেছিলেন জর্নালধর্মী একটি অনুপম ধারাবাহিক রচনা, 'নিজের নির্জনে'। দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিলো। প্রথমবার হৃদরোগের আক্রমণ থেকে মুক্ত হয়ে উঠে এই হালকা চালের লেখাটি লিখছিলেন তিনি—যেখানে খুব বেশি মানসিক প্রচাপ পড়ে না, আবার সৃষ্টির আনন্দও লাভ করা যায়। এই রচনাগুচ্ছের সঙ্গে—আমার তখনই মনে হয়েছে—তুলনীয় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের "মনে এলো"-"ঝিলিমিলি" জাতীয় রচনা। মৃত্যুচিন্তাখচিত তাঁর এই রচনাগুচ্ছে তাঁর শেষদিককার ভাবনাবেদনার কিছু চিহ্ন থেকে গেলো। (কতোটাই বা—আমাদের চিন্তাসমুদ্রের সামান্যতম দু-একটি ঝিনুক-কড়ি-শঙ্খ ছাড়া কিইবা রেখে যেতে পারি—তবু তা-ই আমাদের স্মৃতি-চিহ্ন!) আবু হেনা মোস্তফা কামালের অসম্ভব ব্যস্ততা আর ভাবনাগর্ভ আলস্যের দুই খোলার ঝিনুকের মধ্য থেকে কয়েকটি মহার্ঘ সাহিত্য-মুক্তা ভাবীকালের জন্যে ছিনিয়ে আনতে পেরেছি—আজ এই আমার আনন্দ। আর আনন্দ এই : স্যারের আহ্বানে দুটি বই, দুটিই নজরুল-সংক্রান্ত—"নজরুল ইসলাম : কালজ কালোত্তর" (১৯৮৭) এবং "তোরা সব জয়ধ্বনি কর" (১৯৮৯)—অত্যল্প সময়ে তৈরি করে দিতে পেরেছি। উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে যে, বাংলা একাডেমীর সংশ্লিষ্ট সকলেই দিবারাত্রি পরিশ্রম করেছেন এই দুটি বইয়ের প্রকাশনা সূত্রে, বিশেষ করে মুদ্রক, কবি ও শিশুসাহিত্যিক ওবায়দুল ইসলাম কঠোর পরিশ্রম করেছেন। দুঃখের বিষয়, তিনিও আজ হৃদরোগে আক্রান্ত। তাড়াতাড়িতে আমার ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়নি; এখানে এই সুযোগে জানিয়ে রাখি, প্রথানুগ স্মরণিকার চেয়ে বেশি কিছু বলেই রশীদ হায়দার ওবায়েদরা যখন দ্বিতীয় বইটির স্মরণিকা-ব্যতিরেকী আলাদা নামকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেন, তখন স্যারই দ্বিতীয় বইটির উপযুক্ত নাম দিলেন : "তোরা সব জয়ধ্বনি কর"। এই নাম নিয়েও কাজ করতে করতে প্রেসে বসে আমরা কতো না হল্লোড় করেছি—আনন্দ-বেদনার সঙ্গে মনে পড়ে আজ।

পুনঃপ্রচারিত বেতার-কথিকা শেষ করেন আবু হেনা মোস্তফা কামাল এই বলে যে, কয়েকজন মাত্র ছাত্রের মনে যে-শিক্ষক তাঁর স্বাক্ষর রাখতে

www.pathagar.com

পেরেছেন তিনিই সফল। তাঁর কয়েকজন শিক্ষককে সেদিক থেকেই তিনি মনে করেন সফল। আজ তাঁর উক্তি তাঁকেই ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। তিনিও সফল আমার মতো আরো অনেক ছাত্রের মনে।

আজ একটি কথা আমাকে বলতেই হচ্ছে। বাংলা একাডেমীকে তিনি নিশ্চিত খানিকটা অগ্রসর করে দিয়েছেন। কিন্তু এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কাছে তিনি নিজে কি পেয়েছেন? কবিতা বা প্রবন্ধ-গবেষণা যে-কোনো ক্ষেত্রেই তো তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার পেতে পারতেন; কিন্তু পাননি। একুশে পুরস্কার ও অন্যান্য পুরস্কার দিয়ে যাঁরা তাঁকে সম্মানিত করেছেন, তাঁদের আজ সকলেই ধন্যবাদ দেবেন। কেননা তাঁর মৃত্যুর পর আমরা দেখলাম, আমাদের দেশের মানুষ অকৃতজ্ঞ নয়। ২৩শে সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যুর দিনে দেখলাম তাঁর বাসায় অনেক মানুষজনের ভিড়। ২৫শে সেপ্টেম্বর দেখলাম বাংলা একাডেমীতে, বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে, আজিমপুরের নতুন গোরস্থানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ—লেখক, গায়ক, চিত্রীরা তো বটেই, অন্যরাও—তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন। ২৩, ২৪, ২৫—সেপ্টেম্বরের এই তিন দিন, তাঁর মৃত্যুর খবর রটে যাবার পর থেকে তাঁর সমাধিস্থ হওয়া পর্যন্ত, এবং তাঁর পরেও, সমস্ত মানুষের মধ্যে একটিই হাহাকার-ভরা উচ্চারণ : 'অপূরণীয়' ক্ষতি হ'য়ে গেলো। হ্যাঁ, কোনো প্রথাগত অর্থে নয়, আক্ষরিক অর্থেই 'অপূরণীয়' তাঁর অনুপস্থিতি। বেতার, টি-ভি, খবর-কাগজ, বাংলা একাডেমী—সকলেই মৃত্যুর পরে তাঁকে যথা-যোগ্য মর্যাদা দান করেছেন। (২৩ তারিখের রাত্রে তাঁর বাসায় দেখা হয়েছিলো তাঁর দুই অবিমিশ্র অনুরাগীর সঙ্গে— সাংবাদিক মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর ও অধ্যাপক ভুঁইয়া ইকবালের সঙ্গে। এঁদেরই তৎপরতায় স্যারের অধিকাংশ বই আমাদের এই নিগ্রন্থ সমাজে বের হতে পেরেছে। আশ্চর্য যোগাযোগই বলতে হবে— চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভুঁইয়া ইকবাল আকস্মিক কোনো কাজে ঢাকায় এসেছিলেন। তাঁদের প্রিয় মানুষটির শেষ-কৃত্যেও তাঁরা উপস্থিত থাকলেন।)

ব্যক্তিমানুষটি ছিলেন সৃজনশীল। সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে জনকশোভন প্রজ্ঞার এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিলো তাঁর মধ্যে। সমসাময়িকদের মধ্যে তাঁর তুলনীয় মনে হয় খানিকটা হাসান হাফিজুর রহমান—তাঁর মধ্যেও সৃজন ও মনন, স্বস্থতা ও চাঞ্চল্য একটি রেখায় মিলেছিলো। তবু তফাৎও ছিলো বা আছে অবশ্যই : হাসান ছিলেন অসামান্য সংগঠক, আর আবু

www.pathagar.com

হেনা মোস্তফা কামাল অসামান্য পণ্ডিত; হাসান ছিলেন সংগঠক কিন্তু লাজুক—আড্ডায় উজ্জীবিত কিন্তু সভাগৃহে কুণ্ঠিত, আর আবু হেনা বাক-পটুতায় আড্ডা ও সভাগৃহ দু জায়গাতেই সমান কুশলী তৎপর পারঙ্গম ও সপ্রতিভ। কিন্তু দু'জনেই অতীত ও বর্তমানকে একটি করতলে মিলিয়ে ছিলেন। দু'জনেই আধুনিক। প্রকৃতার্থে প্রগতিশীল। আবার : কোনো মানুষই তো একজন অন্যের অনুরূপ বা প্রতিরূপ নয়—প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ও স্বরাট্। আবু হেনা মোস্তফা কামালের সৃজনশীলতা পরিব্যাপ্ত ছিলো কেবল তাঁর রচনায় নয়—বহুলাংশ কথনে; অজস্র বেতারভাষণে, অজস্র টি-ভি উপস্থাপনায়, অজস্র আড্ডায়; এগুলোর একাংশও যদি এখন সংগ্রহ করা যায়, তাহলে ভাবীকালের জন্যে সঞ্চিত থাকবে এক মহার্ঘ সম্পদ।

মানুষ ফেরেশতা নয়। মানুষকে কেন আদর্শায়িত করবো? তবু সাধারণ মানুষের চেয়ে কোনো-কোনো মানুষের কিছু-কিছু বেশি গুণপনা থাকে—সাধারণ মানুষ থেকে সেখানেই তাঁরা তফাৎ হ'য়ে যান। আবু হেনা মোস্তফা কামালেরও ভুলচুক হয়েছে নিশ্চয়, দোষত্রুটির ঊর্ধে তিনিও নন; কিন্তু তবু এমন-কিছু ছিলো তাঁর অর্জনে—যা অন্যদের ছিলো না, সেখানে তিনি ভিড়ের ভিতর থেকে পৃথক, সেখানেই তিনি বিশিষ্ট, সেখানেই তিনি ব্যক্তিত্ববান। সেই বিশিষ্টতা হচ্ছে তাঁর পর্যবেক্ষণের আশ্চর্য শক্তি আর পর্যবেক্ষণ প্রকাশের আশ্চর্য শক্তি। তিনি অন্য মানুষদের চেয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন, বেশি দেখতেন, সেই দেখাটিকে অন্য মানুষদের চেয়ে বেশি স্মৃতি-ধার্য রাখতে পারতেন, আর তাকে মিলিয়ে নিতে পারতেন সমগ্রতার পটে ফেলে, আর তাকে উপস্থিত করতেন অবিকল অকম্প্র যাথার্থ্যে। তাঁর কথকতার জাদুতে অনেকেই মুগ্ধ। সেই কথকতায় মোহনীয়তা থাকতো না, সোনালি জাল বিস্তৃত হতো না, শব্দ ও বাক্য আবৃত্ত-পুনরাবৃত্ত হতো না, আবেগ থাকতো না। থাকতো যা, তা যথাযথতা, তা সত্য। আমরা তাঁর বাক্যের মিথ্যা মোহে মুগ্ধ হতাম না, মুগ্ধ হতাম শব্দ ও বাক্যের যথার্থতায়, সম্পূর্ণতায়, প্রতিসাম্যে। আবু হেনা মোস্তফা কামাল প্রিয়ভাষী ছিলেন না, ছিলেন সত্যভাষী। আর মানুষ প্রিয়ভাষণে আপাতমুগ্ধ হলেও শেষ-পর্যন্ত সত্যভাষণই ভালোবাসে। তাই তাঁর মৃত্যুর পরে প্রমাণিত হলো, সত্যভাষী আবু হেনা মোস্তফা কামালকেই তারা ভালোবেসেছিলো, হৃদয়-উজাড়-করা শ্রদ্ধা দিয়েছিলো।

www.pathagar.com

'জীবন এতো ছোটো ক্যানে!' অনেক খেদ ও সন্তাপ র'য়ে গেলো তাঁর প্রিয়জনদের সঙ্গে, আমারও। কিন্তু তবু খেদ করবো না, তাপিত হবো না। একটি বাক্যও যিনি অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখতেন না, জীবনে কি তিনি অসম্পূর্ণ? না : জীবনকে তিনি সম্পূর্ণ করে গেছেন। জীবনচক্রের সমস্ত অরগুলি পরিক্রান্ত হয়েছে তাঁর। জীবনের বৃত্ত কোনো-না-কোনোভাবে এক দিন পূর্ণতায় পৌঁছোয়। ২৫শে সেপ্টেম্বর নিঃশব্দ অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে থাকা বাংলা একাডেমীর মাঠের এক কোণায় গাছের নিচে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিলেন হেলাল হাফিজের সঙ্গে সাইয়িদ আতীকুল্লাহ। বললেন কাছে ডেকে, 'খেদ কোরো না। এভাবেই একদিন যে-কাউকেই যেতে হয়।' তাঁর কণ্ঠের অনার্দ্র বাস্তবতাকে মেনে নিতেই হয় শেষ-অব্দি। এবং তখন, চোখের পানিতে ভিজে, অনুভব করি : আবু হেনা মোস্তফা কামালের জীবনবৃত্ত সংক্ষিপ্ত হতে পারে, কিন্তু সেই জীবনবৃত্ত পুরো ফোটা ফুলের মতো সার্থক। জীবনের দীর্ঘ পরিধির চেয়ে এরকম বিজয়ী জীবনই তো সকলের কাঙ্ক্ষণীয়।

হোক। তবে তাই হোক।
স্তব্ধ হোক সব শোক।
বেলা কিংবা অবেলায়—
সাঙ্গ যবে হবে খেলা,
যেন পারি মেনে নিতে
যেন পারি উত্তরিতে
অচেনা অনির্বচনে—
শান্ত, তৃপ্ত, মুক্ত মনে।
যেন বলি : তাই হোক,
মৃত্তিকায় মিশে গিয়ে স্তব্ধ হোক যাবতীয় ক্রোধ-ক্ষোভ-দুঃখ-তাপ-শোক।।

১৯৮৯

www.pathagar.com

ঢাকার সাহিত্যচর্চার ধারা

ঢাকার ইতিহাস সন্ধান করলে যেতে হয় বহু প্রাচীনকালে। বৃহত্তর ঢাকা বা তার অংশ এক সময় বৌদ্ধ রাজাদের করতলগত ছিলো। তারপর বহু উত্থান-পতন ঘটেছে। ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে সুবাদার ইসলাম খান (শাসন কাল ১৬০৮-১৩) প্রায় বর্তমান বাংলাদেশের পরিসরের ভিত্তিতেই ঢাকায় প্রাদেশিক রাজধানী স্থাপন করেন। ঢাকার নতুন নাম দেন তিনি 'জাহাঙ্গীর-নগর'। তদানীন্তন মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের (রাজত্বকাল ১৬০৫-২৭) নামানুসারে হয় এই নামকরণ। প্রাদেশিক রাজধানী হওয়ার পর ঢাকার গুরুত্ব স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়। প্রায় শ'খানেক বছর—মাঝখানে বছর কুড়ি বাদে—জাহাঙ্গীনগর রাজধানী ছিলো। 'জাহাঙ্গীরনগর' নামটি অবশ্য কোনো সময়েই খুব জনপ্রিয় হয়নি, আগে-পরে 'ঢাকা' নামটিই বহাল থেকেছে। ঢাকার প্রাথমিক রূপ ইংরেজ শাসকদেরই সৃষ্ট। ১৮৫৭ শালে সিপাহী বিপ্লব, ঐ বছরই কলকাতার সঙ্গে ঢাকার টেলিগ্রাফিক যোগাযোগ স্থাপিত, ১৮৫৮ শালে এক ঘোষণাবলে ইংল্যাণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার অধীনস্থ হয় ভারতবর্ষ—সেই সঙ্গে ঢাকাও। ১৮৬৩ শালে নবাব আবদুল লতিফ, ঢাকার একজন ডেপুটি কালেক্টর, স্থাপন করেন 'মোহামেডান লিটা-রারি সোসাইটি', যাতে তার সদস্যরা 'সমকালীন রাজনীতি', আধুনিক চিন্তাধারা ও শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহী হয়। দুই মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮ ও ১৯৩৯-৪৫) রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সমগ্র উপহাদেশকে বিপর্যস্ত করে—ঢাকাকেও। ১৯৪৩-এর মন্বন্তরও তাই। ১৯৪০ শালে ঐতিহাসিক লাহোর অধিবেশনে উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র আবাসস্থলের প্রস্তাব পেশ করা হয়। মওলানা আকরম খাঁ-সম্পাদিত দৈনিক 'আজাদ' (কলকাতা থেকে প্রকাশিত) পাকিস্তানের দাবিতে সেদিন সবচেয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলো। এদিকে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার (১৯২১) পর ঢাকা হয়ে উঠতে থাকে পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিচর্চার কেন্দ্রস্থল। তবু ঢাকা, স্বীকার করতেই হবে, দেশবিভাগের আগে পর্যন্ত ছিলো মফস্বল-শহর। ১৯৪৭-এর ১৪ই আগস্ট

www.pathagar.com

পাকিস্তানের জন্ম হয় এবং ঢাকা-কে করা হয় পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী। বস্তুত তারপর থেকেই ঢাকা পূর্ণ বিকশিত হতে থাকে। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় কয়েকজন শহীদ হন। এই ভাষা আন্দোলনের ফলে ১৯৫৬ শালে বাংলা ভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিশেবে স্বীকৃত হয়। ঘনবসতিপূর্ণ ঢাকায় ১৮৭২ শালের প্রথম আদমশুমারিতেই দেখা গিয়েছিলো মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ (শতকরা ৫৬·৫ ভাগ)। পরে বছর বছর তা বেড়েছে। দেশ বিভাগের আগে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষিত বিত্তবান প্রাগ্রসর হিন্দুদের আধিপত্যই ছিলো বেশি, তাঁরা অনেকেই দেশবিভাগের পরে ভারতে চলে যান। প্রধানত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা থেকে যান। এদিকে মুসলমানদের আশরাফ-আতরাফ বিভাজন কালক্রমে লুপ্ত হয় এবং একটি শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্তের উত্থান ঘটে। বস্তুত এঁদের হাতেই রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক নায়কত্ব চলে আসে। এদিকে পশ্চিম পাকিস্তান নেয় নব্য শোষকের ভূমিকা। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র বিশেষত রাজধানী ঢাকায় তা প্রবলভাবে প্রতিবাদিত হয়, '৬৯ ও '৭০-এ গণঅভ্যুত্থান ঘটে, তারও কেন্দ্র হয় ঢাকা। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের জন্ম। স্বাভাবিকভাবেই প্রাচীন এই ঢাকা নগরীই হয় বাংলাদেশের রাজধানী। সমগ্র বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক কার্মকাণ্ডেরও কেন্দ্রস্থল।

এখন ঢাকা শুধু এই উপমহাদেশের নয়, এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগর, শুধু সৌন্দর্যে ও ঐতিহাসিকতায় নয়, সংস্কৃতির দিক থেকে—বিশেষত সাহিত্যের দিক থেকে।

২

ঢাকার আদিতম লেখক বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ, বৌদ্ধ সাহিত্যে যাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের গ্রন্থ সংখ্যা অনেক।

ঢাকায় বাংলা সাহিত্য চর্চার ইতিহাস খুব বেশি দিনের পাওয়া যায় না। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসই আমাদের মুখ্য সম্বল। আবার, উনিশ শতাব্দীর অধিকাংশ সময় গেছে দোভাষী পুঁথির চর্চায়। দোভাষী পুঁথির চর্চা শুরু হয়েছে উনিশ শতাব্দীর আগেই, এই শতাব্দীতে তার সম্প্রসারণ চলেছে। 'ইংরেজি জ্ঞানবর্জিত অর্ধশিক্ষিত কবিরা এ যুগে সারা

www.pathagar.com

শতাব্দীকাল ধরেই দোভাষী পুঁথি সাহিত্য রচনা করেছে। একদিকে ইংরেজ বিদ্বেষ এবং অন্যদিকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থানের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর চেষ্টা---এ দুইয়ের মাঝখানে এ শতাব্দীতে রচিত পুঁথিসাহিত্য যে ওহাবী আন্দোলনেরই প্রত্যক্ষ ফল তার পরিচয় পাওয়া যায়। এ সাহিত্যের রচয়িতাদের দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের মানসিকতা এবং তাদের ভাষা ব্যবহার থেকে।' (মুহম্মদ আবদুল হাই।)।

এরই মধ্যে উনিশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াংশে ঢাকায় শুরু হয়েছে আধুনিক সাহিত্যের ফসল ফলতে।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩) ঢাকা জেলাতেই চাকরি করার সময় "নীল-দর্পণ" নাটকটি লেখেন এবং এখানে থেকেই ১৮৬০ শালে নাটকটি প্রকাশিত হয় 'কস্যচিৎ পথিকস্য' লেখকের এই ছদ্মনামে। "নীল-দর্পণ" বাংলা নাটকের ইতিহাসে যুগান্তকারী সৃষ্টি ব'লে সর্বজনস্বীকৃত। ১৮৭২ শালে এই নাটক দিয়েই সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয় শুরু হয়। মাইকেল মধুসূদন এই নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। পাদরী লং শাহেব এই ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩), আধুনিক বাংলা কবিতার জনক, আইন ব্যবসার উপলক্ষে ১৮৭৩ শালে ঢাকায় এসেছিলেন, ঢাকার মানুষ তাঁকে সেদিন পোগোজ স্কুলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তার জবাবে মাইকেল এই স্বরচিত কবিতাটি পাঠ ক'রে শুনিয়েছিলেন :

ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দনের উত্তরে—

নাহি পাই নাম তব বেদে কি পুরাণে
কিন্তু বঙ্গ-অলঙ্কার তুমি যে তা জানি
পূর্ব-বঙ্গে। শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে
ফুলবৃন্তে ফুল যথা, রাজাসনে রাণী।
প্রতি ঘরে বাঁধা লক্ষ্মী (থাকে এইখানে)
নিত্য অতিথিনী তব দেবী বীণাপাণি।
পীড়ায় দুর্বল আমি, তেঁই বুঝি আনি
সৌভাগ্য, অর্পিলা মোরে (বিধির বিধানে)
তব করে, হে সুন্দরি! বিপজ্জাল যবে
বেড়ে কারে, মহৎ যে সেই তার গতি।

www.pathagar.com

কি হেতু, মৈনাক গিরি ডুবিলা অর্ণবে?
দ্বৈপায়ন হ্রদতলে কুরুকুলপতি?
যুগে যুগে বসুন্ধরা সাধেন মাধবে,
করিও না ঘৃণা মোরে, তুমি, ভাগ্যবতি।

কবি, সম্পাদক ও নাট্যকার হরিশচন্দ্র মিত্র (১৮৩৪-৭২) ঢাকার লোক ছিলেন, তাঁর সব বই ও সম্পাদিত পত্রিকা ঢাকা থেকেই বেরিয়েছে। তাঁর ছদ্মনাম 'ব্যোমকেশ চাঁদ বাঙ্গাল'। নিবেদিত সাহিত্যকর্মী ছিলেন। নাটক : "ম্যাও ধরবে কে", "শুভস্য শীঘ্রং", "জানকী নাটক", "জয়দ্রথবধ", "আগমনী", "প্রহলাদ নাটক,", "হতভাগ্য শিক্ষক" প্রভৃতি। কবিতাগ্রন্থ : "কবিতা কৌমুদী" (তিন খণ্ড), "বীরবাক্যাবলী", "কবি রহস্য", "কীচকবধ কাব্য" প্রভৃতি। গদ্যরচনা : "বিধবা বঙ্গাঙ্গনা", "নির্বাসিতা সীতা"। ইনি কয়েকটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন : 'কবিতা-কুসুমাবলী', 'অবকাশরঞ্জিকা', 'কাব্য প্রকাশ' ও 'মিত্র প্রকাশ'। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০) ছিলেন ব্রাহ্ম, কেশবচন্দ্রের আদেশে ইসলাম ধর্মের অনুশীলন করেন। তিনিই বাংলা ভাষায় কুরআন শরীফ প্রথম অনুবাদ করেন (১৮৮১-৮৬)। হাদীস শরীফ অনুবাদ করেন দশ খণ্ডে। এছাড়া তাঁর অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে আছে : "তাপসমালা" (ফরিদউদ্দিন আত্তারের "তাজকিরাতুল আউলিয়া", "তথ্যরত্ন" (রুমী থেকে), 'নীতিমালা" (গাজ্জালীর "কিমিয়ায়ে সাআদাত"), "হিতোপাখ্যানমালা", "হিতোপাখ্যানমালা" (প্রথম খণ্ড : সাদীর "গুলিস্তাঁ" দ্বিতীয় খণ্ড : সাদীর "বুস্তাঁ"), "দীওয়ান-ই-হাফিজ" প্রভৃতি। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে : "মহাপুরুষ হযরত মুহম্মদ ও তৎপ্রবর্তিত ইসলাম ধর্ম", "ইমাম হাসান ও হোসেনের জীবনী", "চারিটি সাধ্বী মুসলমান নারী" "চারিজন ধর্মনেতা", "ধর্মবন্ধুর প্রতি কর্তব্য", "রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও জীবনী," "আত্মজীবন" প্রভৃতি। এছাড়া তিনি ছিলেন 'সুলভ সমাচার' ও 'বঙ্গবন্ধু' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক এবং 'মহিলা' নামে মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১৩৮৪-১৯০৭) ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ-প্রভাকরে' লিখতেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ "সদ্ভাবশতক' ফারসী কবি হাফিজ অবলম্বনে রচিত। অন্যান্য গ্রন্থ : "মোহনভোগ", "কৈবল্যতত্ত্ব" "রাসের ইতিবৃত্ত"। তিনি কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন : 'মনোরঞ্জিকা' 'কবিতা কুসুমাবলী', 'ঢাকা প্রকাশ', 'বিজ্ঞাপনী' প্রভৃতি। কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০) লেখক, পণ্ডিত ও বাগ্মী ছিলেন, 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পেয়েছিলেন।

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : "নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব", "প্রভাত-চিন্তা", "নিশীথ-চিন্তা", "নিভৃত-চিন্তা" প্রভৃতি। 'শুভসাধিনী' ও 'বান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক। রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯-১৯০০) 'এডুকেশন গেজেট' ও 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার লেখক। গ্রন্থ : "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস" (পাঁচ খণ্ড), "চরিতমালা", "নব-চরিত", "প্রতিভার পরিচয়", "বীর মহিলা", "ভীষ্মচরিত", "আর্যকীর্তি" প্রভৃতি। রজনীকান্তের ভ্রাতা উমেশচন্দ্র গুপ্তও কয়েকটি নাটক লিখেছিলেন। কায়কোবাদ (১৮৬৭-১৯৫১), পুরো নাম মুহম্মদ কাজিম আল কুরেশী, কবি। বিখ্যাত কবিতা গ্রন্থ : "অশ্রুমালা" ও "মহাশ্মশান"। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ : "শিবমন্দির", "অমিয়ধারা", "শ্মশানভস্ম" "মহরম শরীফ" ইত্যাদি। দীনেশচরণ বসু (১৮৫১-৯৮) কবিতা ও উপন্যাস লিখতেন, তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিলো। গান রচনা ও অঙ্কনশিল্পে দক্ষতা ছিলো। 'বান্ধব', 'ঢাকা প্রকাশ' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে যোগ ছিলো। গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮) 'স্বভাব-কবি গোবিন্দ দাস' নামে বিখ্যাত। "প্রেম ও ফুল", "শোকোচ্ছ্বাস", "মগের মুলুক", "কুসুম", "কস্তুরী", "চন্দন", "ফুলরেণু", "বৈজয়ন্তী" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। 'পূর্ববঙ্গ আরো অনেক কবিকে ধারণ ও পোষণ করিয়াছিল। কিন্তু পূর্ববঙ্গের বিশেষ আবহাওয়াটুকু, তাহার বিশিষ্ট শ্রীহীনটি কিঞ্চিৎ পরিমাণে গোবিন্দচন্দ্রের কবিতায়ই উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।' (সুকুমার সেন) আনন্দচন্দ্র মিত্র (১৯৫৪—১৯০৩) কায়কোবাদের মতোই আর-একজন মহাকাব্য-রচয়িতা। গ্রন্থ : "মিত্রকাব্য" (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), "হেলেনা কাব্য" (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), "প্রেমানন্দ কাব্য", "ভারতমঙ্গল" প্রভৃতি। গানও লিখতেন। দীন মোহাম্মদ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৬৭-১৯৩৬)-এর আসল নাম ছিলো মনোরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়। মুসলমান হওয়ার পর তিনি ধর্ম প্রচার করতেন ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনায়। বই "ক্রুসেড ও জেহাদ" (দুই খণ্ড)। ঢাকায় জন্ম কিন্তু কলকাতায় তথা বৃহত্তর ভারতে বিখ্যাত হয়েছেন যে-সব লেখক, তাঁদের মধ্যে আছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (মূলত রাজনীতিবিদ), সরোজিনী নাইডু (মূলত সমাজকর্মী), জগদীশ চন্দ্র বসু (মূলত বৈজ্ঞানিক), "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র লেখক দীনেশচন্দ্র সেন (অন্যান্য বহু গ্রন্থপ্রণেতা), আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী প্রমুখ।

ঢাকার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জগৎ প্রবলভাবে দীপ্ত হয়ে ওঠে বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে। ১৯২১ শালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার

www.pathagar.com

পর ঢাকার সাহিত্য সংস্কৃতি চঞ্চল ও সপ্রাণ হয়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ—এইসব বিদ্যাপীঠ ঢাকার সাহিত্যকে গতিময় ক'রে তোলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ আলো ক'রেছিলেন কৃতী অধ্যাপকবৃন্দ: মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮০), ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯), ড নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪), নলিনীকান্ত ভট্টশালী (১৮৮৮-১৯৪৭), সুশীলকুমার দে (১৮৯০-১৯৬৮), সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪), ড. কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), আবুল হুসেন (১৮৯৭-১৯৩৮), জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (১৮৯৪-১৯৫৯), আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯০৯-৮৪), কবি জসীমউদ্‌দীন (১৯০৪-৭৬), অমলেন্দু বসু, পরিমল রায় প্রমুখ। সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এঁদের প্রত্যেকেরই প্রোজ্জ্বল দান আছে। এ সময় ঢাকায় এমন দুটি ঘটনা ঘটে, যা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতেই অসীম গুরুত্বপূর্ণ: একটি, রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক সাহিত্যের জন্ম; আরেকটি, 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' তথা 'শিখা' গোষ্ঠীর অভ্যুদয়। সুকুমার সেন লিখেছেন, 'স্পষ্ট যৌন-আবেগমূলক রোচক সাহিত্যের গুরু হইলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪)। ইনি আইন-অধ্যাপনাসূত্রে ঢাকায় গিয়া ধীরে ধীরে যে সাহিত্যিকমণ্ডলীকে উদ্বুদ্ধ করিলেন তাঁহারাই গল্পে-উপন্যাসে-কবিতায় এই 'বাস্তব' বা 'আধুনিক' ভঙ্গিকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়াছিলেন। ভারতীয় আসর ভাঙ্গিয়া আসিলে দলভাঙ্গা কয়েকজন তরুণ-অতরুণ লেখক ঢাকা গ্রুপের সহযোগিতায় 'কল্লোল' পত্রিকা বাহির করিলেন (১৯২৩)। স্বভাবতই বিদ্যালয় ও ছাত্রনিবাসের আওতায় এ বীজ সতেজ প্ররূঢ় হইতে পারে নাই। কল্লোলের প্রবাহ কিছুদূর গড়াইবার পর ইহার একটি শাখা বাহির হইয়াছিল ঢাকায়—'প্রগতি' (১৯২৭) কলিকাতায় আগেই হইয়াছিল—'কালি-কলম' (১৯২৬)। তখন সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক শরৎচন্দ্রের গল্পে মশগুল ও কাজী নজরুল ইসলামের ভক্ত পাঠক।.....স্পষ্ট রবীন্দ্র বিদ্বেষ না থাকিলেও রবীন্দ্র-বিমুখতা ছিল অনেকেরই। ঢাকাই (বিশ্ববিদ্যালয় ও সাহিত্য) সমাজ রবীন্দ্রনাথের স্থানে শরৎচন্দ্র ও নজরুলকে বসাইয়াছিল, একথা স্মরণ করিব।' ("বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস", চতুর্থ খণ্ড) আধুনিক সাহিত্যের এই সব উদ্‌গাতা—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ—পরে অবশ্য কলকাতাতেই স্থিত হন। আর 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র প্রাণপুরুষ কাজী আবদুল ওদুদ এসেছিলেন ঢাকা কলেজ

www.pathagar.com

থেকে, অধ্যাপক সৈয়দ আবুল হুসেন ও কাজী মোতাহার হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯২৬ শালে এই গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। এঁরা মুসলিম সমাজে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। 'বুদ্ধির মুক্তি' ছিলো এঁদের বীজমন্ত্র। এঁদের মুখপত্র ছিলো আবুল হুসেন-সম্পাদিত 'শিখা' নামে একটি বার্ষিক পত্রিকা। এই পত্রিকায় লেখা থাকতো : 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' এঁরা ঢাকায় দশটি বার্ষিক সম্মেলনীর ব্যবস্থা করেন : ১৯২৭, ১৯২৮, ১৯২৯, ১৯৩০, ১৯৩১, ১৯৩২, ১৯৩৩, ১৯৩৪, ১৯৩৫ ও ১৯৩৬ শালে। বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত-সম্পাদিত মাসিক 'প্রগতি' (১৯২৭) এবং আবুল হুসেন-সম্পাদিত বার্ষিক 'শিখা' (১৯২৬) বিশের দশকের ঢাকার দুটি উজ্জ্বলতম সাময়িকী—যাদের অবদান সাময়িককালকে অতিক্রম করেছিলো।

মুসলিম সাহিত্য-সমাজের কর্মকাণ্ড তিরিশের দশকে বিস্তারিত হয়েছিলো। ১৯৩৯ শালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় বেতার-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে ঢাকায় সাহিত্যিক কর্মকাণ্ড আরো বিস্তৃত হয়। চল্লিশের দশকে, ১৯৪৭-এর দেশবিভাগের আগে পর্যন্ত ঢাকায় সাহিত্য-জগতে বামাবর্তই প্রবল ছিলো। 'প্রগতি লেখক সংঘে'র একটি শাখা ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। ১৯৪০ শালে ঢাকার নূতন সাহিত্য ভবন থেকে প্রকাশিত হয় 'ক্রান্তি' নামক সাহিত্য সংকলন। ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক সংঘের অন্যতম নেতা রণেশ দাশগুপ্ত এতে লেখেন 'নতুন দৃষ্টিতে উপন্যাস', নৃপেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী লেখেন 'সাহিত্যে সৌন্দর্যবাদ'। ১৯৪২ শালের ৮ই মার্চ ঢাকায় সোমেন চন্দ নিহত হন। ঢাকা-কলকাতা সর্বত্র তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়। ১৯৪২ শালেই প্রগতি লেখক সংঘের মুখপত্র পাক্ষিক 'প্রতিরোধ' প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে। ১৯৪৩-এ মাসিকে রূপান্তরিত হয়। প্রথম দু'বছর সম্পাদক ছিলেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও অচ্যুত গোস্বামী। পরবর্তীকালে রণেশ দাশগুপ্ত ও অজিত গুহ ১৯৪২ শালের ডিসেম্বরে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র উদ্যোগে যে-অনুষ্ঠান হয় তাতে ঢাকা থেকে যোগ দিয়েছিলেন কয়েকজন প্রতিনিধি। ঐ অনুষ্ঠানের সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন হাবীবুল্লাহ বাহার। 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী-সংঘে' এমন কয়েকজন লেখক যোগ দেন, যাঁরা পরে ঢাকায় নিহত হয়েছিলেন—আবুল মনসুর আহমদ, ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, শওকত ওসমান প্রমুখ

www.pathagar.com

ঐ সংঘের ১৯৪৫ শালের চিত্র-প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছিলেন জয়নুল আবেদীন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ময়মনসিংহে নিবারণ পণ্ডিত, ঢাকায় সত্যেন সেন ও সাধন দাশগুপ্ত গণসংগীত রচনা করছিলেন। অন্য একটি প্রবাহও ছিলো। ১৯৪৩ শালে 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদে'র বার্ষিক সম্মেলন হয়। ১৯৪৫ শালে সাহিত্য-সংসদের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাঙালি-মুসলমানের অতীত ঐতিহ্য হিশেবে পুঁথিসাহিত্যের পুনরুজ্জীবনের বিষয় ছিলো আলোচ্য। দু'বছরই সভাপতিত্ব করেছিলেন সৈয়দ এমদাদ আলী।

অনেক বছর ধরে ঢাকা-কেন্দ্রিক সাহিত্যের যে-সম্ভাবনা ছিলো তা অকস্মাৎ উন্মোচিত হলো ১৯৪৭-এ দেশবিভাগের পরে, ঢাকা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হওয়ায়। এক সঙ্গে আর-কখনো এতো বাঙালি-মুসলমান লেখক-কবি জাগ্রত হননি কখনো—যেমন দেখা গেলো '৪৭-এর পর। পঞ্চাশের দশক হয়ে উঠলো আমাদের ভিত্তিভূমি। কলকাতায় যে-বাঙালি-মুসলমান লেখকেরা উত্থিত হয়েছিলেন—জসীমউদ্‌দীন ও তিরিশের কবিরা, শওকত ওসমান-সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ও চল্লিশের কথাশিল্পীরা, ফররুখ আহমদ-আহসান হাবীব ও চল্লিশের কবিরা, অন্যান্য লেখকবৃন্দ ঢাকায় চলে এলেন এবং এখানেই সাহিত্য সাধনা শুরু করলেন। পঞ্চাশের দশকে নবীন যে-কবি, কথাশিল্পী, নাট্যকার, প্রবন্ধকার এ দেশের সাহিত্যে উত্থিত হলেন তা সংখ্যায় ও শক্তিতে অপরিমেয়। অজস্র নতুন পত্রিকা, নতুন মুখপত্র, নতুন লেখনী সব মিলিয়ে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিলো সৃজনশীল সাহিত্যের দুটি ক্ষেত্রে—কবিতায় ও ছোটো গল্পে—অসাধারণ কাজ হয়েছিলো। আর ছিলো সাহিত্যিক তর্কবিতর্ক, স্রোতপ্রতিস্রোত। সে-সবও শেষ-বিচারে, সুফলপ্রসূ হয়েছিলো। ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলন আমাদের সমগ্র সাহিত্যকে সেদিন চিরকালের মতো দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছে। পরের বছর ১৯৫৩ শালে হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিলো এক শাশ্বত-ভাস্বর সংকলন "একুশে ফেব্রুয়ারী"। বস্তুত হাসান হাফিজুর রহমান ঢাকা তথা বাংলাদেশের সাহিত্যকে অনেকখানি দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। তাঁর সমকালীন, অগ্রজ ও অনুজ অসংখ্য লেখকের অবিশ্রাম দানে ঢাকার সাহিত্য দিন-দিন ফুলে-ফলে ভরে উঠতে থাকে। একই সঙ্গে শুরু হয়েছিলো অতীতের পুনর্মূল্যায়ন ও বর্তমানের বিশ্লেষণ—প্রবন্ধ ও গবেষণার ক্ষেত্রেও কম কাজ হয়নি আমাদের। ১৯৭১-এ বাংলাদেশ

www.pathagar.com

স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিশেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, ঢাকার সাহিত্যে আর-একবার প্রবল জোয়ার আসে। আমাদের সাহিত্যের উজ্জ্বলতম মাধ্যম, কবিতা আর-একবার দীপ্ত ও দ্যোতনাময় হয়ে ওঠে। '৪৭-এর পরে ঢাকার সাহিত্যে যে-দুটি ক্ষেত্রে অভাব ও অসম্পূর্ণতা ছিলো, যেন সেদিকেই নজর পড়লো : উপন্যাস ও নাটক—এই দুটি বিভাগ দিন-দিন সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হতে থাকে। কবিতা, ছোটো গল্প ও প্রবন্ধ সমালোচনায় ঢাকার যে-ঐতিহ্যিক ঐশ্বর্য সৃষ্টি হয়েছিলো '৪৭-এর পর, তা অব্যাহতই থাকে। তবে সম্প্রতি রম্য পত্রিকার প্রাদুর্ভাব, টিভি-ভিডিওর অতিরিক্ত দাপট, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক জীবনের অস্থিরতা, একটি সার্বত্রিক মূল্যহীনতা শস্তা সাহিত্যের বাজার দখল, লেখক-কবিদের গোত্রে গোত্রে বিভক্তি—ঢাকার সাহিত্যকে স্তিমিত করেছে। তবে আমাদের বিশ্বাস, এই সাময়িক ঘূর্ণিঝড় কেটে ঢাকার সাহিত্য রৌদ্রকরোজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

৩

সাময়িকপত্র হচ্ছে সাহিত্যের প্রধান বাহন। ঢাকাকেন্দ্রিক যে-সাহিত্যচর্চা হয়েছে, তারও একটি প্রধান বাহন এখান থেকে প্রকাশিত পত্রিকা। অবশ্য বলা বাহুল্য যে, এখানকার লেখকেরা কলকাতা তথা পশ্চিম বাংলার পত্র-পত্রিকাতেও চিরকালই লিখেছেন; কিন্তু এও সত্য যে, ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাময়িকপত্রেই ঢাকা তথা পূর্ববাংলার (এবং প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানের, অধুনাতন বাংলাদেশের) সাহিত্যধারা প্রবাহিত ও প্রতিবিম্বিত হয়েছে। আধুনিক কালে (ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে) ঢাকা পূর্ববাংলার প্রধান শহর ও রাজধানী হিশেবে থেকেছে। ফলে এখান থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় কেবল ঢাকা নয়, বরং সারা বাংলাদেশের সাহিত্য সচল থেকেছে। গত শতাধিক বছরে ঢাকা থেকে অসংখ্য সাহিত্যবাহী পত্রিকা বেরিয়েছে, সময়-স্বভাবের দিক থেকে এদের প্রকৃতি চার রকম : এক. উনিশ শতাব্দীর পত্রিকাসমূহ—মূলত সংবাদপ্রধান, এখন খানিকটা সমতল মনে হয়; দুই. বিশের-তিরিশের-চল্লিশের দশকের পত্রিকাসমূহ—তেজী, দ্রোহী, যুক্তিশীল, আবেগবাহী এই পত্রিকাসমূহ বেরিয়েছে দেশবিভাগের আগে পর্যন্ত; তিন. '৪৭-'৭১ পূর্ব পাকিস্তান পর্যায়ের অসংখ্য পত্রিকা—সরকারি ও দ্রোহী সব পত্রিকাই এদেশের সাহিত্য সংগঠিত ও প্রাগ্রসর করে দিয়েছে; চার. স্বাধীনতা-পরবর্তী সাহিত্যপত্রিকাসমূহে একটি নতুন আবেগ ও তেজ ঝলসে

www.pathagar.com

উঠেছে—তবে, ইতিমধ্যে তা অসংখ্য রম্যপত্রিকার ভিড়ে নির্জিত হয়ে আসছে। এখানে দুটি গুচ্ছে ভাগ করে (দেশবিভাগের পূর্ব ও পরবর্তী) প্রধান কয়েকটি পত্রিকার কথা বলা হলো (বলা বাহুল্য, ঢাকা থেকে শতাধিক বছরে অসংখ্য পত্রিকা বেরিয়েছে, সুতরাং সেদিক থেকে এটা এক স্বতন্ত্র পর্যালোচনার বিষয়) :

(ক) ১৮৬০ 'কবিতাকুসুমাবলী'। হরিশ্চন্দ্র মিত্র-সম্পাদিত।
১৮৬০ 'মনোরঞ্জিকা'। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার-সম্পাদিত।
১৮৬১ 'ঢাকা প্রকাশ'। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার-সম্পাদিত।
১৮৬৩ 'ঢাকা দর্পণ'। কালীপ্রসন্ন ঘোষ-সম্পাদিত।
১৮৬৫ 'হিন্দু হিতৈষিণী'। কালীপ্রসন্ন ঘোষ-সম্পাদিত।
১৮৬৫ 'বীণাপাণি'। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার-সম্পাদিত।
১৮৬৯ 'অবলাবান্ধব' ধারকানা বন্দোপাধ্যায়-সম্পাদিত।
১৮৭০ 'বঙ্গবন্ধু'। বঙ্গচন্দ্র রায়-সম্পাদিত।
১৮৭৪ 'পারিলবার্ত্তাবহ'। আনিছউদ্দিন আহমদ-সম্পাদিত।
১৮৭৪ 'বান্ধব'। কালীপ্রসন্ন ঘোষ-সম্পাদিত।
১৮৭৯ 'ভারতসুহৃদ'। অম্বিকাচরণ রায়-সম্পাদিত।
১৯২২ 'বাসন্তিকা'। বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত।
১৯২৫ 'তরুণপত্র'। মুহম্মদ ফজলুল করিম মালিক ও আহমদ হোসেন-সম্পাদিত।
১৯২৬ 'অভিযান'। মোহাম্মদ কাসেম-সম্পাদিত।
১৯২৭ 'শিখা'। আবুল হুসেন-সম্পাদিত।
১৯২৭ 'প্রগতি'। বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত-সম্পাদিত।
১৯২৮ 'সঞ্চয়'। কে. এম. আবদুর রহমান-সম্পাদিত।
১৯৪০ 'ক্রান্তি'।
১৯৪২ 'প্রতিরোধ'। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও অচ্যুত গোস্বামী-সম্পাদিত।

(খ) ১৯৪৯ 'New Values'। খান সারওয়ার মুরশিদ-সম্পাদিত।
১৯৪৯ 'মাহে-নও'। আবদুর রশীদ-সম্পাদিত।
১৯৫০ 'মুক্তি'। আবদুল গণি হাজারী ও মাহবুব জামাল জাহেদী-সম্পাদিত।

www.pathagar.com

১৯৫২ 'সওগাত'। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন-সম্পাদিত।
১৯৫৭ 'সমকাল'। সিকান্দার আবু জাফর-সম্পাদিত।
১৯৫৮ 'উত্তরণ'। এনামুল হক-সম্পাদিত।
১৯৬৫ 'কণ্ঠস্বর'। আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদ-সম্পাদিত।
১৯৬৬ 'ছোট গল্প'। কামাল বিন মাহতাব-সম্পাদিত।
১৯৭২ 'গণসাহিত্য'। আবুল হাসনাত-সম্পাদিত।
১৯৭৩ 'উত্তরাধিকার'। * মযহারুল ইসলাম-সম্পাদিত।
১৯৮৬ 'এখন'। জাকীউদ্দীন আহমদ-সম্পাদিত।
১৯৮৬ 'সুন্দরম'। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম-সম্পাদিত।

[* তারকাচিহ্নিত পত্রিকাগুলোতে পরবর্তীকালে সম্পাদকের বদল ঘটেছে]

৪

সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে সংগঠন-সংস্থা-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির একটি ভূমিকা আছে। যদিও একথাও সত্য, সৃজনশীল সাহিত্য ব্যক্তিগত উদ্যমেই রচিত হয়। সংগঠনসমূহ সাধারণত কাজ করে প্রাবন্ধিক-গবেষণামূলক ক্ষেত্রে। ঢাকায় বরাবরই এ ধরনের সংগঠন ছিলো। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে, অধিকাংশই ছিলো ধর্মকেন্দ্রিক। দেশবিভাগের আগে সাহিত্যভিত্তিক কয়েকটি সংগঠন উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে—'মুসলিম সাহিত্য সমাজ', 'প্রগতি লেখক সংঘে'র ঢাকা শাখা, 'রেনেসাঁ সোসাইটি', 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' প্রভৃতি। দেশবিভাগের পরে সৃষ্ট কয়েকটি প্রধান সংগঠন, যারা নানাভাবে সাহিত্যের কাজ করেছে ও করছে, সেগুলো হলো :

১৯৫১ এশিয়াটিক সোসাইটি
১৯৫৭ বাংলা একাডেমি
১৯৬০ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন
১৯৬২ জাতীয় যাদুঘর (নবীভূত)
১৯৬৩ বাংলা উন্নয়ন বোর্ড

জাতীয় যাদুঘর ১৯১৩ শালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, নবীভূত হয় ১৯৬২ শালে। বাংলাদেশের জন্মের পর বাংলা একাডেমি ও বাংলা উন্নয়ন বোর্ড একীভূত হয়। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এ ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ঢাকা রেডিও (১৯৩৯ শালে প্রতিষ্ঠিত) ও ঢাকা টেলিভিশন (১৯৬৪

www.pathagar.com

শালে প্রতিষ্ঠিত) ঢাকা তথা এদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে নিশ্চিতভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এছাড়া অসংখ্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঢাকাকেন্দ্রিক সাহিত্যের যে-ধারা চলেছে, তা অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসরমান।

৫

স্বাভাবিকভাবে ঢাকায় প্রধানত বাংলা সাহিত্যেরই চর্চা হয়েছে; কিন্তু একথাও সত্য যে, ঢাকায় ফারসি, উর্দু ও ইংরেজি সাহিত্যেরও অল্প-বিস্তর চর্চা হয়েছে।

ঢাকায় ফারসি সাহিত্যচর্চার আদি নমুনা পাওয়া যায় চতুর্দশ শতাব্দীতে। শেখ শরাফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ আদি নাম। ঢাকার নবাবদের মধ্যে ফারসি চর্চার একটি ধারা ছিলো। ফারসি ভাষায় ঢাকা বিষয়ক বেশ কিছু গ্রন্থও প্রণীত হয়েছে। বলা বাহুল্য, মুঘল আমলে উপমহাদেশের রাজভাষা ফারসি ছিলো বলেই তার প্রতাপ ছিলো।

ইংরেজিও রাজভাষা হিশেবেই বিস্তৃত হয়েছে। পরে গৃহীত হয়েছে আন্তর্জাতিক ভাষা হিশেবে। ইংরেজিতে প্রথম লেখা পাওয়া যায় সপ্তদশ শতাব্দীতে, "ডায়েরী অফ উইলিয়ম হেজেস"। ডক্টর জেমস টেইলর ইংরেজিতে ঢাকা বিষয়ক একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। ঢাকা বিষয়ক আরো অনেক বই লেখা হয়েছে। ১৯২১ শালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজিতে লেখালেখি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় নলিনীকান্ত ভট্টশালী, হাকিম হাবীবুর রহমান, এস. এম. তৈফুর, আর. সি. মজুমদার, সুশীলকুমার দে প্রমুখ ইতিহাস প্রাসঙ্গিক নানা গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন দেশ বিভাগের পর এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ইংরেজিতে অসংখ্য রচনা প্রণীত হয়েছে। এবং তা মৌলিক কবিতা থেকে গবেষণামূলক প্রবন্ধ অবধি বিস্তৃত।

বাংলার পরে ঢাকায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে উর্দুর প্রভাব ছিলো ব্যাপক। এবং তা বহু দিবস বাহিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মীর্জা জান 'তাপিশ', তাঁর জামাতা মীর্জা গোলাম হোসেন 'আতিশ'—এঁরা উর্দু সাহিত্য চর্চা করতেন। ঢাকায়, তদানীন্তন 'জাহাঙ্গীরনগরে', ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে লোকজন আসতেন, অনেকের কর্মস্থল ছিলো এখানে। এঁদের কেউ-কেউ এখানে সাহিত্যচর্চাও করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর

www.pathagar.com

সূচনায় আবদুল গাফফার 'নাসাখ' খ্যাতি অর্জন করেছিলেন উর্দু সাহিত্য-চর্চায়। খাজা আহসানউল্লাহ শাহীন, নবাব সৈয়দ মুহম্মদ আজাদ, নবাব মুহম্মদ আজাদ প্রমুখ ছিলেন বিখ্যাত উর্দু লেখক। ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়েদী সোহরাওয়ার্দী এবং তাঁর কন্যা সুজিস্তা আক্তার সোহরওয়ার্দী (হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাতা) উর্দু ভাষায় সাহিত্যচর্চা করতেন। ঢাকার নবাব পরিবারে উর্দু ভাষা-সাহিত্যের চর্চা হতো। হাকিম হাবীবুর রহমান (১৮৮০-১৯৪৭) ঢাকার উর্দু সাহিত্যের এক প্রধান শক্তি ছিলেন এই শতাব্দীতে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত দুটি পত্রিকা সাপ্তাহিক 'আল মাশরিক' (১৯০৬) ও মাসিক 'জাদু' (১৯২১) জনপ্রিয় ছিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফিদা আলী খান সহজ উর্দুতে বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষ-বৃক্ষ" উপন্যাসের তর্জমা করেছিলেন, ড. আন্দালিব সাদানী দেশবিভাগের আগে-পরে উর্দু সাহিত্যে সুপ্রচুর কাজ করেছেন। দেশ বিভাগের পরে এফ. এ. করিম ফজলী, এ. এম. সলিমুল্লাহ ফাহমী, আহসান আহমদ আশ্‌ক, আমিরুল ইসলাম শারকী, আবদুর ফউক, সুরুর বারা বাঙ্কভী, আখতার পায়ামী, কলিম সামারামী, আক্তার লাখনবী প্রমুখ উর্দু সাহিত্যচর্চায় খ্যাতিমান ছিলেন। আহসান আহমদ আশ্‌ক বেশ কিছু বাংলা কবিতার উর্দু তর্জমা করেন। তার মধ্যে নজরুল ইসলামের কবিতাও অন্তর্ভূত। স্বাধীনতার পরেও ঢাকায় উর্দু সাহিত্যের একটি ক্ষীণ ধারা প্রবহমান।

৬

উনিশ শতাব্দীতে বাংলার যে-নবজাগরণ সূচিত হয়েছিলো কলকাতায়, বর্তমান শতাব্দীতে তা সম্প্রসারিত হয়েছে ঢাকায়—এবং ঐ নবজাগরণের ধারা অদ্যাবধি প্রবহমান, ঢাকা-কলকাতা দুই কেন্দ্রে। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশক থেকে ঢাকা হয়ে ওঠে বাংলার নবজাগরণের দ্বিতীয় কেন্দ্র-দেশবিভাগের পরে তা আরো স্বচ্ছ, ঘন, কেন্দ্রীভূত ও প্রভাবশীল হয়ে উঠতে থাকে। বাংলার নবজাগরণে বাংলার অর্ধাংশের (কার্যত অর্ধাংশের চেয়ে বেশি) বাঙালি-মুসলমানের অংশ গ্রহণ ছিলো না, বিংশ শতাব্দীর বিশের দশক থেকে তা প্রবল হয়ে ওঠে। বাঙালি-মুসলমানের অংশ গ্রহণ পরিষ্কার বোঝা যেতে থাকে—এবং তার কেন্দ্র হয়ে ওঠে ঢাকা (কলকাতার সঙ্গেই অবশ্য)। এদিকে ঢাকায়—হুমায়ুন কবির পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার যে চারিত্রিক বিভাজন করেছিলেন—পূর্ব বাংলার কেন্দ্রমুখ হিশেবে বিপ্লবের

www.pathagar.com

কেন্দ্রমুখ হয়ে ওঠে। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন সেই আশ্চর্য বিদারণ ঘটায় যা ঢাকার মৌল, পবিত্র, লোকায়ত ও অলৌকিক শক্তি। আবার এ তথ্যও সত্য যে, ঢাকা নিজস্বতা বজায় রেখেও কোনো দ্বীপবর্তী বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করতে চায়নি, আবহমান বাংলা সাহিত্যেই সে সঞ্চার করেছে নতুন গতি, শক্তি, প্রাণ। ঢাকার একটি আঞ্চলিক ভাষা আছে ঠিকই, কিন্তু ঢাকার সাহিত্য-ভাষা প্রচলিত বাংলা ভাষাই। ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলাদেশের সাহিত্যভাষায় বাংলাদেশেরই নিজস্ব শব্দাবলি, বাকভঙ্গি কিছু তো মিশবেই—মিশেছেও। মুসলিমপ্রধান বলে ঢাকা-কেন্দ্রিক সাহিত্যভাষায় আরবি, ফারসি, উর্দু শব্দের মিশেলও হয়েতো একটু বেশি পরিমাণেই হয়েছে। বিশের দশক থেকে ঢাকা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। ১৯৪৭-এর পর ঢাকা হয়ে ওঠে স্রোতে-প্রতিস্রোতে বিশাল-উত্তাল নদী। ১৯৭১-এর পর থেকে ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী—সাহিত্য-সংস্কৃতি তখন থেকে আরো লক্ষ্যাভিমুখী। বাংলাদেশের আঞ্চলিক ও জন-মানবিক বিশিষ্টতা তো ঢাকা তথা বাংলাদেশের সাহিত্যে প্রতিফলিত হবে। হচ্ছেও। আমাদের সাহিত্যে একটি তরতাজা প্রাণের স্পন্দন সতত ধ্বনিত হচ্ছে—এমনকি বিবদমান গোষ্ঠী ও তাদের ধ্যানধারণাকেও আমরা সদর্থে প্রাণের লক্ষণ বলে চিহ্নিত করতে পারি। ঢাকা বাংলা সাহিত্যে একটি নেতৃত্ব দিচ্ছে শ'খানেক বছরও হয়নি। কিন্তু ইতিমধ্যেই সে একটি অদম্য শক্তির উৎস হিশেবে নিজেকে প্রমাণ করেছে। বাংলাদেশের জন্মের পর দেখা যাচ্ছে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হতে পারে। ভবিষ্যতে ঢাকা বাংলা সাহিত্যের কেন্দ্রীয় রাজধানী হয়ে উঠবে মনে হয়—ইতিমধ্যেই তার চিহ্ন আমাদের সমস্ত নিরাশা ও কুয়াশার মধ্য থেকে জাগ্রত হয়ে উঠছে।

সহায়ক গ্রন্থ, পত্রিকা ও প্রবন্ধপঞ্জি

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) : সুকুমার সেন। ষষ্ঠ সংস্করণ ১৩৭৭। ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলিকাতা।

২. বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড) : সুকুমার সেন। তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭১। ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলিকাতা।

৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : মুহাম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান। ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৮৯। আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

www.pathagar.com

৪. মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র : আনিসুজ্জামান। ১৯৬৯। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
৫. মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক (প্রথম খণ্ড) : ধনঞ্জয় দাস সম্পাদিত। দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৭৯। নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, কলিকাতা।
৬. বাংলাদেশ ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য। ১৯৭৫। মনীশা, কলকাতা।
৭. উধ্রুকরধর্ত ঐটনর্ণপর : উটভভট, ঐন ভণরটক খচর্ধমর : ও.‌.ঔ, ধড়শধ ১৯৬৯ উটভণট।
৮. সংস্কৃতিকেন্দ্র ঢাকা : 'তখন ও এখন' : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। 'পরিচয়' বাংলাদেশ সংখ্যা, ১৩৭৭-৭৮। (১৯৭১)।
৯. 'বাংলাদেশের সাহিত্য পত্রিকা' : আবদুল মান্নান সৈয়দ। শিল্পতরু, মার্চ ১৯৮৯।
১০. Dacca : The mughal Capital :
Dr. Abdul Karim, Asiatic Foundation, Dacca.

www.pathagar.com

পুনর্বিবেচনা আমাদের সাহিত্যের অপরিহার্য প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্য, বিশেষত বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য, বহুভাবে অবমূল্যায়িত হয়েছে। সমকালে তো বটেই, উত্তরসূরীদের হাতেও এ-ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে বহমান। রাজনৈতিক অতি-উচ্ছ্বাস, ভাবাবেগ কিংবা পরান্নের প্রভাব—সকলেই হয়ত এর জন্য দায়ী ; কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী দায়ী আমাদের নিজেদের হীনমন্যতাবোধ।

এভাবেই একটি জাতির মানসিক বিপর্যয় ক্রমান্বয়ে তার স্বাধীন চিন্তা ও শিল্পকেও বিপন্ন করে। সেই বিপর্যয় যে কত বেদনাদায়ক—আমাদের নিজেদের ইতিহাসের দিকে তাকালে তা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়।

সমকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক—কবি ও কথাশিল্পী, আবদুল মান্নান সৈয়দ এ গ্রন্থে বহুবিষয় পুনর্বিবেচনা করেছেন। বলাই বাহুল্য, এ ধরনের বলিষ্ঠ ও নির্ভীক উচ্চারণ আমাদের সাহিত্যে দুর্লভ ; সেহেতু অমূল্যও বটে।

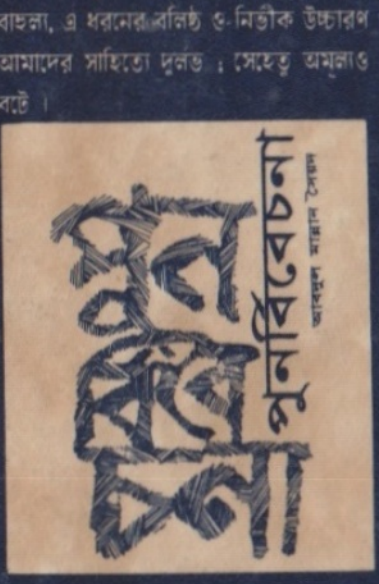

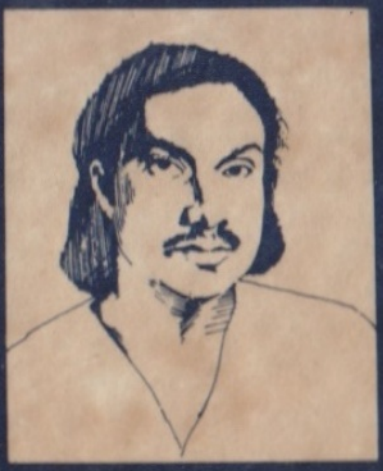

আবদুল মান্নান সৈয়দ জন্মেছেন ১৯৪৩'র ৩রা আগস্ট। বাংলায় সম্মানসহ এম. এ.। মূলত অধ্যাপক।

প্রথম তিনটি বইই : জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ, সত্যের মতো বদমাশ ও শুদ্ধতম কবি, বিস্মিত করেছিল সমকালকে।

এ পর্যন্ত পঞ্চাশটিরও অধিক বই প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন : কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, ফররুখ আহমদ, শাহাদাৎ হোসেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়সহ আরও অনেকের উপর।

পুরস্কার পেয়েছেন : বাংলা একাডেমী (১৯৮১), আলাওল (১৯৮১), চারণ (১৯৮৬) ও অন্যান্য। সম্পাদিত পত্রিকার মধ্যে : এখন, শিল্পকলা, চারিত্র এবং নজরুল একাডেমী পত্রিকার নাম স্মরণীয়।

পত্নী : সায়রা সৈয়দ ও একমাত্র কন্যা : জিনান সৈয়দ।

পেশার বাইরে বর্তমানে তিনি সাহিত্য মাসিক শিল্পতরু'র উপদেষ্টা সম্পাদক।